কি শো র ক ণ্ঠ

# গল্পসমগ্র

১

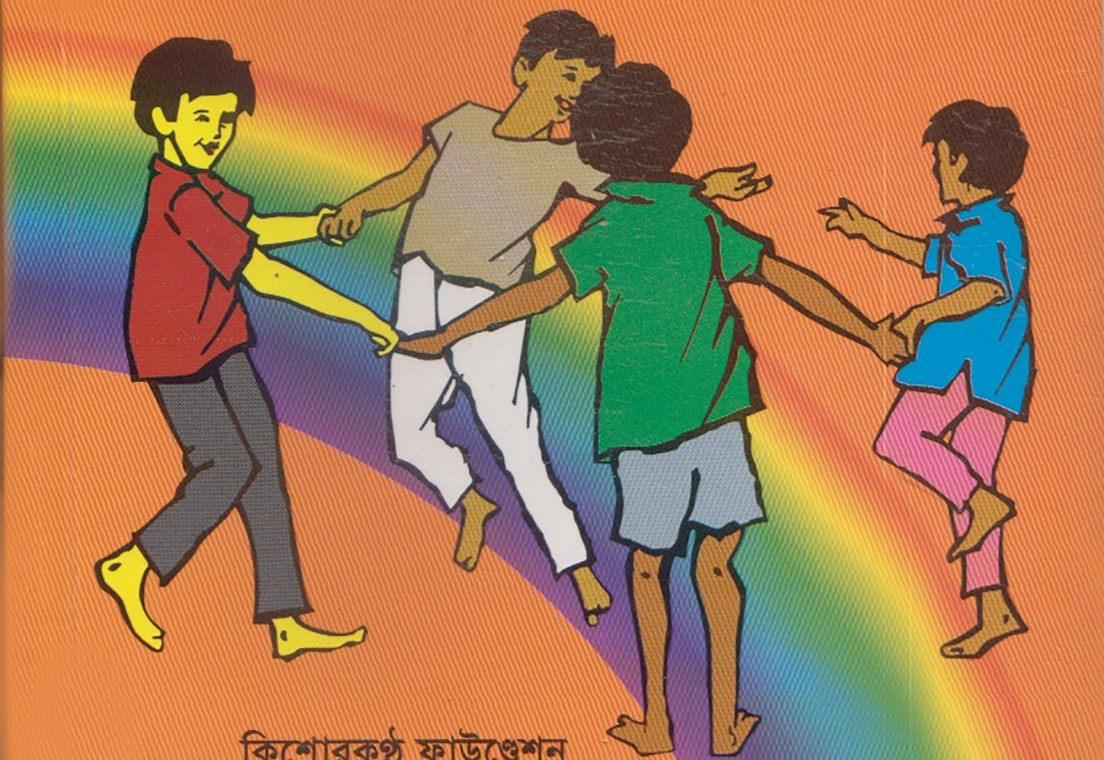

কিশোরকণ্ঠ ফাউণ্ডেশন

কিশোরকণ্ঠ

# গল্প সমগ্র

# ১

www.pathagar.org

**প্রকাশনায়**
কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন
৫১,৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৭২৩৬

**গ্রন্থস্বত্ব**
কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন

**প্রকাশকাল**
প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১২

**প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ**
হামিদুল ইসলাম

**গ্রাফিক্স**
মোঃ মোজাম্মেল হক মজুমদার
আলফাজ হোসেন

**দাম**
১৩০.০০ (একশত ত্রিশ টাকা মাত্র)

Kishorkantha Golposamagra-1
(A Complete Story Collection Published in the monthly Kishorkantha)
Published by Kishorkantha Foundation
51,51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 9567236
Price : Tk. 130, US$ 12

www.pathagar.org

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
মোঃ দেলাওয়ার হোসেন

সম্পাদক
মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

নির্বাহী সম্পাদক
নিজামুল হক নাঈম

সম্পাদনা সহযোগী
মশিউর রহমান রাজু
জুবায়ের হুসাইন
তোফাজ্জল হোসাইন

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন

www.pathagar.org

ড. কাজী দীন মুহম্মদ ২০

ময়দানবের পুরী
আশরাফ সিদ্দিকী ২৩

পেন্সিল
নাজমুল আলম ৩০

জ্যোতিষীর ভাগ্য
আবদুস সাত্তার ৩৫

তিনি যখন ছোট্ট ছিলেন
সানাউল্লাহ্ নূরী ৪১

আগুনমুখো ড্রাগন
সানাউল্লাহ্ নূরী ৪৫

দিশেহারা টেনু মিয়া
শহীদ আখন্দ ৫৪

অসামান্য আলোক শিশু
আবদুল মান্নান তালিব ৬০

বুদ্ধির জয়
মোবারক হোসেন খান ৬৫

ভুতুড়ে কাণ্ড
আবদুল মান্নান সৈয়দ ৬৯

মার্জার সারমেয় সংলাপ
আল মুজাহিদী ৭৯

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
আতা সরকার ৮৭

তানিয়ার জন্য যত কথা
চেমন আরা ৯৩

অভিমানী বন্ধু আমার
জুবাইদা গুলশান আরা ৯৭

এক অঙ্কুরের কথা
নয়ন রহমান ১০০

এক ধূর্ত কবির কথা
জামান মনির ১০৪

এক যে ছিল রাজা
আকরাম ফারুক ১০৮

আলোর ফোয়ারা
জাফর তালুকদার ১১১

মিরাকল
দিলারা মেসবাহ ১১৫

ঝড়
হোসেন মাহমুদ ১২২

চান্দুর গল্প
মসউদ-উশ-শহীদ ১৩২

লোহার ভূত
সরকার মাসুদ ১৩৬

ভূতের মত অদ্ভূত
সাজজাদ হোসাইন খান ১৪১


www.pathagar.org

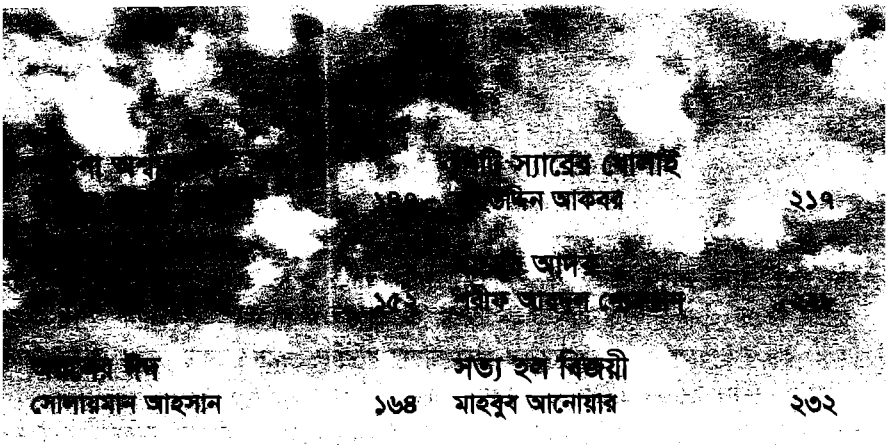

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] ১৫[illegible]

[illegible] ঈদ
সোলায়মান আহসান ১৬৪

অলৌকিক এক রাজার কাহিনী
আসাদ বিন হাফিজ ১৬৮

দাদুর বিকেল
মোশাররফ হোসেন খান ১৭২

অন্য রকম শফিভাই
মীযানুল করীম ১৭৭

টোকনের ঈদ
ইসমাঈল হোসেন দিনাজী ১৮৩

পিতা আপনি তাই করুন
আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ ১৮৬

বিনা পয়সায় আনন্দ
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ১৯১

অন্যরকম পৃথিবী
আহমদ মতিউর রহমান ১৯৭

ঘুমপাড়ানী
নাজিব ওয়াদুদ ২০২

সবুজ পৃথিবী লাল সূর্য
সাবিনা মল্লিক ২০৭

মৌমাছি মুক্তিযোদ্ধা ও অন্তু
লুৎফুল খবীর ২১৩

[illegible] স্যারের মোনাই
[illegible]উদ্দিন আকবর ২১৭

[illegible] আপদ
[illegible] [illegible]

সত্য হল বিজয়ী
মাহবুব আনোয়ার ২৩২

চিঠি
ইকবাল কবীর মোহন ২৩৪

মোরগ রাজা
নাসির হেলাল ২৩৮

ফুলের চোখে পানি
শাহ্ আলম বাদশা ২৪২

রিয়াজের নীরবতা
জাকির আবু জাফর ২৫৫

পরীর দেয়া যাদুর কাঠি
রফিক মুহাম্মদ ২৬২

জাহান্নামের অজগর
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন ২৬৫

জীবনের পাঁচটি উপহার
হাসান শরীফ ২৬৯

অহংকারীর শিক্ষা
তালহা বিন নজরুল ২৭৩

ভূত হাজিরার আসন
দেলোয়ার হোসেন ২৭৬

www.pathagar.org

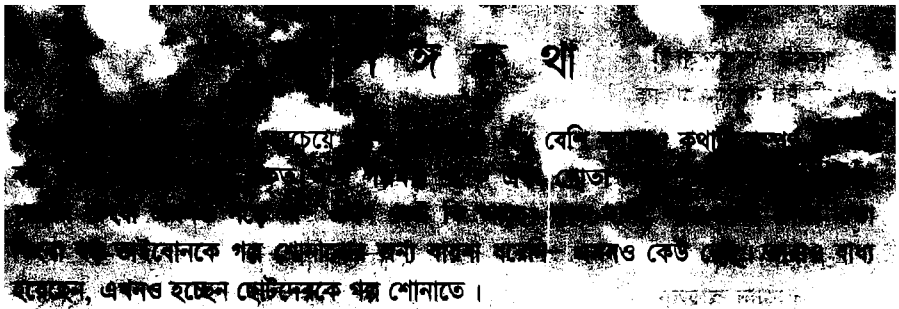

প্রশ্ন হলো– কী গল্প? কোন গল্প আমরা বলছি বা শেখাচ্ছি আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ, সেই সব সোনালি শিশুদেরকে? বহুকাল থেকে চলে আসছে ঠাকুরমার ঝুলি, গোপাল ভাঁড়ের গল্প, ঈশপের গল্প প্রভৃতি। আমাদের পূর্বে, সম্ভবত বহু পূর্ব থেকেই– এমনিভাবে যুগের পর যুগ, কালের পর কাল ধরে চলে আসছে ঐ একই ধারার গল্পস্রোত। কিছুটা পালাবদলের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল বটে, সাতচল্লিশ-উত্তর সময়ে। কোনো কোনো সচেতন বিবেকে আঘাত করেছিল মৌলিক প্রশ্নটি, আমরা আমাদের সন্তানদের কী শেখাচ্ছি? ছোটদের গল্প বলতেই কি ভূত-প্রেত, রাক্ষস, দৈত্য-দানব, রাজা-রানী, রাজপুত্র, রাজ্য জয় কিংবা উদ্ভট-অবাস্তব অপকাহিনীর অপলাপমাত্র? সে কি কেবল নীতি-নৈতিকতাহীন, শিক্ষা ও সংযমহীন, চরিত্র ও আদর্শহীন– ভয়তাড়িত, গা-ছমছম করা কেবলই শব্দের বুনোট? না-কি এমন গল্পের দরকার, যেসব গল্প শুনলে আমাদের সন্তানেরা জেগে উঠতে পারে সাহসী রোদ মেখে স্বপ্ন বাস্তবতার সুউচ্চ পর্বতে! যে গল্পে আছে মানুষ, আছে সাহস, সংযম, ধৈর্য, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, বড় মানুষ হওয়ার স্বপ্ন এবং আত্মত্যাগের এক সুমহান শিক্ষা!

স্বীকার করতেই হবে, হারাধনের সাতটি ছেলে, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভোম্বল-গোপাল কিংবা সেসব দৈত্য-দানব আর রাজপুত্র-রাজ কুমারী– কখনই হারিয়ে যায়নি সমাজের মগজ থেকে। তবে যেটুকু চৈতন্যের উদ্ভব ঘটেছিল তার ফলেই একদা এদেশে কিছুটা অনূদিত হলো শেখ সাদী, মোলা নাসিরুদ্দীন, রুমী প্রমুখের গল্প। সামান্য, খুবই সামান্য– এবং তার চেয়েও লজ্জার কথা, আমরাই সেইসব হীরামণি মাণিক্য চিনে উঠতে ব্যর্থ হয়েছি, যার কারণে এর ব্যাপ্তি ঘটেনি তেমনভাবে। সেই সাতচল্লিশ-উত্তর কালেও গাঁ-গেরামের কয়টি চাল ফুঁড়েই বা এদের গল্প বারান্দায় উঠতে পেরেছিল? ক'জন দাদা-দাদী কিংবা নানা-নানীর মুখেই বা এসব গল্প প্রবেশ করতে পেরেছিল? পারেনি সেইভাবে, কারণ এসব গল্প পাঠ এবং ছোটদেরকে শেখানোর তাকিদটা কখনও তেমনভাবে অধিকাংশরাই অনুধাবন করতে পারেননি। আবার বাস্তবতাও ছিল। অশিক্ষায় পঙ্গু, তার চেয়েও বটে! অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ পরিবারগুলোর ঘরে জমাটবাঁধা আঁধারের পর্বত ডিঙিয়ে এতটুকু ও সুশীল আলো প্রবেশের পথ পায়নি। সামান্য কিছু শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে চেতনাটি জাগ্রত হয়েছিল বটে, কিন্তু বসন্তের বাতাসের মত তা আমাদের দেশের সকল গৃহকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এসব ব্যর্থতার দায় কখনই অশিক্ষিত কিংবা অসচেতন গরিব ক্ষেত-মজুরের ঘাড়ে সওয়ার হতে পারে না। তাদের ওপর এই দায় চাপানোটাও নেহাত অবিচার এবং অন্যায়। কিন্তু দায়টা ছিল কাদের? আমাদের সেই সব অগ্রজ, যারা আলোকিত হয়ে উঠেছিলেন– তারা কি তাদের চার পাশকে আলোকমুখর করে তোলার জন্য এতটুকু দায় অনুভব করেছিলেন? যদি করতেন তাহলে

www.pathagar.org

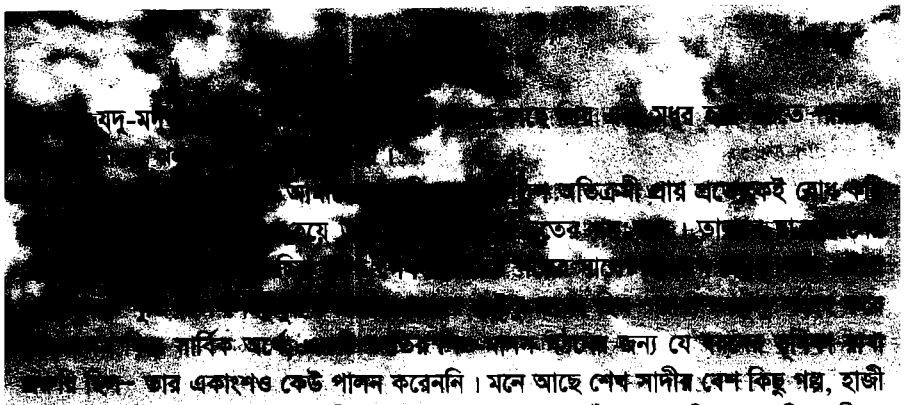

তার একাংশও কেউ পালন করেননি। মনে আছে শেখ সাদীর বেশ কিছু গল্প, হাজী মুহাম্মদ মুহসীন, মুসলিম শাসক, বীর যোদ্ধা, রাসূল (সা) ও তাঁর চার খলিফার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী এবং ইতিহাস পাঠ্য তালিকায় যৎকিঞ্চিৎ থাকার কারণে, তবু ভালো– কিছুটা তৃপ্তি বোধ করতাম। কিন্তু এটাতো সত্য, 'ঠাকুর গনেশ'কে ছাপিয়ে যে ধরনের ব্যাপ্তি এবং বিকাশ কাম্য ছিল তার কতটুকু আবেদনই বা বিস্তার লাভ করছিল? করেনি, তার কারণও ঐ একটিই। যারা বিস্তার এবং বিকাশের ভূমিকায় ছিলেন, তাদের উদাসীনতা অসচেতনতা, সর্বোপরি দূরদর্শিতার অভাবটি চরমভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাদের সেই কূপমণ্ডূকতার খেসারত কি আজও আমাদের দিয়ে যেতে হচ্ছে না? তারা ইচ্ছা করলে পারতেন, খুব সহজেই পারতেন নীতি-নৈতিকতা আর আদর্শ ও শিক্ষণীয় গল্পের এক বিরাট বিশাল সমুদ্র বিস্তার করতে। তখনকার দিনেও ঘরে ঘরে এসব গল্প পৌঁছে দেয়া মোটেও কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। সামর্থ্য ছিল বটে, কিন্তু সেই উদ্যম আর মানসিকতা ছিল না। এটাই আমাদের জন্য আজও বেদনার বিষয় হয়ে রইলো।

**দুই.**

সাতচল্লিশ-উত্তর এদেশের পাঠ্য বইয়ে যতটুকু নীতি-নৈতিকতা এবং আদর্শিক শিক্ষামূলক গল্প-ইতিহাস প্রভৃতি ছিল, যা শিশুমানস গঠনে ছিল সহায়ক– সেটুকু কালক্রমে বিলুপ্ত হলো। যতই কষ্টের বিষয় হোক না কেন, বাস্তবে তো এটাই ঘটলো– একাত্তরের স্বাধীনতা-উত্তর যেসব পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হলো, তাতে আর যাই থাকুক না কেন, আগের সেই সব গল্প-ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হলো। ইসলামতো দূরের কথা, মুসলিম সেন্টিমেন্টকে সেখানে অবহেলা করা হলো। কোথায় আর হাজী মুহসীন, মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী, শরীয়তুলাহ, তিতুমীর! সেই সব জায়গা দখল করে নিলো কালক্রমে 'সূর্যসেনেরা'। শেখ সাদী, রুমীর গল্পের পরিবর্তে, এই এখন আমাদের বাচ্চাদের স্কুলপাঠ্য হিসেবে পড়তে হয় টোনাটুনির গল্প, গোলাপের কপাল, বানরের রুটিভাগ, শেয়ালের পাঠশালা, ডাইনি বুড়ি প্রভৃতি! নগরকেন্দ্রিক প্রায় প্রতিটি স্কুলে গেটের সামনে অদ্ভুত সব মাল্টিকালারের ঝকমকে প্রচ্ছদে শোভিত শত শত গল্প বইয়ের সারি সাজিয়ে রাখেন এক শ্রেণীর বিক্রেতারা। তারা খুব কম দামে কিনে চড়া দামে এসব বই তুলে দেন কিশোরদের হাতে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কিংবা অন্যভাবে পিতা-মাতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই অর্থে কিনে আনছে তারা এইসব বই। কৌশলে তাদেরকে কী বই পড়ানো হচ্ছে? আফসোসের বিষয় বটে, তার চেয়েও অনেক বেশি আশঙ্কার কথা! এইসব হলো– জোলা আর সাত ভূত, গোপাল ভাঁড়ের গল্প, রাক্ষসী রাজকন্যা, হাসির গল্প ধরনের সেই পুরনো, অতি পরিচিত এবং ততোধিক অমার্জিত ভুলে ভরা বই। ছোটরা যেহেতু গল্প শুনতে, বলতে এবং পড়তে ভালবাসে, সেই কারণে এক শ্রেণীর সুচতুর ধূর্ত জ্ঞানপাপী সেই সুযোগের পুরোমাত্রায়

www.pathagar.org

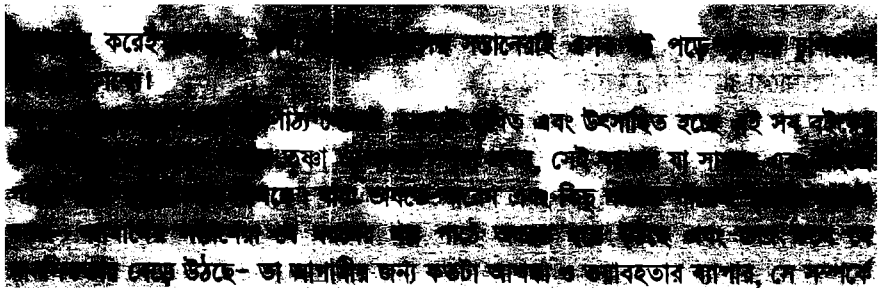

[illegible] করেছ [illegible] সন্তানেরাই [illegible] পড়ে [illegible] পারছে। [illegible]

[illegible] পাঠ্য [illegible] এবং উৎসাহিত হয়ে [illegible] সব বইয়ের [illegible] তৃষ্ণা [illegible] সেই [illegible] যা সা [illegible] অবহেলার [illegible] কিছু [illegible] বেড়ে উঠছে– তা আগামীর জন্য কতটা [illegible] ও ভয়াবহতার ব্যাপার, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই এখন ভেবে দেখা জরুরি।

**তিন.**

এই অবক্ষয় এবং অনাসৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী আমরাই। আমরা বলতে– আমাদের লেখক, প্রকাশক, পত্রপত্রিকার নিয়ন্ত্রক, বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজ। সম্ভবত আমরা কেউই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বের চোখে দেখিনি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমাদের অগ্রজ যে সকল শক্তিমান লেখক-কবি ছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছোটদের উপযোগী, তাদের মানস ও চরিত্র গঠনমূলক তেমন বেশি গল্প লেখেননি। অধিকাংশ বড় বড় কবিও কেন জানি এড়িয়ে গেছেন বিষয়টি। যারা কিছু লিখেছেন, তার সংখ্যা, গুণগত মানও যে সর্বাংশে অগ্রগণ্য– তাও নয়। আবার প্রকাশকদের অনীহা, অজ্ঞতা ব্যবসায়িক ভেদ-বুদ্ধিতে বেশ ভালো বইও অনেক ক্ষেত্রে পৈচার দশায় পরিণত হয়ে গেছে। যার ফলে ইবরাহীম খাঁ, ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ্ প্রমুখ লেখকদের কিশোর উপযোগী ভালো বইগুলোর সাথেও আজকের শিশু-কিশোররা পরিচিত হতে পারছে না।

কে না জানে যে ছোটদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে ভালো বইয়ের কোনো বিকল্প নেই! কাদা নরম থাকলে তা দিয়ে অনেক কিছুই তৈরি করা সম্ভব। কাদা শুকিয়ে যখন শক্ত হয়, তখন তা মুঠোয় ভরলে হয়তো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়, নইলে হাতই রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। শৈশব-কৈশোর কালটাই মূলত শিক্ষার কাল। পরবর্তী কালটা তো কেবল অভ্যাসগত চর্চার কাল। সুতরাং আমাদের জাতিকে উন্নত, পরিশীলিত মর্যাদাবান করে গড়ে তুলতে চাইলে অবশ্যই আমাদেরকে অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে আজকের ছোটদের প্রতি। তাদের চরিত্র, আদর্শ, রুচি, নীতি, সাহস, স্বপ্ন– এসবই গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই। তাদের প্রতি অবহেলা করা মানেই একটি জাতির ধ্বংস এবং অবক্ষয়ের পথটিকে সুগম করে তোলা। বিষয়টি যত দ্রুত আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো, ততই আমাদের জন্য হবে কল্যাণকর।

**চার.**

এসব ক্ষেত্রে লেখকের দায়টাই বারবার ঘুরে ফিরে সামনে আসে। কারণ প্রথমত লেখকরাই তো থাকেন উৎস মূলে। কিছুটা আশার কথা বটে, তবে সেটাই তো যথেষ্ট নয়– প্রায় দুই দশক ধরে আমাদের দেশে ছোটদের জন্য লেখার একটা গতি লক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়ে উঠেছে। ছড়া-কবিতা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, বিষয় হলো কিশোর উপযোগী গল্প। কিন্তু সেখানেও খুব বেশি আশান্বিত হওয়ার মতো তেমন কিছু দেখা যায় কি? শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা হলেও অধিকাংশ গল্পই হয়ে উঠেছে বয়স্কদের। শব্দ প্রয়োগে, ভাষা ব্যবহারে, বিষয় নির্বাচনে– প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে। কাদের জন্য, কী জন্য, কেন লিখছি– এটাও অনেক ক্ষেত্রে ভুলে যাই। ভুলে যাই, কিংবা আমরা পেরেই উঠি না। সেই কৌশলটা আয়ত্তে

www.pathagar.org

আনতে যে কিভাবে লিখলে তাদের মন-মস্তিকে স্পর্শ করা যায়, গড়ে তোলা যায় তাদেরকে সুন্দর মানুষ হিসেবে। কিন্তু এর চেয়েও বড় ব্যর্থতা হলো– এই দুই দশক পর্যন্ত লিখেও শত শত বই প্রকাশ করেও তাদেরকে আমরা গল্প পাঠের মানসিক তৃপ্তি দিতে পারিনি। সেটা পারলে, সন্দেহ নেই– 'গোপাল ভাঁড়' ছেড়ে তারা নিশ্চয়ই এই দিকে অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠতো। লেখার প্রতি আমাদের অনাদর এবং অদক্ষতাই সম্ভবত এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুরবস্থার মূল কারণ। ছোটদের ভেতর ভালো গল্প, ভালো বই পাঠের তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলার টেকনিকটা সম্ভবত আমরা ধরতে পারছি না। এটা তো ঠিকই, একজন কিশোর যদি একটি লেখা পাঠ করে আর একটির প্রতি লোভী দৃষ্টি না ফেলে, তাহলে বলাই বাহুল্য– সেই ব্যর্থতা ঐ কিশোরের নয়, লেখকের। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত বলে মনে করি। সংখ্যাধিক্য কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– ভালো লেখা।

আমাদের সন্তানদের হাতে আমরা এমন বই তুলে দিতে চাই, যে বই পেয়ে তারা নাওয়া খাওয়া ভুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে যাবে। কিংবা হুমড়ি খেয়ে পড়বে প্রতিটি বর্ণের ওপর, প্রতিটি বিষয়ের ওপর মিষ্টিলোভী পিঁপড়ার মতো। বইটি হতে হবে এমন বই, লেখাটি হতে হবে এমন লেখা– যা কাজ করবে ঠিক ঐ লাউ শাকের চারার মতো– শিকড়ে পানি পেয়ে যে চারা লকলক করে বেড়ে ওঠে। কী সবুজ, কী তারতাজা, কী পরিপুষ্ট তার এক একটি লতাপাতা! তরতর করে বেড়ে উঠছে, বেড়ে উঠছে আলো-পানি আর বিশুদ্ধ বাতাসের সাহায্যে। বড় হচ্ছে। তার জন্য তখন প্রয়োজন পড়ছে বিশাল মাচা বা ছাউনির। তারপর অবাক বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে থাকবে পৃথিবীর দিকে। বলবে, হ্যাঁ! এই পৃথিবী আমার। আমিই এর যোগ্য উত্তরাধিকার। আমরা তো চাই তরতাজা প্রাণ স্পন্দনে টইটম্বুর তেমনি শিশু-কিশোর যারা পুঁই কিংবা লাউয়ের মতোই শুধু হবে না, কেউ কেউ হয়ে উঠবে বট কিংবা শালবৃক্ষও। কিন্তু তার জন্য ক্ষেত্র তৈরির দায়িত্বটি পালন করতে হবে এই আমাদেরকেই। বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না।

**পাঁচ.**

২০০০ সালে কিশোরকণ্ঠ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'কিশোরকণ্ঠ উপন্যাস সমগ্র' প্রথম খন্ড। 'সমগ্রটি' প্রকাশের পর কিশোরদের মাঝে তো বটেই, বিদগ্ধ পাঠক ও সুধীমহলে সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিশোরকণ্ঠ পরিবারও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছা ছিল এইভাবে প্রকাশনার ধারা অব্যাহত রাখার। সেই পদক্ষেপেরই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে– কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র-১ প্রকাশিত হয়েছিল ২০০১ সালে। সমগ্রটি শেষ হয়ে গিয়েছে অনেক আগে। ব্যাপক পাঠক চাহিদার করনে আমরা এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। ইতিমধ্যে 'কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র-২' ও বাজারে এসেছে। আশা করছি আমাদের এই প্রয়াসটিও সমানভাবে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

মোশাররফ হোসেন খান
১৫ অক্টোবর, ২০১২

www.pathagar.org

# দ্বিতীয় সংস্কারণ প্রসঙ্গে

কিশোর গল্প শিশু-কিশোর সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য একটি উপাদান। এর কাহিনী এবং চরিত্র অর্থাৎ পুরো আবহ কিশোর মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, অভিভাবকেরাও দারুণ উপভোগ করেন এ জাতীয় গল্পগুলো। কখনো কখনো কল্পনার সাম্পান ছেড়ে দেন সাগরের বুকে। মুক্ত আকাশে মেঘের ভেলায় আরোহণের স্বাদও পেয়ে যান। পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেন। উদ্যোগী হন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়।

কিশোর গল্পের অবদান তথা ভূমিকা তাই অনেক। এর মাধ্যমে নির্মুল বিনোদনের পাশাপাশি সব শ্রেনীর পাঠককে সমাজ-সচেতন করা এ জাতীয় সাহিত্যকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কিশোরকণ্ঠ বরাবরই আগামীর স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে অভ্যস্ত। এ কারণেই প্রত্রিকাটিতে কিশোর গল্প প্রকাশের ধারাবাহিকতা সফলতার সাথে অব্যাহত রেখেছে। ত্রিশ বছরের এই প্রত্রিকাটি শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় বরাবরই সচেষ্ট। ব্যাপক পাঠক চাহিদার কারণে ২০০০ সালে কিশোরকণ্ঠে প্রকাশিত গল্পসমূহ থেকে বাছাই করে পঞ্চাশটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত করা হয়েছিল 'কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র-১'। প্রকাশের পরপরই তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং সবকপি শেষ হয়ে যায়। তথাপি নানান কারণে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিন্তু উত্তরোত্তর এর চাহিদা বাড়তে থাকায় আমরা ২০১২ সালে এসে কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র-১'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছি। এ কারণে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে সিজদাবনত হয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আশা করছি এতে পাঠক চাহিদার কিছুটা লাঘব হবে ইনশাআল্লাহ।

'কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র-২' এবং 'কিশোরকণ্ঠ উপন্যাসসমগ্র-১'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। 'কিশোরকণ্ঠ উপন্যাসসমগ্র-২' ও কিশোরকণ্ঠে প্রকাশিত জনপ্রিয় ধারবাহিক উপন্যাস 'পাহাড়ি এক লড়াকু' অচিরেই প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

www.pathagar.org

www.pathagar.org

www.pathagar.org

# সোহেলের রোজা ও ঈদ

শাহেদ আলী

www.pathagar.org

রমজানের চাঁদ দেখা গেছে। বাড়িতে সবার মধ্যে রোজা রাখার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আমাদের সোহেল সবেমাত্র দুই বছরে পড়েছে, সে-ও বায়না ধরেছে রোজা রাখবে। রোজা কী বুঝে না। বাড়ির সবাই না খেয়ে থাকবে, রোজা রাখবে, আর সে কেমন করে সবাই যখন রোজা রাখবে, যখন স্ফূর্তি করে খাবে-দাবে! সবাই যে কাজ করে তাই তো ভালো কাজ। সোহেল কেন ভালো কাজে শরিক হবে না? আব্বা-আম্মাকে বললো তোমাদের সবার সাথে আমিও কাল থেকে রোজা রাখবো। আম্মা বললেন, তুমি কী রোজা রাখবে, তোমার কি রোজার বয়স হয়েছে? আব্বা বললেন, তোমার রোজা রাখার সময় হলে আমরা বলবো– তুমি তখন রোজা রেখো। তবুও সোহেল জিদাজিদি করতে লাগলো। সোহেল নাছোড়বান্দা, এবার রমজান পড়েছে জ্যৈষ্ঠ মাসে। কী লম্বা দিন; তার ওপর কী প্রচন্ড গরম। বয়স্ক লোকেরাই সহ্য করতে পার না। সোহেল কিছু না খেয়ে, কিছু পান না করে এই সময়ে থাকবে কী করে? ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু খাওয়া বা পান করা চলবে না। কোনো খারাপ কাজ করা চলবে না, কোনো খারাপ কথা বলা চলবে না, এমনকি মনের মধ্যে কোনো খারাপ চিন্তাকে স্থান দেয়া চলবে না। আল্লাহর কাছে তো কোনো কিছুই গোপন থাকে না, তাই লুকিয়ে কিছু করা যাবে না– আব্বা সোহেলকে বলেন। সোহেল অত কিছু বোঝে না, সে এতটুকু বোঝে যে রোজা রাখলে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহকে খুশি করার জন্যই সে রোজা রাখবে।

আব্বা-আম্মা ঠিক করলেন তারা খুব চুপি চুপি সেহেরি খাবেন, সোহেলকে ঘুম থেকে তুলবেন না। কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো। সোহেল সেহেরি না খেয়েই রোজা রাখতে লাগলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে নামাজ পড়লো, তারপর বলল– আমি রোজা রাখবো, সবাই যদি না খেয়ে থাকতে পারে আমি কেন পারবো না!

আব্বা-আম্মা বলেন, তোমার এখনও রোজা রাখার বয়স হয়নি। বাপ। আল্লাহ বাচ্চাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বাচ্চারা কষ্ট পেলে আল্লাহ কষ্ট পান।

সোহেল বলে– আমার মত সকলেই রোজা রাখছে, আমি কেন রাখবো না? আমি অবশ্যই পারবো।

দুপুরের দিকে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। ক্ষুধায় শরীর প্রায় অবশ হয়ে পড়ে। তবুও সোহেল পানি চায় না, খাবার চায় না। তার চাচী তাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে বললেন– চুপি চুপি খেয়ে ফেল, কেউ দেখবে না। সোহেল বলে– আল্লাহ যে দেখে ফেলবে! চাচী বলেন– বাবা! আল্লাহ বাচ্চাদের কষ্ট দিতে চান না। তুমি যখন খাবে আল্লাহ তখন চোখ বুজে থাকবে। চাচী যে কী বলেন, আল্লাহ তো সব সময় চোখ মেলে চেয়ে আছেন। তার কাছে যে কিছুই লুকান যায় না। এ কথা বলে সোহেল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

এভাবে দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে যায়। সোহেলের কী আনন্দ! তার পহেলা রোজাটা



www.pathagar.org

সম্পূর্ণ হলো। পরদিন সেহেরি খাবার সময় আব্বা-আম্মা সোহেলকে ঘুম থেকে তুললেন। সে সকলের সঙ্গেই সেহেরি খেলো রোজা রাখার জন্য। এবার আর প্রথম দিনের মত কষ্ট মালুম হলো না। সে আর দিনের বেলা রান্নাঘরের ভেতর যায় না। সোহেলের চাচী তাকে খুব আদর করেন, বলেন, শুধু শুধু কেন কষ্ট করছিস বাবা? সোহেল এ কষ্ট গায়ে মাখে না। তার আম্মা ছটফট করেন। এক রত্তি ছেলে রোজা রাখতে রাখতে কাহিল হয়ে পড়ছে। বুঝিয়ে সুজিয়েও তার রোজা ভাঙানো যাচ্ছে না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে সে কাঁদতে শুরু করে দেয়। অবুঝ ছেলেকে নিয়ে কী যে মুশকিল! বেশি পীড়াপীড়ি করলে মনে হয় শিশুর জন্মগত অধিকার যেন কেড়ে নেয়া হচ্ছে।

আল্লাহ দেখেন না, এমন জায়গা কি কোথাও আছে? চাচী যে তাকে লুকিয়ে খাওয়াতে চান, সে কোথায় লুকাবে? মানুষ জীবজন্তু না হয় দেখলো না কিন্তু আল্লাহ তো সব জায়গাই দেখেন। তাঁর চোখের আলো সব জায়গায়ই পড়ে, এমনকি বুকের ভেতরও! তার চাইতে লুকানোর চেষ্টা না করে কষ্ট করাই ভাল। সোহেল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সে কারো ছলনায় ভুলবে না। গোপনে কিছু করবার চেষ্টা করবে না।

তার আব্বা-আম্মা তার দৃঢ়তা দেখে অবাক হন। তারা তার রোজা না রাখার জন্য তার ওপর পীড়াপীড়ি করেন না। কিন্তু সোহেলের চাচী তার জন্য খুব চিন্তিত। একটুখানি দুধের শিশু তার এত ধকল সইবে কেন?

এভাবে দিন গড়িয়ে চলে। সোহেল কয়েকটি রোজা পূরণ করে। তার আত্মীয় স্বজনেরা তাকে দেখতে আসে। সোহেল খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রথম দিনের দুর্বলতা অনেকটা কেটে গেছে। তার আব্বা-আম্মা এখন আর তার জন্য অতটা চিন্তা করেন না। কিন্তু তার চাচীর দুর্ভাবনা আর যায় না। তিনি সব সময় তাকে বুঝান এত অল্প বয়সে শরীরের ওপরে এত জুলুম আল্লাহর না পছন্দ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনগুলো অনেক বড় হয়ে চলেছে। ইলাস্টিক রাবারের মত টেনে টেনে যেন বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে দৈর্ঘ্য। সোহেলকে তো আগেই স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে। সে শ্লেট পেন্সিল নিয়ে স্কুলেও যায় আসে। তার সঙ্গীদের কেউ রোজা রাখে না। কেউ কেউ তার রোজা রাখা নিয়ে টিপ্পনি কাটে। কিন্তু রোজা নিয়ে আবার তাকে সম্মানও করে। একদিন তার এক সহপাঠী বললো, ডুব দিয়ে পানি খেয়ে ফেললেই তো হয়, কেউ দেখবে না। কিন্তু সোহেলের বিশ্বাস, আল্লাহ সব জায়গায় দেখেন, ডুব দিয়ে সে কোথায় যাবে?

একই কথা একদিন বললেন তার চাচী, তোর যখন এতই ভয় ডুব দিয়ে পানি খেতে পারিস না? কথাটা সোহেলের কাছে মন্দ ঠেকে না। সে একদিন দুপুরে পুকুরঘাটে নামে গোসল করার জন্য। মনে মনোস্থির করলো আজকে চাচীর কথামত সে ডুবে ডুবে পানি খাবে। তখন তো কেউ তাকে দেখবে না। সোহেল স্বচ্ছ পানিতে ডুব দিলো।



www.pathagar.org

তারপর দেখে এক আশ্চর্য কান্ড! চারদিকে অনেক ছোট ছোট মাছ ভিড় করেছে, আর চোখ বড় করে মাছগুলো তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিস্ময় ভরা চোখ মাছগুলোর! ওরা অবাক হয়ে তাকে দেখছে। হঠাৎ তার মনে হলো মাছগুলোর চোখের ভেতর দিয়ে আল্লাহ্ চেয়ে আছেন তার দিকে। সে আর দেরি না করে উঠে পড়ে পানি থেকে। ছুটে যায় বাড়িতে চাচী আম্মার কাছে। বলে, চাচী আম্মা! আপনার কথা ঠিক না। পানির ভেতরে আমি দেখলাম মাছেরা চোখ মেলে চেয়ে আছে আমার দিকে। আপনি ঠিক বলেননি। আল্লাহ্ পানির ভেতরেও দেখেন। চাচী লা-জাওয়াব হয়ে গেলেন। সোহেলের রোজা রাখা ঠেকান গেল না। এবারে সে রোজা পূর্ণ করলো এক মাস। এখন তার কী খুশি! সে এক মাস রোজা রেখে ঈদের জন্য তৈরি হলো। তার ঈদের আনন্দের তুলনা নেই। আব্বা-আম্মা তাকে ঈদের জন্য দিলেন বিশেষ পোশাক, রঙিন টুপি আর নতুন জুতা।

সোহেলের রোজা এবং ঈদ দুই সার্থক হলো।

জানুয়ারি, ২০০১



www.pathagar.org

# পাখির ডিম

## আবদুল আজিজ আল আমান

www.pathagar.org

কাফেলা থামল এসে এক মঞ্জিলে। দূর যাত্রায়, সফরে, মঞ্জিলে মঞ্জিলে থামতেই হয় কাফেলাকে। যাত্রাপথে নির্দিষ্ট থাকে মঞ্জিল। যেখানে গাছ থাকে। যেখানে ছায়া থাকে। যেখানে পানি থাকে। কিছু বিশ্রাম। খাওয়া-দাওয়া। রোদের তাপ কমে এলে আবার যাত্রা। মঞ্জিল ছেড়ে দূর পথে আপন গন্তব্যে।

গন্তব্যে যেতে যেতে সেদিনও কাফেলা থামল এক মঞ্জিলে। উটের লম্বমান ছায়া তখন ছোট হয়ে আসছে। প্রখরতা বেড়েছে কিরণের। কাফেলা এতে থামল গাছগাছালির ছায়ায়।

তারা নামলেন উট থেকে। সমর্পিত সাহাবীরা। জিনিসপত্র নামালেন। বিশ্রামের জন্য বসলেন ছায়ায়। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সকলে। ভাপ ছেড়ে তপ্ত লোহা শীতল হওয়ার মত শরীরটা জুড়িয়ে গেল যেন।

মরুর গাছগাছালির সরু আর শীর্ণ পাতার আড়ালে কয়েকটা পাখি মৃদু শব্দ করছিল। সেই ডাকাডাকিতে আকৃষ্ট হলেন এক সাহাবী। তারা কিচির মিচির করছিল। সেই ডাক অনুসরণ করে সাহাবী গেলেন সেখানে। হাজির হলেন এক গাছের তলায়। একেবারেই কাছে। পাখিরা পরস্পর আদর করছিল। ডানা ছড়িয়ে। গলা ফুলিয়ে। বেশ লাগছিল দেখতে। তাদের আদর দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেলেন তিনি। বেশ তো! আনন্দ পেলেন খুব। তাকিয়েই ছিলেন সেদিকে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটা বাসা। পাখির বাসা। দেখলেন বাসায় কয়েকটা রঙিন ডিম রয়েছে। ছোট ছোট। সেই ডিমগুলোর ওপর বসে তা দিচ্ছে মা পাখিটি।

ডিমের রঙ দেখে তিনি একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। যেন বালক বয়স ফিরে পেলেন। কত খেলাই না খেলেছেন তখন!

আস্তে আস্তে হাত বাড়ালেন বাসার দিকে। ভয়ে উড়ে গেল মা পাখি। আর তিনি টপাটপ তুলে নিলেন ডিমগুলো। তারপর দেখতে দেখতে সরে এলেন সেখান থেকে। ফিরে এলেন আপন জায়গায়। কাফেলায়।

মরুর হাওয়া যেমন বয়ে যাচ্ছিল তেমনি বয়ে যাচ্ছে। কিছুই হয়নি যেন।

মা পাখি ফিরে এল বাসায়। এসে দেখল ডিম নেই। চুরি গেছে তার অনাগত শাবকেরা। কেমন করে যেন পাখির রাজ্যে সাড়া পড়ে গেল। টেলিগ্রাম চলে গেল সর্বত্র। কোত্থেকে তারা এসে হাজির হলো। ছিল তিন কি চারটি। এখন আস্ত একটি দল। তারপর শুরু হলো তাদের সমবেত চিৎকার। সবচেয়ে বেশি ডাকছে মা পাখিটি। তার বুকে ব্যথা। সে ডাকছে। ডাক তো নয়, যেন বুকফাটা কান্না। উড়ে আসছে কাফেলার কাছে। আর ধুলোয় ডানা ঝাপটাচ্ছে। ছোট্ট ডানা দু'টি ফুলিয়ে বালি উড়াচ্ছে।

সচকিত হয়ে উঠলেন রাসূলুল্লাহ (সা)। উঠে বসলেন তিনি। ভালভাবে লক্ষ্য করলেন পাখিটাকে। পাখির দলটিকেও। কিছুক্ষণ। মা পাখি তেমনি ডানা ঝাপটায়। কিছুটা ধুলো উড়ায়ে আবার উড়ে যায় নিজের বাসায়। কষ্টে করুণ চিৎকার। শূন্য বাসায় ফিরে বুকটা বুঝি ফেটে যায় তার। আবার ছোট ডানায় ভর দিয়ে উড়ে আসে কাফেলার



www.pathagar.org

কাছে। ধুলোয় ডানা ঝাপটাতে থাকে আগের মতো। বেদনায় আকুল। তার আর্তনাদে আলোড়ন জাগায় রাসূলুল্লাহর (সা) বুকে যেন তুফান তোলে। হৃদয় দুলে ওঠে তাঁর। অবলা প্রাণী। ভাষা নেই। কিন্তু তবুও কেমন করে সে যেন তার সব নালিশটুকু জানিয়ে দিল রাসূলুল্লাহ (সা) কে। সে যেন বিচারপ্রার্থী মজলুম বিচার চায়। খুব ব্যথা পেলেন নবীজী। ব্যথায় কোমল হয়ে উঠছে ভেতরটা। সিক্ত হচ্ছে। সমব্যথী কণ্ঠে শুধালেন, তোমরা কে কী করেছ পাখিটার? কী ক্ষতি করেছ?

সেই সাহাবী ধীর পায়ে কাছে এলেন। নম্রকণ্ঠে বললেন, হুজুর আমি ওর বাসা থেকে ডিমগুলো নিয়ে এসেছি।

আহা করেছ কী! করেছ কী!! ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন রাসূলুল্লাহ (সা)। ডিম নয়, বাচ্চা। কারো বাচ্চা কি কেড়ে আনে কেউ? তার মায়ের কোল থেকে? বেশ কিছু সময় তার দিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, তোমার সন্তানের কথাই মনে কর না। কেউ চুরি করে নিয়ে গেলে কেমন লাগবে তোমার? কেউ কেড়ে নিয়ে গেলে? অ্যাঁ?

অপরাধীর মত হাতে ডিম নিয়ে সাহাবী বললেন, হুজুর আমি অন্যায় করেছি।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই অন্যায় করেছ। ভবিষ্যতে করো না। কেউ করো না তোমরা। এমন অন্যায় থেকে বিরত থেক। পাখির ডিম কেড়ে এনে এতক্ষণ ধরে এই যে পাখিটিকে কষ্ট দিচ্ছ– ওরও তো মায়া আছে। ওরও তো প্রাণ আছে।

ডিম হাতে সাহাবী ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সেই গাছটার দিকে। তারপর আস্তে, খুব আস্তে কোমল হাতে ডিমগুলো বাসায় রেখে ফিরে এলেন তিনি।

আশ্চর্য! দলবদ্ধ পাখির কিচিরমিচির থেমে গেল মুহূর্তে। মা-পাখি দুই একবার ঠোঁট দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল ডিমগুলো। তারপর পরম নিশ্চিন্তে বসে গেল তা দিতে। শিশু যেমন মুহূর্তে কান্না ভুলে কচি হাতে চোখ মুছে খেতে বসে নিশ্চিন্তে তেমনি। রাসূলুল্লাহ (সা) দেখছিলেন এতক্ষণ। এবার তাঁর মুখ প্রশান্ত হয়ে উঠল। তিনি যেন স্বস্তি পেলেন। এতক্ষণ একটা কাঁটা ফুটে ছিল বুকে। যন্ত্রণা হচ্ছিল ভীষণ। এখন সে কাঁটা নেই। ব্যথা মিলিয়ে গেছে। আরাম অনুভব করলেন তিনিও। শান্তি পেলেন।

শান্তকণ্ঠেই বললেন, এই সমস্ত নিরীহ জীবজন্তু সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। এদের কষ্ট দিও না। ব্যথা দিও না। শান্তিতে থাকতে দিও। এরাতো তোমাদেরই পরিজন।

দমবন্ধ সাহাবীরা নিঃশ্বাস নিলেন। তাঁদের মনে হলো মরুর হাওয়া হঠাৎ যেন ঘন আর শীতল হয়ে গেছে। এই মধুর স্পর্শ যেন ছিল না এতক্ষণ। নিবিড় আর শান্ত হয়ে সে হাওয়া বয়ে গেল অবিরাম। ঝির-ঝির- ঝির। নিরবধি! অবিশ্রান্ত!!

উৎস : বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, আবু দাউদ।

সাহায্য : সীরাতুন নবী, দ্বিতীয় খ-; অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭



www.pathagar.org

# মরণের ভয়

কাজী দীন মুহম্মদ

www.pathagar.org

অনেক দিন আগের কথা। ধু ধু মরুময় আরব দেশের একদিকে লোহিত সাগর, আরেক দিকে আরব সাগর। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এক গ্রামে এক জেলে বাস করত। জেলের নাম হিতান। সে বড় সাহসী ও শক্তিশালী। অনেক সময় তার জালে খুব বড় বড় মাছ আটকা পড়ত। সে সকল মাছ আকারে প্রায় তিমিমাছের মতো। তাই তার এলাকার লোকেরা তাকে নাম দিয়েছিল 'হিতান'। অর্থাৎ তিমিমাছ। একদিন হিতান মাছ ধরার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় পথে সে এলাকার শাসক হিব্বানের সঙ্গে দেখা। হিব্বান ইশারায় হিতানকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়? কী কাজ কর? কোথায় যাচ্ছ? হিতান সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললো, হুজুর, আমাকে লোকে হিতান বলে ডাকে। আমার বাড়ি ওই দূরে রিহান গ্রামে। এই বলে সে আঙুল দিয়ে ইশারা করে তার গ্রামের দিকে দেখিয়ে দিল। তারপর বলল : আমি মাছ ধরি এবং তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করি। এখন আমি মাছ ধরতে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি। হিব্বান জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা তুমি যে সমুদ্রে মাছ ধর, সমুদ্রে তো সময় সময় ঝড় ওঠে, তুফান হয়, বড় বড় পাহাড়ের মত কত ঢেউ উঁচু হয়ে আসে। অনেক সময় নৌকা ডুবেও যায়। তো, তোমার ভয় করে না?

হিতান বলে : হ্যাঁ, হুজুর ভয়তো আছেই। সমুদ্রে মাছ ধরা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। সময় সময় জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। হুজুর, আমরা গরিব মানুষ। দিন আনি দিন খাই। মৃত্যুর ভয়ে বাড়ি বসে থাকলে তো কেউ খেতে দেবে না। তাই বিপদের আশঙ্কা জেনেও সমুদ্রে যেতে হয়।

: আচ্ছা তোমার পিতা কী করতেন? হিব্বান জানতে চান

হিতান। আমার বৃদ্ধ আব্বাও মৎস্যজীবী ছিলেন। তিনিও সমুদ্রে মাছ ধরতেন। আমি ছোটবেলা থেকেই তার সঙ্গে মাছ ধরতে যেতাম। এখন তিনি আর নেই। দুই বছর আগে সমুদ্রে যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, সে সময় তিনি নৌকা ডুবে মারা যান।

: আচ্ছা, তোমার দাদা কী করতেন? হিব্বান আবার জিজ্ঞাসা করেন।

হিতান জবাব দেয় : হুজুর, তিনিও মাছ ধরতেন।

হিব্বান : তোমার দাদা কিভাবে মারা যান?

হিতান : হুজুর, তিনিও সমুদ্রের ঝড়ে পড়ে নৌকা ডুবে মারা যান।

হিব্বান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন : কী আশ্চর্য! তোমার দাদাও সমুদ্রে ঝড়ে পড়ে মারা গিয়েছে, তোমার বাবাও সমুদ্রে ঝড়ে পড়ে মারা গিয়েছে। কী! এরপরও তোমার ভয় হয় না? তুমি সেই সমুদ্রেই মাছ ধরতে যাও!

ইতোমধ্যেই হিতানের জড়তা অনেকখানি কেটে গিয়েছে। সে সোজা হয়ে নিঃসঙ্কোচে বিনীতভাবে বলে : হুজুর, আপনি তো আমাদের এ এলাকার শাসক। হিব্বান বললেন



www.pathagar.org

: হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? না হুজুর কিছুই হয়নি। যদি বেয়াদবি না নেন তাহলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। হুজুর আপনি তো দালানের সুন্দর কামরায় দুধের ফেনার মতো বিছানায় আরামে বসবাস করেন? তাই না?

: হ্যাঁ। –হিব্বান জবাবে বলেন।

হিতান জিজ্ঞাসা করে : হুজুর আপনার পিতা কোথায় থাকতেন?

হিব্বান : কেন, এ বাড়িতেই থাকতেন তিনি।

হিতান : তিনি কোথায় মারা যান? এবং কিভাবে মারা যান? হিব্বান : কেন, তিনি এ ঘরেই পালঙ্কের ওপরেই অসুস্থ অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

হিতান আবার জিজ্ঞাসা করে : হুজুর আপনার দাদা কোথায় ছিলেন? তিনি কোথায় কিভাবে মারা যান?

হিব্বান জবাব দেন : তিনিও এ বাড়িতে থাকতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে এ বাড়িতেই, এখন আমি যে ঘরে থাকি, সে ঘরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

হিতান এবার বিনয়ের সঙ্গে বললো : হুজুর! আপনার দাদা এ ঘরে, এ বিছানায় শুয়েই মারা গেছেন। আপনার পিতাও এ ঘরে, এ বিছানায় শুয়েই মারা গেছেন। তো! এ ঘরে এ বিছানায় শুতে আপনার ভয় করে না?

: কেন ভয় করবে? হিব্বান জবাব দেন।

হিতান বিনয়ের সুরে বলে : হুজুর, এই ঘরে আপনার দাদা ও আপনার পিতা উভয়ে মারা গেছেন। আর সে বিছানায়ই আপনিও শুয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান! আপনার মৃত্যুর ভয় নেই?

হিব্বান : ভয়ের কী আছে? মরণ এলে মরে যাব।

হিতান তখন ধীরে ধীরে বলে : হুজুর গোস্তাখি মাফ করবেন। আপনার দাদা ও বাবা মারা যাওয়ার পরও যেমন আপনার ঘর ও শয্যাকে আপনি ভয় করেন না, আমিও তেমনি সমুদ্রের ঝড় ও ঢেউকে ভয় করি না। আমার দাদা ও বাবা মারা গেছেন জেনেও আমি সেই ভয়াল সমুদ্রে মাছ ধরতে যাই। মৃত্যু এলে মরে যাব। ভয়ের কী আছে? আপনার কাছে আপনার শাহি বালাখানা এবং আরামদায়ক শাহি শয্যা যেমন, আমার কাছে ঝড়ো সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গও তেমনি।

ডিসেম্বর, ২০০০



www.pathagar.org

# ময়দানবের পুরী

আশরাফ সিদ্দকী

www.pathagar.org

এক দেশে ছিল এক রাজা-
মাণিককুমার, হীরাকুমার আর রতনকুমার এর আগে ডাকিনীরাজ্যে গিয়ে কত ধনরত্ন নিয়ে এলো- তা মনে আছে তো? সেই যে রাজা তার পুত্র মাণিককুমার।
সেই যে মন্ত্রী – তার পুত্র হীরাকুমার।
আর সেই যে কোতায়াল-তার পুত্র রতনকুমার। তিনবন্ধু দিনের শেষে একদিন রাজদীঘির শান বাঁধানো ঘাটে তামাল গাছের নিচে বিশ্রাম করছে। চারদিকে ফুলের বাগান– ফুলের মেলা, ঢেউ এর খেলা। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে।
এমন সময়– এমন সময় এক বেঙমা পাখি এসে হাজির। বেঙমা নেচে নেচে গানের সুরে বলতে লাগলো:

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর।
যাবে তুমি অচিন পুর।
শংখবর্তী নদীর কাছে।
এক যে বটের বৃক্ষ আছে।
সেই ডাকিনীর রাজ্যে গিয়ে।
হীরামাণিক আসলো নিয়ে।
বাঁচলো কতো রাজকুমার।
বিশ্ব জুড়ে সুনাম তার।

হ্যাঁ-গো মানিককুমার, হীরাকুমার, রতনকুমার। তোমাদের জন্য আরও একটি খবর আছে। তোমরা হলে রাজপারিবারের লোক-বীর। আর যাই হোক তোমাদের কি ঘরে বসে থাকলে চলে।
শোন-বেঙমা কি বলে:

সাত সমুদ্র তের নদী।
তার ওপরে যাবেই যদি।
সেথায় আছে হিমাল গিরি।
উত্তরে তারমাথার সিঁড়ি।
সেথায় যদি যবেই যাবে।
মণিমালার দেখা পাবে।

এই কথা বলে বেঙমা উড়ে গেল। হ্যাঁ দীর্ঘদিন পর রাজার দুধ বর্ণের একটি সুলক্ষণা কন্যা হয়, তার নাম রাখা হয় মণিমালা। সবারই আদরের ধন, এক ছেলের পর মেয়ে– কিন্তু মণিমালা একদিন হারিয়ে যায়। মাণিককুমার, হীরাকুমার ও রতনকুমার বেঙমার কথা শুনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলো। কি-? কি-?? কি-??? কি কথা-? কি কথা-?? কি কথা-??? ঘুচিয়ে দিলে দুঃখ ব্যথা। সেই সোনামনি মণিমালা বোনের খবর বলছে পাখি। তাদের একমাত্র বোন মাণিমালাকে অতি শিশুকালে কে যেন চুরি করে নিয়ে যায় রাজপুরীর বার্ষিক এক মেলার দিনে।
কত দেশে-দেশান্তর খুঁজেও দেশে দেশে দূতের মাধ্যমে এত্তেলা দিয়েও তাকে আর পওয়া যায়নি। রাজা-রানী সেই শোকে পাগল হয়ে যান। এখনও সে শোক ভোলেন নি



www.pathagar.org

তারা। আহারে আমার সোনামণি বোন- ভাই এর আদরে বোন- মানিককুমার হারানো বোনের শোকে আবার যেন অস্থির হলো। হীরাকুমার, রতনকুমারও বন্ধুরশোকে উতলা হলো। বললো, চিন্তার কি কারণ? চলে রাজজ্যোতিষীকে এত্তেলা দিই। এর কাছে 'আগাম- নির্গম' বার্তা শুনি। বার্তা ধরি। তারপর শুভদিন দেখে একদিন যাত্রা করি। আমরা এইতো সেদিন ডাকিনী রাজ্যে গেলাম, কত বিপদ আপদ তুচ্ছ করে ফিরে এলাম। আর রক্তের বোন-মণিমালাকে কোলে পেলে আমাদের বৃদ্ধা পিতামাতা কতই না খুশি হবেন। তাদের হয়তো আয়ুই বেড়ে যাবে।

তারপর একদিন রাজ-জ্যোতিষী এলো। থুর-থুরে বৃদ্ধ জ্যোতিষী মাটিতে আকর বাকার ছবি আঁকে-আঁক কষে।

পশ্চিমে আকঁ কষে বলে-পশ্চিমংভম্ ভম্।
দক্ষিণে আঁক কষে বলে দক্ষিণমভম্ ভম্।
পূর্বে আঁক কষে বলে পূর্বংভম্ ভম্।
উত্তরে আঁক কসে বলে-উত্তরং ভম্ ভম্ ভরম্ ভম্।

হ্যাঁ-হ্যাঁ-পাওয়া গেছে-পাওয়া গেচে রাজপুত্রগণ! তোমার উত্তরে যাবে-হাঁ-হাঁ পাওয়া গেছে উত্তরং সুলক্ষণম। উত্তরে আছে-ভম্ ভম্ বভম্ ময়দানয়ং উত্তরে হাঁ- হিমালয়ং পাহাড়ং-মানে হল গিয়ে হিমালী পাহাড় সেখানেই ময়দানবের পুরী। আর পথে পাবে বন্ধুনাং-হরিণী রাজ্য। তারাও হয়তো সাহায্য করবে। তবে হাঁ-কাজটি বড়ই ধুম্রাজালং-কঠিনম– তোমাদের মায়েদের দ্বারা শান্তিস্বস্থয়নং – যাতে সব দিকে শান্তি হয়:

যাবো যাবো-কালই যাবো।
মণিমালার দেখা পাবো।
পংখীরাজ ঘোড়া সাজাও।
শুভ যাত্রার শানাই বাজাও।

তিন মাতা-রাজমাতা, মন্ত্রীমাতা আর কোতোয়াল মাতাকে অতি কৌশলে বলা হলো, মায়েরাগো আমাদের শরীরটা মাঝে মধ্যে কেমন প্যাচ প্যাচ-ম্যাজ ম্যাজ-আছে বেজ করে, জ্যোতিষী বলেছন– তোমাদের দ্বারা শান্তি স্বস্থয়ন করতে। তিনি মাতা একথা শুনে ওঠেন কি বসেন-কি ওঠেন-আলাই-বালাই-মা কালাই-ঝেড়ে ফেলাই। আজই আমরা তিন বোনে স্বস্থয়ন করবো।

যথারীতি সাত মাটির কলসে আম্রপত্র দেয়া হল। সাত সমুদ্র-সাত নদী-সাত দিঘি সাত কুয়ার পানি এলো, সাত কবিলী গাভীর দুধ, সাত মায়ের কাজর, সাত পাখির পালক, সাত বাগের কফুল সাত গাছের পান এলো সাত গাছের সুপারী এল সাত ক্রয়ের বাড়ির চুনা চন্দন এলো তারপর মায়েরা মুখে পান দিয়ে পানের পিক মুখে নিয়ে মন্ত্র পড়লেন কুমারদের সামনে বসিয়ে।

অইলেন গো রক্ষনাথ বইলেন খাটে।
পা ধুইলেন দীঘির ঘাটে।
দুধ বেচিয়া আনলাম কড়ি।



www.pathagar.org

তাই দিয়া কিনলাম কপিশেরী।
দুধ দিবে সে হাঁড়ি হাঁড়ি... হেচ্ছ হেচ্ছ...
উত্তরের দেশে পানে ডাউগ।
আমার বাছাদের বিঘ্ন যাউক।
পূর্বদেশে শুপরির ডাইজ।
আমার বাছাদের বিঘ্ন যাউক... হেচ্ছ হেচ্ছ...

যতবার মায়েরা হেচ্ছ বলে ততবার তাদের মুখের পানের পিকে ভেসে যায় কুমারদের মাথা-শরীর-পা-

এবার তিন মা কুমারদের মাথায় হাত দিয়ে স্বস্থয়নী মন্ত্র পড়লেন:

আদি বন্দম আনাদি বন্দম
ষোলাশ জাকিনী নাগিনী বন্দম।
মায়ের আঁচলি লড়ে।
মায়ের চক্ষের জল পড়ে।
আমরা পুতেরা যেন লোহার দন্ত হয়ে–
মা হয়ে দিলাম রে।
ঘর আলো করে।

এই বলে রাজপুরীর উপস্থিত সব মায়ের কলসীতে রাখা পানি, চুয়া, চন্দন, কাজল, পাখির পালক, ফুল দুধ– বাছাদের মাথায় চিটিয়ে ছড়িয়ে দিল।

এবারে সাত ত্রয়ো সাত কলা সাজিয়ে তাতে জ্বেলে দিল সাত ঘিয়ের বাতি। আর, আর সেই সময় ঘোড়াশালে একশত পঙ্খীরাজ ঘোড়া চিঁ-হি-হি-হি করে উঠলো। হাতীশালে মা হাতি মাথার শুড় তুলে-ব্রিং-ব্রিং বৃংহতি করে তার বাচ্চাটাকে আদর করলো রাজপুরীর কবিলা গাভীর বৎস কোথা থেকে ছুটে এসে আনন্দে হাম্বা-হাম্বা করে মায়ের দুধ খেতে লাগলো। রাজপুরীর মরা কদম গাছে হঠাৎ করেই ফুল ফুটে উঠলো। রাজপুরীর ঘন্টা আপনা আপনিই বেজে উঠলো ঢং-ঢং-ঢং। রাজ জ্যোতিষী সাদা মাথা নেড়ে বললো।

ভম্-ভম্-ভম্-ভম্-বভম্-বভম্-
যাত্রা বড়ই সুলক্ষণ।

মা বাবা সাভাসদ লোকজন সবার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে তিন বন্ধু রওনা হল খুব সকালে। যাত্রা-যাত্রা-ঊষা যাত্রা করে- যাত্রা ঊষা যাত্রা, যেদিকে খুশি সেদিকে যা। তিন বন্ধু পংক্ষীরাজের পিঠে উত্তরে ছুটছে-ছুটছে-ছুটছে। পঙ্খীরাজ-এর মুখে ফেনা উঠেছে-উঠছে-উঠছে। অবশেষে সন্ধ্যায় তারা গিয়ে পৌছলো এক অচিন রাজ্য সেখানে এক প্রাচীন বটের গাছ। সারাদিন পরিশ্রম গেল। সঙ্গে খাবার দাবার যা ছিল তিন বন্ধু মিল খেয়ে ফেললো। পাশের ঝরণা থেকে মিটা পানি এনে প্রাণভরে পান করে তিন বন্ধু ঠান্ডা হলো প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। তারপর রাজপুত্র বলো, জন নেই মানুষ নেই পাখ পাখালীর শব্দ নেই, চারদিকে কেমন নির্জন, চারিদিকে কেমন সুনসান সানসান।



www.pathagar.org

কখন কি বিপদ আসে গুম আসবে কি সেই ত্রাসে। তার চেয়ে চলো তিন বন্ধু প্রহর ধরে রাত্র জাগি পালা করে। রতন কুমার, হীরাকুমার পলা এক প্রহর, দুই প্রহর শেষ হলো। না তেমন কিছু ভয়ের কারণ দেখা গেল না সবেশেষে এবারে ওবেলা রাজপুত্রেরই পালা। এমন সময় হাঁ এমন সময়, এমন সময় দেখে কি একদল হরিনী ঝরণায় পানি খেতে এসেছে। রানী হরিণীটি সবার পেছনে। হঠাৎ হঠাৎ কোথা থেকে একটা অজদাহা অজগর এসে একটি হরিণীকে ধরে ফেললো রানী হরিণী রাজপুত্রকে মানুষের জবানীতে বললো রাজপুত্র! রাজপুত্র! দেখো ।

আমাদের বড়ই বিপদ। তুমি যদি ধর্মের রাজপুত্র হও তবে হরিণীটিকে বাঁচাও-প্রতিদানে দেব, যা চাও। কি বললে! 'ধর্মের রাজপুত্র'-এতবড় কথা! প্রাণ থাকুক-যাক-যথা তথা। প্রাণ গেলেও তোমাদের করবো রক্ষা না হয় পাব অক্কা। তলোয়ার খুলে রাজপুত্র একছুটে গিয়ে এক কোপে অজগরের মাথা কেটে ফেললো। হরিণীটিও প্রানে বেঁচে গেল। রানী হরিণী বললো :

রাজপুত্র ধর্মরাজ।
মাথায় তোমার সোনার তাজ।
যদি কোনদিন বিপদে পড়ো।
এই নাও আমার মায়া কস্তুরী-
আমাকে স্মরণ করো ॥

রাত প্রভাত হলো। তিন বন্ধু আবার পংক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটলো-উত্তরে হিমাল পাহাড় দিকে।

হিমালগিরি। হিমালগিরি ॥
আর যে কত দূরের পাড়ি।

অবশেষে একে একে জিজ্ঞাসা করে-দুইদিন দুই রাত পরে পৌছেও গেল হিমেলপুরে। কিন্তু কি ভাবে যাবে সে পাহাড়ে? মধ্যে যে বিরাট খাঁদ। কি ভয়ানক শীত, দাঁতে লাগে দাঁত। খুঁজতে খুঁজতে তারা দেখতে পেল একটা সরু সিঁড়ি। তাহলে এটাই কি মায়া সিঁড়ি? একজন মাত্র যাওয়া যায়।

কে যাবে?
কে যাবে?
রাজকুমার বলে আমি।
মন্ত্রীপুত্র বলে আমি।
কোতোয়ারের পুত্র বলে আমি।

মন্ত্রীপুত্র বললো সেই আগে যাবে বলতে বলতেই ছুটলো পংক্ষীরাজ ঘোড়া। প্রায় পার হয়েছে-দিয়েছেপাড়ি-এমন সময় ঝপাৎ করে পড়ে গেল সেই সিঁড়ি। রাজপুত্র কোতোয়াল পুত্র অবাক। বন্ধুর শোকে দুজনেই হায় হায় করে কাঁদতে লাগলো। এখন কি করি? কোন বিপদে পড়ি।

রাজপুত্র বললো, ঠিক আছে। পংক্ষীরাজ আমায় নিয়ে লম্ফ দিয়ে পার হতে হবে এই



www.pathagar.org

খাঁদ। কোতোয়ার পুত্র বললো, না না-তা হয়না বন্ধু। আমি পার হবো আগে।

আমি-না-তুমি-
তুমি-না-আমি-
আমি-না-তুমি।

বলতে বলতে কোতোয়াল পুত্র পংক্ষীরাজ ঘোড়াকে চাবুক মারলো। ঘোড়া লাফ দিয়ে প্রায় ওপারে গিয়ে-আহারে-আহারে-গেল আবার সেই খাদে পড়ে।

রাজপুত্রের সে কি কান্না। তার দুঃখে বৃক্ষেরও পাতা ঝরে। সাত আসমান মেঘ করে। বায়ু কাঁদে মর্মরে। পাষাণও তার চোখের জলে গেল।

হঠাৎ কুমারের মনে পড়রো, রানী হরিণীর কথা। হরিণীর দেয়া কস্তুরীটি হাতে নিয়ে রাজপুত্র এই বিপদে তাকে স্মরণ করলো:

যদি হও তুমি সত্যের হরিণী।
তবে আসবে এক্ষুনি॥
যদি না আস তবে
রাজপুত্র আত্মঘাতি হবে।

এই বলে সে তলোয়ার তুললো নিজের শীর লক্ষ করে। আর কি আশ্চর্য। দেখো-দেখো-দেখো-দক্ষিণ দিক থেকে সব হরিণ দল বেধে আসছে। আর সেই রানী হরিণী সবার আগে। হরিণী আসছে-আসছে-আসছে। পথে পথে যেন বন্যা ভাসছে। পথে পথে যেন রংধনু। হলুদ বাংলার বরতনু।

রানী হরিণী বললো, রাজপুত্র আমি সব জানি। আমার দলবল খানা খন্দ খুঁজে চুড়ে-তোমার দুই বন্ধুকে এক্ষুনি আনবে উদ্ধার করে। হলও তাই। হরিণীর দল মন্ত্রীপুত্র কোতোয়াল পুত্রকে নিয়ে এলো। তারপর বিশল্যকরলী আর মৃত সঞ্জিবনী গাছে পাতা দিয়ে তাদের জলমহল ভালো করে তুললো। পংক্ষীরাজ ঘোড়া দুটিকেও খুঁজে এনে তাদের হাড়-গোড় জোড়া দিয়ে দিল। এরা আনন্দে চিঁহি চিঁহি করে উঠলো।

রানী হরিণী এবার তিন কুমারকে বললো, কুমারগণ! এতো মায়া সিঁড়ি। এই সিঁড়ি তো পার হওয়া যাবেনা। নীল সাগরের পারে আছে এক বামন মুনি-গভীর জঙ্গলে তার আশ্রম বাড়ি। এক হাত মুনি তার দেড় হাত দাড়ি। সেখানেই দিতে হবে পাড়ি- অতি তাড়াতাড়ি।

কুমারগণ বললো, আমরা তো পথ চিনি না। হরিণী বললো, চিন্তা নাই-জানি ঠিকানা। তারপর হরিণের পাল চললো আগে আগে, আর তিন পংক্ষীরাজ ঘোড়া পাছে পাছে। দুই দিন দুই রাত চলার পর তারা পৌছলো গভীর জঙ্গলে-বামন মুণীর আশ্রমে। মুণী ছিলেন ধ্যানে-বুঝলেন সব জ্ঞানে।

রানী হরিণী অতি বিনয়ে মুণী বাবাকে সব বুঝিয়ে বললো। আরও বললো:

রাজকন্যা মনিমালা বন্দী হিমালপুরে।
সেই না দুখে রাজা রানীর চক্ষে পানি ঝরে।
পথ বলে দাও- কেমনে যাবো
সেই পাহাড়ের চূড়ে॥



www.pathagar.org

বামন মুণী ধ্যানস্ত হলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ রাজকন্যা সেখানেই বন্দিনী। তবে কিনা সে বড় কঠিন স্থান ময়দানবের পুরী। সেখানে থেকে কেউ আসেনা ফিরে। সেই পুরীতে আছে ভয়াবহ অজগর। তার নিঃশ্বাসে বিষ। সে সারা দিন পর সন্ধায় মাত্র একবার পদ্মফুল খেতে বের হয়। সেই সরোবারের পাড়।

তারপর মন্ত্র পড়ে নিমিষে গড়ালো এক তলোয়ার। এই নাও-না-সেই মায়া তলোয়ার। এটি তোমায় দিচ্ছি রাজকুমার। এটি হাতে অদৃশ্যভাবে মায়া সিঁড়িও হতে পারবে পার। আর শোন সেই সরোবারের মধ্যে অজগরের মধ্যে আছে ময়দানবের প্রাণ। নি:শ্বাস বন্ধ করে সেই সরোবারে নেমে, এক আঘাতে যদি অজগরের মাথা কাটতে পারো, তবেই সব ময়দানবের বংশ তক্ষুনি কাটা পড়বে। নইলে কিন্তু সেখানেই সা-রা-জী-ব-ন পা-থা-র হয়ে থাকতে হবে।

সাবধান! আর সেখানে পৌছেই এই মন্ত্র পড়তে হবে ঃ

দোহাই ধর্মের বিষ পাবনে মিলাও।
মুণীজির আড্ডা বিষ পাতারেতে যাও ॥
হাড়িকির আজ্ঞা বিষ ময় হইয়া যাও।

সাবধান! এই মন্ত্র না পড়লে কিন্তু সাপের নি:শ্বাসে সবাই পুড়ে যাবে।

হরিণীর দলবলসহ তারা মায়া সিঁড়ি কাছে এলো তলোয়ার আছে হাতে-একজনের হাত অন্যের হাতে-অদৃশ্য হয়ে পার হলো তিন কুমার তক্ষুণি-সঙ্গে শুধু রানী হরিণী। সন্ধ্যায় হরিণী তাদের একই পথ দেখিয়ে সরোবারের ধারে নিয়ে গেল। দেখলো সরোবারের অর্ধেক জুড়ে আজদাহা এক অজগর-গভীর পানিতে নিঃশ্বাসে আমফুল খাচ্ছে। অজগরের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে যাতে তারা জ্বলে না যায় সেজন্য পড়ে নিল সেইমন্ত্র। অজগর পেছন ফেরতেই বিদ্যুৎ বেগে লাফিয়ে পড়ে তলোয়ারের এক আঘাতে তার মাথা কেটে ফেললো রাজকুমার। আর অমনি সেই পুরীতে মাথা কাটা গেল সব দৈত্যের। চারিদিকে কি মহা আর্তনাদ!

অ্যাঁ বেঁঙ গ্যাঁঙর গেঁঙ
মাথা রইলো কইরে ঠেঁং।
চঁক্ষু আঁছে দৃঁষ্টি নাঁই
আমরা এখন কোথায় যাঁই ॥

ময়দানব তার এক লক্ষ পুত্র এবং সোয়া লক্ষ নাতী নিয়ে সবাই অক্কা পেল।

একলক্ষ পুত-সোয়ালক্ষ নাতী।
কেহ মাত্র না রহিল বংশ দিতে বাতি ॥

রাজপুত্র মনের আনন্দে মণিমালাকে নিয়ে দেশে ফিরে এল। [রূপকথা]

ঈদ সংখ্যা ॥ জানুয়ারী, ২০০০



www.pathagar.org

# পেন্সিল

## নাজমুল আলম

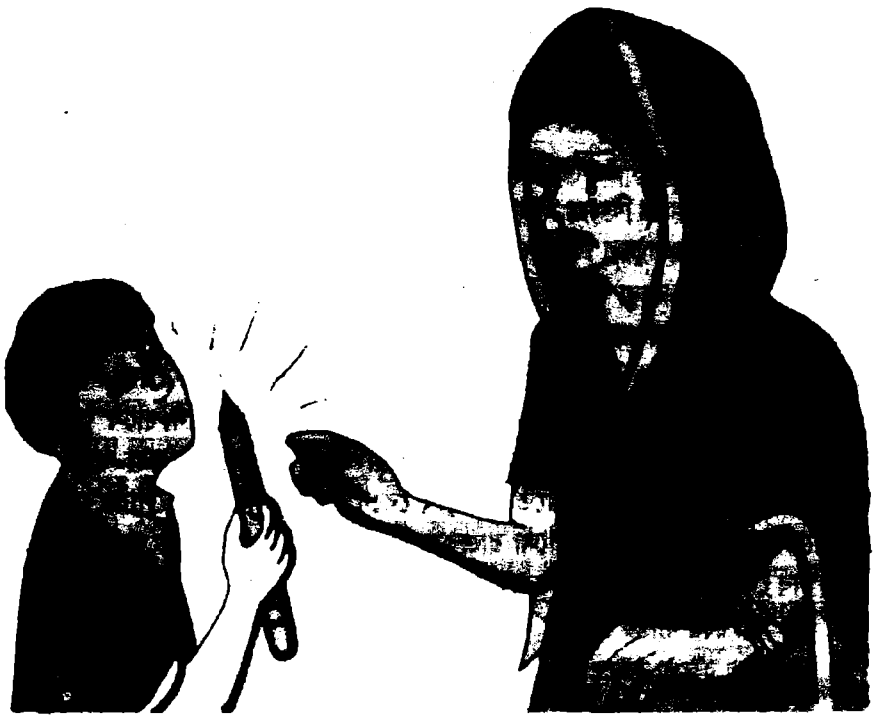

www.pathagar.org

আমি তখন ছোট। বয়স হবে আট-নয় বছর।
স্কুলে পড়ি।
আব্বা উত্তরবঙ্গে এক মফস্বল শহরে চাকরি করতেন।
তিনি ছিলেন স্কুল পরিদর্শক।
সান্তাহার জংশন স্টেশন হিসেবে ছিল বিখ্যাত। আমাদের বাসায় এক বুড়ি ঝি কাজ করতো। তার ছেলে চান্দুর বয়স আমারই মতো হবে। চান্দু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো। আর লেখাপড়ার দিকে ছিল তার খুব ঝোঁক।
আমি পড়তে বসলেই সে আমার কাছে এসে বসতো। আর মন দিয়ে আমার পড়া শুনতো। ওর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। আমার পড়া শুনে শুনে ও মুখস্থ করে ফেলতো। একদিন পেন্সিল দিয়ে কী যেন লিখছি, চান্দু কোত্থেকে এসে বললো, ভাইজান, পেন্সিলটা আমাকে দেবে?
– পেন্সিলটা তুই নিবি? কী করবি?
– কী করবো? লিখবো। পেন্সিলটা আমার ভারি পছন্দ। ভয় নেই, আমার লেখা হয়ে গেলেই পেন্সিলটা আবার তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।
পেন্সিলটা ছিল আমার খুব সখের। অনেক রকম রঙের পেন্সিলটার মাথায় ছিল একটা নীল রঙের রাবার লাগানো। দিতে আমার মন চইলো না। তুবও অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিলাম।
আমার মনের অবস্থা হয়তো চান্দু টের পেয়েছিল। হেসে বললো, দেখো ভাইজান, পেন্সিলটা আমি তোমাকে ঠিকই ফিরিয়ে দেবো। পেন্সিলটা নিয়ে ও খুশি হয়ে চলে গেল। একদিন সকালে খুব মন দিয়ে স্কুলের পড়া তৈরি করছি। চান্দু কোত্থেকে এসে কাছে বসলো। তারপর এ কথা সে কথায় বললো, জানো ভাইজান, আমি মনের কথা টের পাই আর কখন কী হবে আগে থেকে ঠিক বলে দিতে পারি।
আমি চোখ তুলে বললাম, তাই নাকি?
– হ্যাঁ, দেখো, তুমি আজ স্কুলে মার খাবে।
আমি হেসে উঠলাম। পড়াশোনায় খুব খারাপ ছিলাম না আর এর জন্য মাস্টারের হাতে কোনো দিনই মার খাইনি। তাছাড়া সেদিনকার পড়াও খুব ভালো করে তৈরি করেছিলাম। তাই চান্দুর কথায় হেসে উঠলাম।
কিন্তু সেদিন স্কুলে গিয়ে সত্যিই মার খেলাম। সেদিনকার স্কুলের পড়া মোটেই তৈরি হয়নি। রুটিন দেখতে ভুল হয়েছিল। বৃহস্পতিবারে পড়া বুধবারে তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। বুধবারের পড়া তৈরি করিনি।
সেকেন্ড পণ্ডিত একবার এসে আলতো করে আমার কান ধরেছিলেন। এতে আমার মনে খুব লেগেছিল। আর অবাকও হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, চান্দুর কথাটা এমনভাবে ফলে গেল কেমন করে?
চান্দু এমনিতে ছিল বড় দুরন্ত। মাঝে মাঝে ছুটিছাটার দিনে দুপুর বেলার দিকে ওর সাথে বেরিয়ে পড়তাম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে। কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে সোজা চলে



www.pathagar.org

যেতাম ছাতিন গ্রামে। বিখ্যাত রানী ভবানির জন্মস্থান এই ছাতিন গ্রাম।
ফিরতি পথে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার ধারের আমগাছে চড়ে কাঁচ-মিঠে আম প্রাণ ভরে খেতাম। আর আমার ছোট বোন লালুর জন্য নিয়ে আসতাম।
বেমক্কা গাছ দেখলে আমি উঠতে সাহস করতাম না। চান্দুই উঠতো।
আব্বা মফস্বলে স্কুল ভিজিট করতে গেলে প্রায় সময়ই চান্দুকে সাথে নিয়ে যেতেন। চান্দু আব্বার সাথে থেকে এটা ওটা ফাই ফরমাশ খাটতো।
কী কাজে যেন আব্বার কলকাতা যাওয়ার দরকার পড়লো। চান্দু সঙ্গে যাবে। আমরা ভাইবোন যার যার চাহিদা মতো জিনিস আনবার জন্য আব্বার কাছে লিস্ট দিলাম।
চান্দুকে বললাম, চান্দু তুইতো সাথে থাকবি। আব্বাকে মনে করিয়ে দিবি, আমাদের জিনিসগুলো কেনার জন্য। চান্দু মুখ কালো করে বললো, আমি আজকে যাবো না।
– যাবি না কিরে?
চান্দু তেমনি মুখ ভার করে বললো, খালুজানকে বলো, আমি আজকে যাবো না। খালুজানও যেন আজকে না যান।
আব্বাকে বললাম। আব্বা প্রথমে হাসলেন। তারপর খুব রাগারাগি করলেন।
চান্দুর মা শুনে চান্দুকে খুব মারলো।
আব্বার মন খারাপ হলো। উনি সে রাতে যাওয়া স্থগিত করলেন।
পরদিন সকালে খবর পাওয়া গেল যে, মাজদিয়া স্টেশনে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস ও ঢাকা মেলের মধ্যে সাংঘাতিক এক্সিডেন্ট হয়েছে। শত শত লোক হতাহত হয়েছে।
আমরা সবাই তটস্থ হয়ে খবরটা শুনলাম। নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসেই আব্বার কলকাতা যাবার কথা ছিল।
আব্বা আল্লাহর কাছে শোকর গোজারি করলেন। চান্দুর প্রতিপত্তি বেড়ে গেলো।
তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। আব্বা প্রায়ই চান্দুকে নিয়ে মফস্বলে ট্যুরে যেতেন।
একবার আমার ছোট বোন লালুর তখন জ্বর। আব্বার মফস্বল যাওয়ার তারিখ এসে পড়লো। আব্বা ঠিক করলেন, এবার চান্দুকে নিয়ে যাবেন না। লালুর জ্বর। বাড়িতে অনেক কাজ।
সন্ধ্যোবেলায় আমার কাছে এসে চান্দু ফিস ফিস করে বললো, ভাইজান, খালুকে মফস্বলে যেতে মানা করো।
ভয়ে ভয়ে আব্বাকে গিয়ে বললাম। আব্বা হেসে উঠলেন, বললেন সব সময় সব কথা কেউ আগে থেকে ঠিকঠাক বলতে পারে? আমাকে এবার ট্যুরে যেতেই হবে। সব ঠিকঠাক। আমার ওপরে যিনি চাকরি করেন, তিনিও আসবেন। এক সাথে স্কুল দেখতে যেতে হবে।
আব্বা পরদিন রওয়ানা হলেন।
ছোট বোন লালুর তখন ভীষণ জ্বর।
সেদিন বিকেলে লালুর জ্বর কমলে সে বললো, ভাইজান কাঁচা-মিঠে আম খাব। আমি আর চান্দু মাকে না বলে জেলা বোর্ডের রাস্তায় আমগাছে আম পাড়তে গেলাম।



www.pathagar.org

চান্দু গাছে চড়েছে আর আমি লোহার পুলের ওপর বসে আছি, চান্দুকে আম দেখিয়ে দিচ্ছি। পুলটি বড় সরু।

পুলের নিচেই খাল। খালের ধারে কাঁটা ঝোপের ওপর পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। হঠাৎ চান্দুর চিৎকার শুনে দেখি, পুলের ওপরে একটা টম টম (এক ঘোড়ার গাড়ি) উঠেছে আর উল্টো দিক থেকে একটা গরুর গাড়ি আসছে। টমটমের ঘোড়া দেখে গরুর গাড়ির গরুটা ভয় পেয়ে আমার দিকে তীর বেগে ছুটে আসছে।

কিছু বোঝার আগেই আমি ছিটকে পড়ে গেলাম দশ হাত নিচে খালের পাড়ে।

জ্ঞান হলে দেখি চান্দু আমাকে ধরে আছে। বলছে, ভাগ্যিস কাঁটা ঝোপের ওপর পড়োনি, খুব বেঁচে গেছো।

সত্যিই খুব বেঁচে গেলাম। কাঁটা ঝোপের ধারে খাদের কাদামাটির ওপর পড়েছিলাম বলে বিশেষ কিছু হয়নি। গায়ের কাদামাটি ঝেড়ে বাড়িতে ফিরলাম।

পরদিন সকালে স্কুলের পড়া তৈরি করছি। হঠাৎ গোলমাল শুনে বাইরে এসে দেখি আব্বা স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। কতকগুলো লোক ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে আসছে। এক অজানা আশঙ্কায় আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠলো।

শুনলাম আগের দিন বিকেলে আব্বা যখন স্কুল দেখে টমটমে চড়ে ফিরছিলেন, তখন রাস্তার বাঁকে একজনের সবজি খেতের বেড়ায় খুঁটির সাথে চাকা আটকে টমটম উল্টে যায়।

আব্বা ছিটকে গিয়ে পড়েন কাছেই শানবাঁধানো এক ঘাটের ওপর। তাতে আবার মাথা ফেটে যায়।

আব্বার এই অবস্থা দেখে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। আমি আর চান্দু সময় হিসাব করে দেখলাম আমি যখন পুলের ওপর থেকে খাদের কাদামাটির ওপর পড়েছিলাম, ঠিক একই সময়ে আব্বার দুর্ঘটনা ঘটে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার!

এরপর থেকে চান্দু কোনো কথা বললে বাড়ি সুদ্ধ কেউ সহজে তা আর অগ্রাহ্য করতে সাহস পেতো না।

বেশ কয়েক মাস ভুগে আব্বা সেরে উঠলেন।

কিছুদিন পরের কথা।

আব্বার বদলির হুকুম হয়েছে।

আর কয়েকদিন পরই আমরা সান্তাহার ছেড়ে চলে যাব।

আমাদের বাসা থেকে কিছু দূরে শ্যাওলা ভর্তি একটা পুরনো পুকুর ছিল।

সেখানে মাঝে মাঝে আমরা গোসল করতাম। সেদিন সকালে পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে গোসল করছিল। বয়স্ক লোক সেখানে কেউই ছিল না। ঘাটের পাড়ে বসে চান্দু কাপড় কাচছিল।

আমিও সেখানে ছিলাম। হঠাৎ দেখি, পাড়ারই একটি ছোট্ট মেয়ে রীনা সাঁতার কাটতে কাটতে অনেক দূর চলে গেছে। ফিরতে পারছে না। হাত পা ছুড়ছে আর পানি খাচ্ছে। আমরা কেউই তখন সাঁতার জানতাম না। রীনার অমন অবস্থা দেখে আমরা সবাই



www.pathagar.org

চেঁচিয়ে উঠলাম।

হঠাৎ চান্দু পানিতে বাঁপিয়ে পড়লো। চান্দু সাঁতার জানতো। সে সাঁতার কেটে রীনাকে গিয়ে ধরলো।

দু'জনে কিছুক্ষণ হাত-পা ছোড়াছুড়ির পর পানির তলায় তলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর চান্দু রানীকে নিয়ে ভেসে উঠলো। সে অতি কষ্টে ভাসতে ভাসতে রীনাকে টেনে পাড়ের কাছে আনতেই আমরা গিয়ে রীনার হাত ধরলাম। কিন্তু চান্দু পানির ঢেউয়ে তলিয়ে গেল।

আমরা ছেলেরা সবাই হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলাম। চেঁচামেচি শুনে পাড়ার লোকজন ছুটে এলো। সেবাযত্ন করে রীনাকে তারা বাঁচিয়ে তুললো।

চান্দুর জন্য তারা পুকুরে জাল ফেললো, ডুবুরি নামলো, কিন্তু বিকেল পর্যন্ত চান্দুকে পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যের একটু আগে পানির তলা থেকে চান্দুকে টেনে তোলা হলো, কিন্তু সে দেহে তখন আর প্রাণ নেই।

আমি আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। জীবনের সেই চরম আঘাত পাওয়া দিনগুলোকে মনে হয় যেন সেদিনের কথা। পরদিন সন্ধ্যার ট্রেনে আমরা সান্তাহার ছেড়ে চলে এলাম চিরদিনের মতো। ফেলে এলাম আমার এবং আমাদের পরিবারের প্রিয় বন্ধু চান্দুকে।

সবাই স্টেশনে এসেছে। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এলো।

চান্দুর মা ছুটতে ছুটতে এলো আমাদের বিদায় দিতে। আমি চান্দুর মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

চান্দুর মা আমার কাছে এসে বললো, ছোট মিয়া, আমাদের ভুলো না। আবার বেড়াতে এসো। তুমিও আমার চান্দুর মতোই ছিলে, বলে চান্দুর মা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

চোখ মুছে আঁচলের খুঁট থেকে কী যেন একটা বের করে হাতের মুঠিতে ধরে সে বললো, ছোট মিয়া, চান্দু এই পেন্সিলটা দিয়ে লিখতো আর আর বারবার করে বলতো, মা তুমি পেন্সিলটা ভাইজানকে ফিরিয়ে দিও। আমি ভুলে যেতে পারি কিন্তু তুমি কিন্তু ভুলো না আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, আমার দেয়া চান্দুর সেই পেন্সিল। আমি শক্ত করে পেন্সিলটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলাম। বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো।

ট্রেন ছেড়ে দিলো।

সান্তাহার জংশন স্টেশনের সিগন্যালের লাল-নীল আলো ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে ম্লান হয়ে এলো।

ট্রেনের ঘড় ঘড় শব্দের মাঝে আমি যেন চান্দুর কথা শুনতে পেলাম, ভাইজান, সত্যি বলছি, দেখো পেন্সিলটা আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব ঠিক ফিরিয়ে দেব....।

ঈদসংখ্যা : জানুয়ারি, ২০০০



www.pathagar.org

# জ্যোতিষীর ভাগ্য

আবদুর সাত্তার

www.pathagar.org

পারস্যের সিরাজনগর। সেই সিরাজনগরে বাস করত এক গরিব লোক। স্বামী-স্ত্রী মিলে ঝুড়ি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করত। কোনো রকমে তাদের দিন চলে যেত। একদিন গরিব লোকটির স্ত্রী গেল পাশের এক হাম্মামে মানে, গোসলখানায় গোসল করতে। সেখানে গিয়ে দেখে অতি-উত্তম পোশাকে সজ্জিত এক মহিলা। সেও এসেছে হাম্মামে গোসল করতে। হাম্মামের পরিচারিকারা তাকে নিয়েই ব্যস্ত। গরিব মহিলাটির দিকে ফিরেও তাকাল না। আরও দুঃখের কারণ এই যে, উত্তম পোশাকের ধনী মহিলা গোসল করার অধিকার পেল আগে এবং গরিব মহিলা গোসল না করেই ফিরে এল। ফিরে আসার সময় তার জানতে ইচ্ছে হল, এই ধনী মহিলাটি কে? কেন তার এত আদর? এবং পরিচারিকারা কেনই বা তাকে নিয়ে এত ব্যস্ত?

গরিব মহিলা জানতে পারল, সেই ধনী মহিলা এক রাজ জ্যোতিষীর স্ত্রী। টাকা পয়সার অভাব নেই। তাই সমাজে এত আদর, এত সম্মান।

অভাবে পড়লে মানুষ কত আজে বাজে কথাই না ভাবে। আর এই অভাবে পড়লেই নাকি বেঈমান হওয়া সম্ভাবনা বেশি।

দুঃখে এবং ক্ষোভে গরিব মহিলার মন খারাপ হয়ে গেল। সে ভাবল, তার স্বামী যদি রাজ জ্যোতিষী হতো কিংবা তাদের অঢেল টাকা পয়সা থাকত তবে তাকে এত অপমান সইতে হতো না। তার জীবনে ধিক্কার এল গরিব হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তার মরাই ভাল।

গরিব মহিলা নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে ক্ষেপে গেল। সেই হাম্মামখানার ঘটনা স্বামীকে বলে সে রাগের সঙ্গে বলল, তুমি না পুরুষ মানুষ! তোমার সংসার সম্পর্কে কোনো ভাবনা আছে? রাজ জ্যোতিষী হতে না পার অন্তত জ্যোতিষী হও, দেখবে কত টাকা পয়সা আসে। পয়সা থাকলে সবাই তাজিম মানে সম্মান করে।

গরিব লোকটি আসলে সোজা সরল এবং গো-বেচারা। সে স্ত্রীকে বোঝাল, ইচ্ছে করলেই তো জ্যোতিষী হওয়া যায় না। এর জন্য লেখাপড়া জানা দরকার। প্রচুর জ্ঞানের দরকার। আমার কি এত জ্ঞান আছে? কী করে আমি জ্যোতিষী হবো।

স্ত্রী আরও ক্ষেপে গেল। সে মুখের ওপর বলে দিল, আমি কোনো কথা শুনতে রাজি নই, হয় তুমি জ্যোতিষী হও, নতুবা আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব যেদিকে দু'চোখ যায়। এই কথা শুনে গরিব বেচারা চমকে উঠল। সে ভাবল, হোক ভ-ামি, তবুও সে জ্যোতিষী হবে। তাই অভাবের জন্য তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যাবে এটা সে সহ্য করতে পারবে না। সে সমাজের চোখে কোনোভাবেই খাট হতে পারবে না।

গরিব লোকটি ফাল-নামার বই জোগাড় করল। কাগজের মধ্যে খোপ খোপ ঘর তৈরি করে তাতে নম্বর দিল, নম্বরের সঙ্গে লিখে রাখল আলিফ, বে, তে, সে ইত্যাদি চৌত্রিশটি অক্ষর। হাতে রাখল নম্বর দেয়া অনেকগুলো গুটি। নম্বর অক্ষর ইত্যাদির উপর গুটি ফেলে অক্ষর এবং নম্বর অনুসারে সে তার অর্থ বলে দেবে। যেটা যেভাবে খাটে এবং সবই তার ইচ্ছেমতো কথা। মনগড়া কথা।

ঠিক জ্যোতিষীর সব আয়োজন নিয়ে সে বসল গিয়ে সেই হাম্মামখানার পাশে ভবিষ্যৎ গণনা করতে। অথচ নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার তবুও ভাবটা এমন, যাতে সবাই বোঝে



www.pathagar.org

সে জানু জ্যোতিষী।
প্রথম দিনেই কেল্লাফতে, বাজি মাৎ।
সে এক অলৌকিক ঘটনা। সেদিন হাম্মামখানায় গোসল করতে এলেন সিরাজের সাহেবজাদী মানে রাজকন্যা। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন দাসী বাঁদী। সাহেবজাদীর অতি মূল্যবান একটি হীরের আঙটি একজন দাসীর হাতে রেখে তিনি গেলেন হাম্মামখানায় গোসল করতে।
দাসী আঙটিটা হারিয়ে যাবার ভয়ে দেয়ালের একটি ছোট ফাটলে গুঁজে রাখল এবং চিহ্ন স্বরূপ সেখানে রেখে দিল তার মাথার কয়েকটি চুল।
আঙটি ওখানে রেখেই দাসী খেলায় মেতে উঠল অন্যান্য দাসীদের সঙ্গে। খেলার তালে পড়ে সে বেমালুম ভুলে গেল আঙটির কথা। সাহেবজাদী গোসল সেরে বাইরে এলেন। এখন তাঁর আঙটি চাই। দাসী এল। কিন্তু সে কোনোভাবেই আঙটির কথা মনে করতে পারছে না।
সাহেবজাদী গেলেন ক্ষেপে। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই এই দাসী আঙটি চুরি করেছে। এখন হারানোর ভান করে কান্নাকাটি করছে।
দাসী অঝোরে কাঁদছিল।
আঙটি না হলেই নয়। সাহেবজাদী দাসীকে জীবনের হুমকি দিলেন।
দাসী কী আর করবে। সে গেল হাম্মামের পাশে বসা সেই জ্যোতিষীর কাছে। অনুনয় বিনয়ের সুরে বলল, নজ্জুম বাবা, মানে জ্যোতিষী বাবা, দয়া করে বলে দিন তো আমার হীরের আঙটি কোথায়? অনেক ইনাম মানে পুরস্কার দেব।
জ্যোতিষী কি বলবে! সে কি গণনার কিছু জানে! সে শুধু হাঁ করে দেখছিল দাসীর মুখের দিকে দৃষ্টি মেলে। অপরূপ সুন্দরী সেই দাসী। দাসীর বোরখা ছিল একটু ছেঁড়া। ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে দাসীর কালো চুল ভারি সুন্দর লাগছিল জ্যোতিষীর চোখে।
জ্যোতিষী চুলের দিকে চেয়ে ধপ করে একটি গুটি কাগজের খোপ করা ঘরে ফেলে দিয়ে বলল,

কি ভাল, কি ভাল বিলকুল
বাতাসে দুলছে কালো চুল।

দাসীর পট করে মনে পড়ল, আরে তাইতো! সে হীরের আঙটি দেয়ালের গায়ে লুকিয়ে রেখেছিল এবং সেখানে আছে কয়েকটি চুল। নিশ্চয়ই তা বাতাসে দুলছে। জ্যোতিষী তো ঠিকই জানে।
দাসী দৌড়ে গেল। দেখে আঙটি ঠিকই আছে। আঙটিটা এনে সাহেবজাদীর হাতে দিল এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।
সাহেবজাদী বাড়ি গিয়ে বাদশাহর কাছে সব কথা বললেন।
বাদশাহ জ্যোতিষীকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আজ থেকে তুমি আমার দরবারে থাকবে এবং এখন থেকে তুমি রাজ জ্যোতিষী।
বাদশাহ তাকে অনেক টাকা পয়সা দিলেন, সুন্দর পোশাক তৈরি করে দিলেন। এমনকি জরির কাজ করা ঝলমলে পাগড়িও।



www.pathagar.org

এত সব পেয়েও কিন্তু জ্যোতিষী খুশি নয়। সে কেবলই ভাবছে এই বুঝি সেরেছে। তার আসল ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত যাবে গর্দান।

জ্যোতিষীর স্ত্রী কিন্তু খুব খুশি। এখন সে জ্যোতিষীকে কতভাবেই না আদর করে। রাজ-জ্যোতিষী হয়ে সে এইবার সত্যি বিপদে পড়ল। সেই রাত্রে বাদশাহর খাজাঞ্চিখানা লুট হলো। বাদশাহ জ্যোতিষীকে ডেকে বললেন, কে বা কারা এই লুটতরাজ করেছে তোমাকে বলে দিতে হবে। নইলে ঘোর বিপদ।

জ্যোতিষী আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলল, ঠিক আছে আমাকে চল্লিশ দিন সময় দিন। দেখবেন, ইনশাআল্লাহ আমি ঠিকই বলে দেব।

জ্যোতিষী তো বাদশাহর কাছে বলে এল। কিন্তু ওদিকে তার বুক অজানা ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। স্ত্রীকে বলল, দেখো কোনদিনই বেশি লোভ করতে নেই। তোমার লোভ এবং লালসার দরুনই আজ আমি মরতে বসেছি। এবার আর আমি বাঁচব না। স্ত্রী কোনো কথা বললো না। হন হন করে অন্য দিকে চলে গেল।

রাত্রে জ্যোতিষী স্ত্রীর হাতে চল্লিশটি খেজুর দিয়ে বলল, এসব সোরাহিতে ভরে রাখ। রোজ রাতে শোভার আগে একটি করে আমাকে খেতে দেবে। চল্লিশ রাতে চল্লিশটি শেষ করে তবে বাদশাহর দরবারে যাব।

স্ত্রীর হাতে খেজুর দেয়ার সময় জ্যোতিষী ছড়া কাটল,

নও গুনে এক হাতে
দেখ বিশ আছে তাতে
অন্য হাতে আছে বিশ
দুইয়ে মিলে চল্লিশ।

খাজাঞ্চিখানা লুট করার সময় ডাকাতরা ছিল দুই দলে বিভক্ত। প্রতি দলে বিশ জন করে। ওদিকে বাদশাহ নামদার জ্যোতিষীকে বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা গোপনে খোঁজ নিচ্ছিল জ্যোতিষী কী করে। রাত্রে যখন ডাকাতদের একজন জ্যোতিষীর ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে এই ছড়া শুনল, সে ভাবল, জ্যোতিষী তো ঠিকই খবর পেয়েছে যে, তারা চল্লিশ জন ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে ডাকাত দলের সর্দারের কাছে এই খবর দিল।

কিছু ক্ষণ পর সর্দার একজন ডাকাত পাঠাল জ্যোতিষী কি করছে দেখার জন্য। ততক্ষণে জ্যোতিষীর শোবার সময় হয়েছে। ডাকাত তখন ঘরের পেছনে ওঁৎ পেতে বসে আছে। জ্যোতিষীর স্ত্রী তখন জ্যোতিষীর হাতে খেজুর দিয়ে বলল,

চল্লিশের এক নাও? মজা করে খুব খাও।

এ কথা শুনেই ডাকাত দৌড়ে পালাল। আর এই খবর সর্দারের কাছে গিয়ে বলল। সর্দার তো ভয়ে অস্থির।

পরের রাত্রে দু'জন ডাকাত এল। তারাও জ্যোতিষীর ঘরের পেছনে কান খাড়া করে রইল। জ্যোতিষীর শোবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। স্ত্রী নিয়ম মতো একটি খেজুর দিয়ে বলল,



www.pathagar.org

চল্লিশের এই দুই
খেয়ে দেয়ে চল শুই।
এবার দুই ডাকাত ভাবল তাই তো জ্যোতিষী তো ঠিকই জানে।
নইলে আজকে দু'জন এসেছি জ্যোতিষী দেখল কি করে?
তারাও সর্দারের কাছে এই খবর পৌঁছাল।
তৃতীয় রাত্রে আসল তিন ডাকাত। তারাও ঘরের পেছনে কান খাড়া করে রইল। ঠিক এই সময় জ্যোতিষী গিন্নি স্বামীর হাতে একটি খেজুর দিয়ে বলল,
চল্লিশের এই তিন/ মাছি মাছি ঘিন ঘিন।
আসলে খেজুরটি ছিল খুবই ছোট, মাছির মতো দেখতে। এদিকে ঘরের পেছনের ডাকাত তিনজনই ছিল আকৃতিতে ছোট। ঠিক মাছির মতো। তারা ভাবলো, তাইতো! জ্যোতিষী এবং জ্যোতিষী গিন্নি তাদের কথাইতো বলছে।
তারাও দৌড়ে গিয়ে সর্দারের কাছে খবর দিল।
এভাবে উনচল্লিশ রাত কেটে গেল। সব রাতেই ডাকাতরা এসেছে খবর নিতে এবং সঠিক খবর শুনে দৌড়ে পালিয়েছে।
চল্লিশতম রাতে ডাকাতের সর্দার নিজেই এল।
ওদিকে চল্লিশ খেজুর খাওয়ার আজকেই শেষ রাত। ভোরেই যেতে হবে বাদশাহর দরবারে। ভাগ্যক্রমে শেষ খেজুরটি ছিল আকারে বড় এবং মোটা। অন্য দিকে ডাকাতের সর্দারও মোটা সোটা এবং বড় আকারের।
জ্যোতিষী গিন্নি শেষ খেজুরটা জ্যোতিষীর হাতে দিয়ে বলল,
চল্লিশের এই শেষ/ মোটা সোটা বেশ বেশ।
ডাকাতের সর্দার ভাবল, তাইতো! জ্যোতিষী তো ঠিকই ধরেছেন। কি আর করবে? সর্দার দৌড়ে গিয়ে জ্যোতিষীর পায়ে পড়ে বলল, নজুম বাবা, খাজাখিজিখানার সোনা-দানা আমরাই চুরি করেছি। এসব এনে দিচ্ছি। আমাদের বাঁচান।
জ্যোতিষীর আনন্দ দেখে কে? সে এইবার মওকা মতো পেয়েছে। উত্তেজিত হয়ে বলল, ব্যাটা, বেঈমান। এখুনি সব নিয়ে এসো। নইলে সবসহ সকাল শূলে চড়বে। বাদশাহর হুকুম।
রাতের বেলায়ই সব সোনা দানা হাজির করল ডাকাতেরা। সকালে বাদশাহর কাছে পৌঁছে দিলে বাদশাহ তো মহা খুশি। তিনি জ্যোতিষীকে অনেক পুরস্কার দিলেন। জ্যোতিষীর প্রতি বাদশাহর বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল।

একবার বাদশাহ জ্যোতিষীকে নিয়ে শিকারে গেলেন। অজানা ভয়ে জ্যোতিষীর বুক দুরু দুরু করে কাঁপা শুরু করল। আল্লাহর অপার মহিমায় সে দুইবার বেঁচেছে। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে? একটা মিনিটের জন্যও তার মনে শান্তি নেই।
শিকারে গিয়ে বাদশাহ ভাবলেন, এবার তিনি জ্যোতিষীর সঙ্গে মজা করবেন। জ্যোতিষীর নানা চিন্তায় অন্যমনস্ক। তার অজান্তে বাদশাহ একটি পোকা ধরার চেষ্টা করলেন। প্রথমবার ব্যর্থ হলেন। দ্বিতীয়বারও ধরতে পারলেন না কিন্তু তৃতীয়বার



www.pathagar.org

পোকাটি ধরে ফেললেন। শুধু ধরে ফেললেন না, মুঠির মধ্যে আটকে রাখলেন। এইবার জ্যোতিষীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, বলুন তো আমার মুঠির মধ্যে কি?

জ্যোতিষীর মুখ শুকিয়ে গেলেও হাসির ভান করল। এবার সে সত্যি বিপদে পড়েছে। মনে মনে ভাবল, এবার তার সব জারি জুরি ফাঁস হয়ে যাবে এবং বাদশাহর রাগের সীমা থাকবে না। নিজের দুঃখের কথা মনে করে একা একাই বলতে থাকল,

একবার বাঁচলি ছলে বলে
আবার বাঁচলি কী কৌশলে
এবার মরণ মুঠোর তলে।

বাদশাহ ভাবলেন, জ্যোতিষী তো ঠিকই ধরে ফেলেছে! কারণ প্রথমবারে তিনি পোকাটি ধরতে পারেননি। দ্বিতীয়বারও পোকা কৌশলে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ বারে পোকাটি আবদ্ধ করে ফেলেছেন মুঠির মধ্যে। জ্যোতিষী ঠিকই বলেছে। বাদশাহ শিকার থেকে ফিরে এসে জ্যোতিষীকে আবার পুরস্কার দিলেন।

হাজার পুরস্কারেও জ্যোতিষীর মন ভরছে না। তার চিন্তা সে তো আসলে ভ-জ্যোতিষী। একবার না একবার তার এই ভ-মি ফাঁস হবেই এবং হওয়া মানেই মৃত্যু। জ্যোতিষী ঠিক করল, এই বিপদ থেকে তাকে দূরে সরে যেতেই হবে এবং মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ পাগল হওয়া। পাগল হতে পারলেই বাদশাহ তাকে জ্যোতিষী হিসেবে রাখবে না। সে মুক্ত হবে।

একদিন বাদশাহ দরবারে যাবেন। এমন সময় জ্যোতিষী কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরে পাগলামি শুরু করল। বাদশাহ তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমন সময় অলৌকিকভাবে ধপাস করে সামনে ছাদ ভেঙে পড়ল।

বাদশাহ যদি এই পাগলামি উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেন তবে তিনি নির্ঘাত মারা পড়তেন।

বাদশাহর ধারণা হলো, জ্যোতিষী এ বিপদ জানতে পেরেই তাকে থামিয়ে রাখার জন্য সে এই পাগলামি শুরু করেছিল। জ্যোতিষী তো আর বাদশাহকে নিষেধ করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই পাগলামি দিয়েই তাঁকে থামিয়ে রেখেছিল।

এবার জ্যোতিষীর পক্ষে রাজ জ্যোতিষী হওয়ার আর কোনো বাধা রইল না। তার চাকরি পাকা হলো। রাখে আল্লাহ মারে কে? একেই বলে ভাগ্য!

জ্যোতিষীর স্ত্রীর আনন্দ দেখে কে? এখন হাম্মামখানায় গোসল করতে গেলে আদরের সীমা থাকে না। তবে কি এর আদর টাকা পয়সার আদর?

হ্যাঁ তাই।

(মূল ফারসি 'হেকায়েত'-এর বাংলা রূপান্তর)

ঈদসংখ্যা : জানুয়ারি, ১৯৯৯



www.pathagar.org

# তিনি যখন ছোট্ট ছিলেন

সানাউল্লাহ নূরী

www.pathagar.org

পরূপ সুন্দর এক শিশু।

মুখখানা তার চাঁদমাখা। কোমল পেলব হাত দু'খানা। চোখ দু'টি ডাগর ডাগর। দৃষ্টি যেন অতল সাগর। মুখে ভোরের সূর্যের সোনালি আলো। ভ্রূ দু'টি কাজল- কালো। কে যেন সুরমা এঁকে দিয়েছে চোখের পাতায়। ফুলের হাসি ফুটিয়ে হাসি ফুটিয়ে রেখেছে ঠোঁটের লতায়। কপাল নয়তো যেন পূর্ণিমার চাঁদ। সারা শরীর নিটোল নিখাদ। একদিন মায়ের কোলে আলো করে এলো সেই শিশু। মায়ের খুশি আর ধরে না। ছেলের মুখ থেকে চোখ সরে না।

চুমুর পর চুম খান শিশুর মুখে। বারবার কোল থেকে তুলে নেন বুকে। আপন মনে বলেন : ওরে আমার খোকা, কোথা থেকেরে তুই এলি? আহা, প্রাণটা আমার জুড়িয়ে দিলি।

খবর শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। আসে বাড়ন্ত শিশুরা। আসেন মায়েরা। শিশুরা মুখ দেখে সবাই অবাক। এ-তো শিশু নয়, যেন পূর্ণিমার চাঁদ। নিখুঁত শরীরের গড়ন। সবাই তুলে নেয় কোলে। নিজের শিশুর কথা যায় ভুলে। ধন্যি ধন্যি বলে তারা। যেন দেখে দেখে হয় পাগলপারা।

বলেন সবাই : অমন অপরূপ শিশু নেই আর কারো ঘরে। অমন অনিন্দ্য সুন্দর শিশু দুনিয়ায় আসেনি আগেও। আসবে না বুঝি পরেও।

তাঁরা শিশুরা মুখে আদর বুলিয়ে একসঙ্গে বলে উঠলেন : মারহাবা! মারহাবা! বেঁচে থাকো সোনার চাঁদ। উজালা করো দুনিয়াকে। শিশুর মাকে বললেন, খোশ নসিব তোমার আমেনা। তোমায় ভাগ্যবতী করলেন আলমপনা। দ্যাখো, এই শিশু তোমার বংশে বাতি জ্বালাবে। বিধবা মায়ের দুঃখ ঘোচাবে।

সবচেয়ে বেশি অবাক হলো তারা শিশুকে একবারও কাঁদতে না দেখে। অন্য শিশুরা তো মাটিতে পড়লেই চেঁচিয়ে তোলপাড় করে আকাশ বাতাস। হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে কাঁপিয়ে তোলে ঘর।

কিন্তু কী আশ্চর্য, কেমন সৌম্য শান্ত এ শিশু! একবার চেঁচালো না, ছোড়াছুড়ি করলো না হাত- পা। গোলাপি ঠোঁট দু'টিতে কেবল হাসির রেখা ফুটিয়ে রাখলো আর গভীর দৃষ্টি তুলে মায়ের মুখখানা দেখলো। হাসিমুখে সবার পানে চেয়ে দেখলো। দেখলো এ দিক ওদিকে। যেন ঘুরে ফিরে দেখছে পৃথিবীটাকে। কেমন শান্ত তার মুখখানা!

মনে মনে সবার প্রশ্ন : এমন শান্ত বুঝি হতে পারে কোনো নবাগত শিশুর মুখ? বয়স্করা বলাবলি করলেন : এ শিশু নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে হবে এক বিরাট মানুষ। তাঁদের মনের ঘোর আর কাটে না।

বাড়ি থেকে দূরে এক জায়গায় কাজে ব্যস্ত ছিলেন শিশুর দাদা। খবর শুনে ছুটে এলেন তিনি। শিশু জন্মের মাস তিনেক আগে মারা গেছেন তার বাবা। আহা, কী দুর্ভাগ্য!



www.pathagar.org

ছেলেটাকে দেখে যেতে পারলেন না তিনি। ছোট দাদার দুই চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা। কিন্তু পর মুহূর্তেই অপূর্ব শিশুর অপূর্ব সুন্দর মুখখানা দেখে ছেলের শোক ভুলে গেলেন তিনি। চেয়ে দেখলেন যেন পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি এই একরত্তি শিশুর শান্ত হাসি মুখ। অমনি হাত বাড়িয়ে নাতিকে বুকে তুলে নিলেন তিনি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। বারবার কপালে চুমু খেতে লাগলেন নাতু ভাইয়ের। আর চোখের পানি মুছে বলতে লাগলেন। মারহাবা! মারহাবা! আকাশে দুই হাত তুলে কামনা করলেন নাতির দীর্ঘায়ু। আদর করতে করতে বললেন, ভাগ্যবান হও তুমি নাতু ভাই! বুলন্দ নসিব হোক তোমার।

শিশুর একটা নাম রাখতে হয়। বৃদ্ধ পিতামহের ভাবনার অন্ত নেই।

পাড়ার লোকের মুখে মুখে শিশুর সৌন্দর্যের প্রশংসা। সবার মুখে এক কথা : এই শিশু ভাগ্যবান হবে। জন্মের পর মুহূর্ত থেকে যে শিশুর মুখখানি শান্ত সে কী যেই সেই শিশু? যার ঠোঁটে কান্নার বদলে হাসি ফুটে থাকে, সে কী ক্ষণজন্মা না হয়ে পারে! দাদা ভাবেন আর ভাবেন। শেষে ভাবতে ভাবতে ঠিক করলেন : লোকের মুখে যার এত প্রশংসা তার নাম প্রশংসিত হওয়া উচিত। ঠিক এই অর্থের আরেকটি নামের কথাও চিন্তা করলেন তিনি।

এই হলো সেই অনুপম শিশুর জন্মলগ্নের গল্প।

তখনকার আশপাশের লোকেরা বলতেন : এ শিশু এক সেরা শিশু। অনেক পরের দুনিয়ার সেরা সেরা জ্ঞানীগুণীরা বলতেন : ওই শিশুর মত মহান শিশু পৃথিবীতে আর আসেনি। তাঁদের কথায় : পৃথিবীর সব কালের, সব যুগের শিশুদের মাথার মণি ওই একজনই। অর্থাৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিশু বলতে সেদিনকার সেই শিশু।

এবার তোমরাই বলো কী তার নাম! কোথায় তার ধাম! কী তার পরিচয়? প্রশংসা যার অতিশয়!

হ্যাঁ জানি, গল্পটি শোনার পর তোমরা চট করে নামটা বলতে পারবে।

আরেকটা কথা। জন্ম থেকে যে শিশু মহান শিশু তাঁকে সম্মান দেখাতে হয়। তাঁর নাম উচ্চারণ করতে হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে। কারণ শিশু হলেও ছোট্ট সময় থেকেই তো তিনি সবার সেরা।

তোমরা জানো তিনি কে? তিনি শিশু মুহাম্মদ (সা)। আর তাঁর মা! যার কোল আলো করে তিনি এসেছিলেন? কী তাঁর পরিচয়? হ্যাঁ, নাম তার বিবি আমেনা। আমেনা কথার বাংলা মানে শান্তির দরিয়া। মদিনার নাজ্জার বংশের মেয়ে তিনি। নাজ্জার বংশ এক ভদ্র বংশ ও সম্ভ্রান্ত বংশ।

আর শিশু মুহাম্মদের (সা) বাবা? তিনি আবদুল্লাহ। মক্কার কুরাইশ বংশের লোক তিনি। আগেই তো শুনলে নবী জন্মের তিন মাস আগে তিনি মারা গিয়েছিলেন।



www.pathagar.org

এবার কুরাইশ বংশের গল্প শোনো।

বহু বহু বছর আগে থেকে মক্কার পবিত্র কাবা ঘরের সেবক। এই ঘরের হেফাজত এই বংশের প্রধানেরাই করতেন।

এর জন্য এই বংশের সম্মান আরবের সব বংশের ওপরে। আরো গল্প আছে এই বংশকে নিয়ে।

এই গল্পের মহানায়ক এক মহান নবী। নাম তাঁর হজরত ইবরাহিম (আ)।

এখন থেকে বহু হাজার বছর আগে ছিলো এক অতি পুরনো শহর। লোকে শহরটাকে বলতো উর শহর। এক বিখ্যাত নদীর তীরে ছিল শহরটা। নদীর নাম ফোরাত। ইরাক দেশের পুবের নদী।

এই নদীর পাড়ের সেকেলে শহর উর-এ জন্ম হজরত ইবরাহিমের (আ)। কিন্তু তাঁর বাবা কে ছিলেন জানো? এক পুতুলপূজক। তিনি কুমারও ছিলেন। মাটি দিয়ে তৈরি করতেন পুতুল।

ডিসেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# আগুন মুখো ড্রাগন

## আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন

www.pathagar.org

তোরা মন দিয়ে। ব্যাবিলনের নাম শুনেছিস তো?

হংকংয়ের হোটেল প্রিন্স। চৌদ্দ তলায় পাশাপাশি রুম একটায় বাবুল মামা, অন্যটায় আশরাফ আর আমি পিন্টু। ঢাকা থেকে পৌঁছেছি সন্ধ্যার ফ্লাইটে। এক রাতের বিরতি এখানটায়। আগামীকাল ভোর ৯টায় ডাইরেক্ট বেইজিং এয়ারপোর্টে।

– হ্যাঁ মামা। শুনছি আমরা মন দিয়ে। বলো তুমি।

– চুং চাং ফাং ফিং।

সাঙ্কেতিক ভাষা বাবুল মামার। মানে কথা কম বলবি। বোকারাম কাঁহাকার। শুনে চুপ মেরে যাই দুই বন্ধু। নাক, কান, চোখ-মুখ সব সংযত করে শুনে যাই।

– হ্যাঁ। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানে বাস করত–

ফস করে বলে ফেলে আশরাফ, জানি মামা। পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের এক আশ্চর্য হচ্ছে ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। ইতিহাসের বইয়ে ওটার পুরো বিবরণ রয়েছে।

– চুং চাং ফাং। লিং পিয়াং টাং।

এবার আর স্বাভাবিক স্বরে নয়। গর্জে ওঠে মামা। মানে ফের কথা বলছিস? ওরকম ডেপোমি করলে জিহ্বা কেটে দেব।

স্যরি বলতে গিয়ে কথাটা গিলে ফেলে আশরাফ। মুখে আমি তালা আঁটি। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে মামা। টিভিটার ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়েছে। যাতে করে আমাদের কথাবার্তা কোনো অদৃশ্য টেপ রেকর্ডারে ঠিক ঠিক রেকর্ড করা না যায়।

টিভির শব্দে চাপা পড়ে যায় মামার ফিসফিস করে আলোচনা কি জোরে ধমকধামক। কে জানে, সোফার নিচে, কিংবা দেয়ালের ভেতর কোনো টেপ রেকর্ডার কিংবা মিনি ক্যামেরা লুকিয়ে রেখেছে কিনা কোনো শত্রুপক্ষ? দেয়ালেরও কান আছে গোয়েন্দা জগতে।

– ইয়েস, বলে চলে মামা মুখ চাল কুমাড়োর মত গোমড়া বানিয়ে, সে শূন্যোদ্যানে বাস করত আগুনমুখো ড্রাগন। সমতলে যেমন, পাহাড়ে জঙ্গলে তেমন, এমনকি ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানেও তেমন। ওখানে বিশ্ব সভ্যতার মত ড্রাগনেরও উৎপত্তি। আর মহাকালের বিবর্তনেও আজব প্রাণীটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। তবে ব্যাপকভাবে ড্রাগনের উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় চীনে দেশে। বিশাল চীন সাম্রাজ্যের পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে, এমনকি নগরে-বন্দরেও বিচরণ করত ড্রাগন। আচরণও ছিল অদ্ভুত।

জিহ্বা আমার চুলকাচ্ছিল কথা বলতে না পেরে। মামা ওর ফলকাটা ছুটি দিয়ে ক্যাঁচ করে কেটে ফেলবে, সে ভয়ে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরে চুপ মেরে যাই।

শ্যান আর মিং সম্রাটরাও পোষ মানিয়ে সঙ্গে রাখতেন আগুনমুখো ড্রাগনদের। চীনের ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি উল্লেখ রয়েছে। ড্রাগনের প্রতীক আজও চীনের প্রাচীন মন্দিরে খোদাই করা। ড্রাগনের বিশাল মূর্তি বেইজিংয়ের রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে। নিষিদ্ধ নগরী রাজপ্রাসাদটার নাম সে কাল থেকে বর্তমান কাল তক।

ইংরেজিতে ফরবিডেন সিটি।

থেমে ওর নোট বই দেখে বাবুল। ওতে সাঙ্কেতিক ভাষায় কি কি সব নোট করা।



www.pathagar.org

পশুরাজ সিংহের মত থাবা, ধারালো নখর সে থাবায় বিশাল আকারের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী সবচেয়ে বড় বৈচিত্র্য ওদের নাকমুখ দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোত ড্রাগনের। সাধারণ আগুন নয়, অগ্নিগিরির স্ফুলিঙ্গের মত সে কি দাহ। সে অনলে! মনে মনে বলি, ওসব তো পৌরাণিক রূপকথা। মানুষের কল্পনাতেই বাস করত ড্রাগন। আমার কি সাহস আছে, বলে ফেলি সে কথা। এমনিতেই মামার চোখে ড্রাগনের আগ্নেয়দৃষ্টি। কিছু একটা বললে রাম বকুনি খেতে হবে যে। জিহ্বাটা কামড়ে ধরে রাখি।

– ওমর কল্পকাহিনী নয় রে পিন্টু কিউবার দ্বীপে একটা ড্রাগনের ফসিল পেয়েছেন আখচাষিরা। ট্রাক্টরের খোঁচায় বেরিয়ে এসেছে মাটির তল থেকে। বিশাল পাখা পিঠের ওপরে। খসখসে চামড়া। লম্বা লেজ কিংবা কুমিরের মত। কঙ্কালটাই দেখতে ভয়ঙ্কর।

– তুমি কি দেখেছ মামা সেটা?

ফস করে বের হয়ে যায় আশরাফের মুখ থেকে। শুনে ফসফরাসের মত জ্বলে ওঠ বাবুল।

– চুং চাং। লি পিয়াং টাং।

মানে, ফের কথা বলবি তো হাতুড়ি দিয়ে জিহ্বাটা থেঁতলে দেব।

এবার স্বর নিচু করে বলে বাবুল, হ্যাঁ দেখেছি। হাভানা দ্বীপে ফিডেল ক্যাস্ট্রো যখন আমার রিসেপশনদের ওঁর রাষ্ট্রপতি ভবনে তখন এক ফাঁকে দেখে নিয়েছি। ফসিলটা আখের ফসল তুলতে গিয়ে পেয়েছেন চাষিরা। এখন ওটা সুরক্ষিত হাভানার জাতীয় মিউজিয়ামে।

থেমে থেকে আঙুল চোষে বাবুল চৌধুরী। ওটা মামার মুদ্রদোষ। বুড়ো আঙুল কখনো কখনো কড়ে আঙুল। ওতে নাকি বুদ্ধির জট খোলে মাথায়।

চোখে যখন দেখে এসেছে মামা প্রাগৈতিহাসিক ড্রাগন নামক বিশাল জন্তুর ফসিল, তখন বিশ্বাস না করে উপায় কী?

ভাবি মনে মনে, ড্রাগন যদি রূপকথার জানোয়ার না হয়ে সত্যিকারের প্রাণী হয়, তাহলে রক্তখেকো ড্রাকুলা কি উড়ন্ত ভ্যাম্পায়ার কেন কল্পনায়ই শুধু বিরাজ করবে? হয়ত একদিন ওদের ফসিল কেন, জীবন্ত চলমান অবস্থায় ওদের আবিষ্কার করবেন কোনো বিজ্ঞানী।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কি আলাউদ্দিনের দৈত্য কি উড়ন্ত হাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাবে মানুষ। এককালে কেউ ডায়নোসরের কথা বিশ্বাস করত না। এখন পৃথিবীর এ বিশালকায় জন্তুটার ফসিল পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। কোনটার জিরাফের মত উঁচু গলা, কোনটা কুমিরের মত লম্বা সরীসৃপ, আবার কোনটার হাড় গ-ারের হাড়ের মত শক্ত। কোনটার দাঁত দেখে বলছেন সায়েন্টিস্টরা এটা ছিল সিংহের মত মাংসাষী, কোনটাকে বলছেন, এটা ছিল তৃণভোজী। কোনটা খেচর, কোনটা জলচর আবার কোনটা উভয়চর। আজ অসংখ্য কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে ডায়নোসরের, আগামী শতাব্দীতে নিশ্চয়ই জ্যান্ত পাওয়া যাবে আফ্রিকার জঙ্গলে কিম্বা আমাদের লালমাই পাহাড়ে। মামার কথায় আমার কান নেই। মন আমার হঠাৎ করে ডানোসরের জগতে। এক সময় রাতের মত ব্রিফিং শেষ



www.pathagar.org

করে বাবুল চৌধুরী।
যা শুতে যা তোরা। ঘরে গিয়ে আমাদের মিশন সম্পর্কে কোনো কথা বলবিনে। তোদের ঘরেও টেপ আর ক্যামেরা ফিট করা দেয়ালের গায়ে।
– গুড নাইট মামা। যাচ্ছি আমরা।

**দুই.**

বেইজিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। হংকং থেকে এখান তক চুপচাপ বসে থেকেছে মামা নিজের সিটে। বুঝি, বাবুল চৌধুরী চিন্তার মহাসমুদ্রে ডুবে গেছে। হাওয়াই জাহাজে মুখ হাঁ করে বসে, পিঠ ঢিলে দিয়ে, শূন্যে চেয়ে রয়েছে মামা। মাথার পরতে পরতে ওর আগুনমুখো ড্রাগনের ভাবনা। জ্যান্ত ড্রাগন ধরবে ও চীনদেশের কোন গভীর গহ্বর থেকে! ঘন বনারণ্যে ঘুরে বেড়াব আমরা আদিম শিকারির মতো।
চোখে মুখে আগুনের ফুলকি ড্রাগনের। নিঃশ্বাসে লাল আগুনের শিখা। প্রশ্বাসে নীল স্ফুলিঙ্গ।
অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ভাবি প্লেন থেকে নামতে নামতে, আমাদের বনে জঙ্গলে বাস করা তক্ষক যদি চোখে দৃষ্টি দিয়ে কোনো মানুষ বা প্রাণীর রক্ত চুষে নিতে পারে, তাহলে চীনা রেড ড্রাগন কেন ওর জিহ্বা দিয়ে আগুন ছিটিয়ে একটা পুরো প্রাসাদ জ্বালিয়ে দিতে পারবে না।
ভাবতে ভাবতে মনে হয়, নাহ! ড্রাকুলা, ভ্যাম্পায়ার আর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন থেকে নিয়ে বাংলাদেশের তক্ষক, সব ক'টারই অস্তিত্ব কিন্তু কিংবদন্তিতে। সব ক'টাই অলস মস্তিষ্কের ফসল। কল্পনায়ই এগুলোর বাস।
ছিমছাম এয়ারপোর্ট। নীরবে কাজ করছে সব ক'টা কর্মচারী। যাত্রীরাও চুপচাপ। কোথাও আমাদের মত কেউ ভেঙে হুড়োহুড়ি নেই, হইহল্লা নেই।
একটা বড় ট্যাক্সিতে উঠে বসি তিনজন। গন্তব্য বলে দেয় হাবলু ড্রাইভারকে, হোটেল রেড ড্রাগন। মাও সে তুং রোড। ও-কে?
– ও-কে। মুখের গহ্বরে সোনার বাঁধানো দাঁত আধবুড়ো ড্রাইভারের। হাসেও দাঁত বের করে। গায়ে বুকবন্ধ কোট। মাথায় লাল টুপি।
– চুয়াং ফাং লিয়াং।
বলে হাসি মুখে হাবলু। গাম্ভীর্য নেই চেহারায়। সঙ্কেতটার মানে, এখন তোরা নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারিস। হোটেল তক আমরা নিরাপদ।
দুটো দিন কথা বলতে না পেরে পেট ফুলে গ্যাস বেলুন আশরাফের। আমারও।
– দেখো দেখো মামা। সামনে সড়কের মাঝখানে একটা বিশালাকায় ড্রাগনের মূর্তি। ভাস্কর দেখতে। মুখ দিয়ে আগুনের লাভা বেরুচ্ছে ওটার। চোখজোড়া আগুনের গোলা। উত্তেজনার সঙ্গে বলে আশরাফ। জিরাফের মত গলা উঁচিয়ে দেখি আমি।
– ইয়েস। ওখান থেকে রেড ড্রাগন স্কোয়ারের শুরু। চীনাদের অতীত আর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে আগুন খেকো ড্রাগন। তাই ওটার প্রতিকৃতি সড়কে, বড় রাস্তার নাম



www.pathagar.org

ড্রাগন স্কোয়ার। বড় পাঁচতারা হোটেলের নাম হোটেল রেড ড্রাগন।
অনেক জানে মামা। সব বিষয়ই ওর অগাধ পড়াশোনা। জ্ঞানসচার যেন বাবুল।
– হ্যাঁ মামা। আমরা যে বিমানে এলাম ওটার নামও তো ড্রাগন এয়ার।
বলে উৎসাহের সঙ্গে আশরাফ। ততক্ষণে হোটেলের ফটকে পৌঁছে গেছে ট্যাক্সি।
– পৃথিবীর সর্বত্রই ড্রাগন শব্দটা পরিচিত। এক জাতের প্রজাতিকেও কিন্তু ইংরেজিতে ড্রাগন ফ্লাই বলা হয়। তবে ও পতঙ্গটার সঙ্গে কোনো মিল নেই। আসল ড্রাগনের। বিজ্ঞ মন্তব্য বাবুল চৌধুরীর।
– তবে আমাদের পদ্মার বিশালাকায় কুমিরের সঙ্গে কিন্তু মিল রয়েছে অনেক।
গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলি সহজ বাংলায়। চীনাদের মত অনুসারে যোগ করে। চাং চুং লাং লুং বললে সেটা তো আর চীনা ভাষা হবে না। অনুরূপভাবে চন্দ্রবিন্দু যোগ করে মসিঁয়ে নেঁপোলিও বললে সেটা ফরাসি ভাষা হবে না।
তিয়েনানমান স্কোয়ারে মাও সে তুংয়ের বিশাল প্রতিকৃতি ডানে রেখে আমাদের ট্যাক্সি ছুটছে নিষিদ্ধ নগরীর দিকে। ইংরেজিত ফরবিডেন সিটি। উঁচু দেয়াল ঘেরা রাজবাড়ি। ভেতরে সারি সারি সব প্রাসাদ, মন্দির, দরবার হল অস্ত্রাগার আর বিচারালয়।
সামনে আমাদের চীনা গাইড ক্যাপ্টেন হান। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি জানে বেঁটেখাটো লোকটা। প্রত্যেকটা প্রাসাদের সিঁড়িতে খোদাই করা ড্রাগনের ছবি। ভেতরে কোথাও সোনায় তৈরি ভারী গোল্ডেন ড্রাগন। কোথাও চত্বরে শক্ত পাথরের বিশালাকায় ড্রাগনমূর্তি।
– সম্রাটরা নিষিদ্ধ নগরীতে অনেক ড্রাগন পালতেন। উঁচ প্রাচীরের ভেতরে ও বাইরে ওরা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত। কোনো শত্রু আক্রমণ করতে এলে মুখ হাঁ করে আগুন ছড়িয়ে দিত ওরা। তাতে করে গায়ে আগুন ধরে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত দুস্যু আর তস্কররা। ওদর ঘোড়া আর হাতিরাও পুড়ে যেত একই সঙ্গে। নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছে বাবুল। শুনছি অন্য সব পর্যটকসহ আমরা দুই বন্ধু।
– ডবল সিকিউরিটির জন্য প্রাচীরের ভেতরেও ড্রাগনবাহিনী সেন্ট্রির কাজ করত।
বলে চলে গাইড হান। ... মিটিমিটি চোখ ওর। মুখে কয়েক গাছি দাড়ি।
– এ ছাড়া মিং সম্রাটরা প্রজাদের শাস্তি দেয়ার কাজেও ব্যবহার করতেন ড্রাগনদের। সামান্য অন্যায় আর অবাধ্যতার জন্য মৃত্যুদ- প্রদান করতেন। বড় নিষ্ঠুর ছিলেন ওঁরা।
দরবার হলের সামনে একটা খোলা চত্বর। ওখানটায় পৌঁছি আমরা ঘুরতে ঘুরতে।
– ইয়েস স্যারেরা আর ম্যাডামরা। এখানে এই চত্বরে সাজাপ্রাপ্ত প্রজাদের ওপর মুখ দিয়ে অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করত ড্রাগনরা। আর মুহূর্তের মধ্যে জ্যান্ত মানুষগুলো পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে যেত। ভয়ঙ্কর শাস্তি। তা না হলে বিদ্রোহ করবে যে প্রজারা।
ক্যাপ্টেন হানের কথা সব মনে মনে নোট করে বাবুল। মুখ ওর শক্ত পাথুরে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে আসা টুরিস্টগুলো বলছে থেকে থেকে, অবিশ্বাস্য! একদম অবিশ্বাস্য।
– হ্যাঁ। এ আনবিলিভিবেল ব্যাপারটাকেই সত্যে দেখাতে এসেছি আমরা। আমি জ্যান্ত



www.pathagar.org

ড্রাগন না হোক ওটার কঙ্কাল আবিষ্কার করে ছাড়বই। দেখিস তোরা।
আশরাফ ডানে আর আমি বামে। নিচু স্বরে বলে ডিটেকটিভ মিস্টার বাবুল চৌধুরী। প্যালেসের পেছনটায় বিশাল বোটানিক্যাল গার্ডেন। বার্চ, পাইন অ্যাপেলসহ উঁচু নিচু সব বৃক্ষের সারি। কয়েক শ' বছরের প্রাচীন বৃক্ষসব। বৃদ্ধ ওরা। তাই এক একটার গায়ে অনেকগুলো ঠিকা দিয়ে পতন ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। ঠিকা না থাকলে ঝড় তুফানে কবে যে কাৎ হয়ে পড়ে যেত বুড়োগুলো।
– ইয়েস ঠা-া ছায়া গাছের। ওখানটায় দাঁড়িয়ে আমাদের মুখোমুখি হয়ে হয়ে বলে হান, এ উদ্যানে বিশ্রাম করতেন সম্রাট, সম্রাজ্ঞী আর তাঁদের পুত্র-কন্যাগণ। পোষা ড্রাগনদের নিজে হাতে খাবার খাওয়াতেন। বাচ্চার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াত।
– কি খেত পশুগুলো?
খাঁটি ইংরেজিতে বলে এক ইংলিশ মহিলা। বুড়ির গালে হাজারটা ভাঁজ।
– হ্যাঁ চমৎকার প্রশ্ন। ঠিক ঠিক জিজ্ঞাসা। থেমে থেমে চমক সৃষ্টি করে গাইড।
– আগুন। কারণ আগুন সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য যে ড্রাগন জাতির।
তিন.
পরের দিন ভোরে ভোরে তৈরি বাবুল চৌধুরী। যাত্রা আমাদের গ্রেটওয়াল দেখতে। মজাই হলো। একই যাত্রায় রথও দেখা, কলাও বেচা। আমরা দেখব পৃথিবীর দীর্ঘতম দীর্ঘ প্রাচীর। সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইয়ে। দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ এ দুর্ভেদ্য দেয়ালটি নির্মাণ শুরু করেন সম্রাটগণ আর শেষ করেন মিং রাজারা উত্তরের মঙ্গোলিয়ান দস্যু আর তস্করদের হাত থেকে রাজ্য আর রাজধানী রক্ষার জন্য সে ঐতিহাসিক প্রাচীর নির্মিত হতে লেগেছে দীর্ঘকাল, সেটা দেখব আমি আর আশরাফ। মামা ওখানটার ঝোপজঙ্গল আর পাহাড়ে খুঁজবে আগুনখেকো ড্রাগনের অস্তিত্ব। সে কালের রাজকীয় প্রহরীরা ঘোড়ায় চড়ে প্রাচীর ধরে টহল দিত অষ্টপ্রহর।
আমরা দুই বন্ধু পায়ে হেঁটে চড়ব মাইলখানেক।
মামা ট্যাক্সি থেকে নেমেই ঢুকে পড়লেন নিচের গভীর খাদে। ওখানে জ্যান্ত ড্রাগন না হোক, মৃত ড্রাগনের হাড়গোড় কি ফসিল পেলেই যথেষ্ট। সেটাই হবে বাবুল, গোয়েন্দার গ্রেট এচিভমেন্ট। গ্রেট ওয়ালের নিচে গ্রেট আবিষ্কার।
– ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বুড়ি মার্গারেট থ্যাচার যদি চড়তে পারে খাড়া প্রাচীরটা, তোরা দুই ইয়ংম্যান পারবি না কেন?
আমাদের উৎসাহ দেন মামা। নিচে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছেন যন্ত্রপাতি হাতে।
হাতে নাশপাতি আশরাফের। ঝুড়ি থেকে নিয়ে একটায় কামড় বসাই। খেতে খেতে চড়ব। এনার্জি আসবে কোত্থেকে পেটে খাবার না পড়লে?
মিশন ব্যর্থ গোয়েন্দা বাবুল চৌয়ের। চৌধুরী শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার চৌ। কম কথায় সময় বাঁচে। চৌ এন লাইয়ের দেশে চৌধুরী চৌ হয়ে গেছে। প্যাঁচার মত মুখ বানিয়ে ফিরে এল চৌ। চিন্তার জগতে হাবুডুবু খাচ্ছে ও।



www.pathagar.org

– কিছু পেলে মামা?
– না, তবে একটা সূত্র আমি আবিষ্কার করেছি। সেটা হল আগুনখেকো ড্রাগন।–
– ওটুকু বলেই থেমে থাকে বাবুল। শুনে টেনশন আমাদের তুঙ্গে।
– হ্যাঁ। সেটা হল আগুনখেকো ড্রাগন নিজের শরীরের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। মৃত্যুর পর ওদের মুখের আগুন চলে গেছে পাকস্থলীতে। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরে। পা থেকে মাথা তক, যেমন রক্ত ছড়িয়ে পড়ে ধমনি পথে। আগুনকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তো ছিল না মৃতদেহের। ফলে সেটা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে চামড়া-মাংস, হাড়গোড়. অস্থিমজ্জা সবকিছু।
কি যেন বলতে চাচ্ছিলাম যুক্তি খাটিয়ে।
– চুং চাং ফাং ফিং।
ধমকের সঙ্গে বলে ওঠে বাবুল। মানে, চুপ কর। যা বলছি শুনে যা।
– স্যরি মামা। ভুল হয়ে গেছে।
– চুং চাং ফাং ফিং।
এবার আরও জোরে ধমক দেয় বাবুল। মানে, নো টক ইউ হাবারাম।
– কি বলতে চাস তুই পিন্টু? মানে তাই যদি হয়, তাহলে ডায়নোসর, হাতি, গ-ারসহ বিভিন্ন আদিম পশুপাখির ফসিল কেন পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। আস্ত শরীরের মমিও পাওয়া যাচ্ছে কেন তিমি আর শীলমাছের উত্তর মেরুর বরফ ঢাকা দেশে? থেমে দাঁত দিয়ে বুড়ো আঙুলের নখ খোটে হাবলু, উত্তর খুব সোজা। ওদের তো শরীরে কোনো আগুনের ছোট ছোট চুল্লি কি প্রবাহ ছিল না। তা হলে ওরাও সে আগুনে জ্বলে যেত। তবে আঁকাবাঁকা ফাঁকা ফাঁকা পাহাড়ি পথ। জেট গতিতে বাঁশের কি শোলার হ্যাট, হাতে বেলচা।
– তবে হয়তবা পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে ড্রাগন প্রজাতি প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে আজও বেঁচে আছে। আকারে ছোট হয়ে গেছে কালের বিবর্তনে কিম্বা রূপান্তরিত হয়েছে অন্য কোনো প্রাণীতে।
গ্রেটওয়াল চড়তে গিয়ে পায়ে ব্যথা আমার। আশরাফটা চুপচাপ বাইরে ঘন পাইন বীথি দেখছে। চোখ বোজা অবস্থা গভীর চিন্তার মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত বাবুল মামা।
নাইন ড্রাগন এমিউজমেন্ট পার্ক ডানে রেখে এগোচ্ছে ট্যাক্সি। পথের দুই পাশের সার সার প্রস্তর মূর্তি ড্রাগনের। ভয়ঙ্কর আকৃতির এক একটা। বিশালও।
মিংশিং সান লিং। ইংরেজিতে মিংস টুম্বন বাংলায় মিং সম্রাটদের সমাধি।
দরজা খুলে দাঁড়াল। সামনে মামা। আমি আর আশরাফ অবাক চোখে দেখিছ দুর্দান্ত প্রতাপ মিং সম্রাটদের সমাধিস্থল। তিয়ানশাউ পাহাড়ের পাদদেশে মাটির নিচে বিশাল কবরস্থান। ওপরে পাথর, চারপাশে পাথরের দুর্ভেদ্য প্রাচীর, শক্ত কঠিন শিলায় নির্মিত মেঝে। ছায়া ছায়া রহস্যময় আলো ভেতরে।
– সম্রাট ইয়ংয়ের কবর এ সমাধিতে। ওই যে বিশাল সোনার পালং ওটাতে শুয়ে



www.pathagar.org

ইয়ংয়ের কঙ্কাল। আর পাশের শয্যা আর কুর্সিতে শুয়ে বসে ওর রানীগণ। নিচে মেঝেতে যত দাস-দাসী। পেছনে কুঠরিগুলোতে সম্রাটের বড় বড় কর্মকর্তা। আরও পেছনে ওর প্রিয় ড্রাগনদের জন্য আস্তাবল।

ভাঙা ইংরেজি আর চীনা ভাষায় কমেন্ট্রি দিয়ে গাইড মিস ফাংচু।

অসংখ্য কঙ্কাল মানুষের। সম্রাটের কঙ্কালের মাথায় মুকুট, হাতে সোনার ছড়ি। রানীমাদের শরীর ভর্তি মণিমুক্তা বসানো অলঙ্কার। মুখে সোনার নকল দাঁত। গুনে দেখি ষোল জন পত্নীর সিংহাসন প্ল্যাটফর্মের ওপর। অন্য সব ছোট রানী আর পরিচারিকাদের হাড়গোড় ছোট ছোট সোনার খাটে।

কি ভয়ঙ্কর! কি নৃশংস। জ্যান্ত কবর প্রাসাদে ঢুকতে হয়েছে এতগুলো মানুষকে। রাজমাতাকেও। সবাই সঙ্গ দেবে মৃত সম্রাটকে। বদ্ধ ঘরে যখন খাবার-দাবার শেষ হয়ে গেছে তখন আস্তে আস্তে মরে গেছে সবাই। লাশ পচে গেছে, শুধু রয়ে গেছে যার যার কঙ্কাল, বাসন কোসন আর অলঙ্কারাদি। দামি দামি খাটপালং আর সিংহাসন বিবর্ণ এখন কালক্রমে। আরও রয়েছে পোর্সেলিনের ফুলদানি, সোনার মোমবাতির আধার, খাবার ব্যবহৃত সোনার বাসন, কোসন আর চামচ পিরিচ। ড্রাগনের খোদাই করা মূর্তি তো আছেই।

হাতিশালা আর ঘোড়াশালা পেছনের চত্বরে। সেখানটায় পশুগুলো যত কঙ্কাল। হাতির দাঁতগুলো এত এত কাল পরেও চমচক করছে। সব আছে। কিন্তু ড্রাগনশালার ড্রাগনরা নেই। নেই এ বিচিত্র প্রাণী। তাই ওখানটায় উঁকি মেরে একটু বলেই বেরিয়ে এল গাইড। পেছনে টুরিস্টের দল।

## চার.

সাত দিন তিয়ানশাউ পাহাড়টা চষে ফেলেছি আমরা। মামার পিঠে যত যন্ত্রপাতি। আমার পিঠে ড্রাই সব খাবার আর পানি। লম্বু আশরাফের হাতে দোনলা রাইফেল। বাঘ ভাল্লুক, অজগর, গোখরায় ভর্তি পাহাড়টা। দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সঙ্গে কম্পাস না থাকলে পথ হারিয়ে ফেলত মামা শুরুতেই।

গভীর পাইন আর কাঁটালতার ঝোপঝাড়। হিস হিস করছে কোবরা। দূরে গর্জন হিংস্র সব প্রাণীর।

ক্লু ধরেই এগোচ্ছি আমরা। মিং সমাধিতে ড্রাগনশালায় আমি একটা সুড়ঙ্গ খুঁজে পেয়েছি। আল্ট্রাসোনিক আলোয় দেখা গেছে সেটা। অবশ্য দীর্ঘকালের ব্যবধানে পাথরে চাপা পড়েছে সেটা।

ড্রাই বিস্কুট চিবোতে চিবোতে বলে বাবুল, ড্রাগনের মুখে তীব্র আগুনের শিখায় সমাধি প্রাসাদের দেয়াল– মানে ড্রাগনের কুঠরির শক্ত প্রাচীর পুড়ে ভেঙে পড়েছে। ওরা মুক্তির চেষ্টায় দিনরাত একটানা আগুন ছিটিয়ে সুড়ঙ্গটা সৃষ্টি করেছে দীর্ঘ সময় নিয়ে। তারপর– দীর্ঘসময় নিয়ে চুপ থাকে মামা। কপালে ওর একশটা বলিরেখা। ভাবে গম্ভীর মুখে।



www.pathagar.org

তারপর এ অরণ্যে বেরিয়ে আসে ওরা সুড়ঙ্গ পথে। ওদের বংশধরেরা, আই এম শিওর গভীর অরণ্যে কোথাও আজও বেঁচে আছে। দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সভ্যতা এখনও পৌঁছেনি। এগোচ্ছি আমরা ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে। একটা হনুমান। ভেংচি কাটল আমাদের কাঁটাঝাড় থেকে।

– ফরবিডেন সিটি, গ্রেট ওয়াল, মিংস টুম্ব সবখানে আমি মাটি শুঁকে দেখেছি সাপুড়ের মত। সাপুড়ে যেমন সাপের গন্ধ পায় মাটি খুঁড়ে আমিও তেমন গন্ধ পেয়েছি। ও সব জায়গায়। এখনও পাচ্ছি। আর সে বিশেষ গন্ধ ধরেই তো এগোচ্ছি আমরা।

অমাবস্যার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারপাশে। জোনাকির মৃদু আলোও নেই কোথাও।

– ওই যে আলো। লাল-বেগুনি আলো। দেখতে পাচ্ছিস তোরা?

প্রায় দু' শ' গজ সামনে ঘন গাছপাতা, ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা দেখতে পাই আমরা। উত্তেজনায় শূন্যে লাফ মারে হাবলু। মাথা ওর ধাক্কা খায় ওপরের একটা ডালে। দম বন্ধ হল আমার। মাথায় জাঙ্গল ক্যাপ চেপে ধরে আশরাফ।

বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত আমাদের তিন অভিযাত্রীর। ঠা-া রাতেও ঘামছি আমি।

সামনে, মাত্র ত্রিশ গজ সামনে এক পাল ড্রাগন কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। অনেকটা কু-লী পাকিয়ে। সব ক'টার মুখ হাঁ করা। সে হাঁ দিয়ে একটানা আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে। সাপের মত কাটা দীর্ঘ জিহ্বা সব ক'টার। সেখানটায় আগুন। আগুন শ্বাস-প্রশ্বাস।

ফ্লাশ লাইট অন করে জুম লেন্সে অনেকটা ছবি তোলে মামা দূর থেকে। এবার মোবাইল টেলিফোন ডায়াল করে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে। সেখানে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক অফিসের মি. গ্রেগরিকে। ওরাই দুরূহ এ কাজটা দিয়েছে মামাকে।

– সুখবর গ্রেগরি। গ্রেট নিউজ ফর ইউ। সারা বিশ্বের জন্য অবিশ্বাস্য এক সংবাদ।

গলার স্বর প্রগাঢ় মামার। তোমরা ডায়নোসরের ফসিল আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী চমক লাগিয়ে দিয়েছ। আর আমি জ্যান্ত ড্রাগন আবিষ্কার করেছি। হ্যাঁ ব্রাদার। ওরা আমার সামনেই আছে মাত্র ত্রিশ গজ দূরে।

মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে বিস্ময়কর এ আবিষ্কারের মহাসংবাদ। রেডিও-টিভি, পত্রপত্রিকা, সব ক'টা মিডিয়ায় একই গ্রেট নিউজ। রেড ড্রাগন কল্পলোকের জীব নয়। বাস্তব, অবিশ্বাস্যভাবে অতি বাস্তব, পরাবাস্তব মহাবাস্তব।

একটানা কংগ্রেচুলেশন আসছে মোবাইল ফোনটায়। ওপেন হেলিকপ্টারে করে পৌঁছে গেছে চীনা সামরিক বাহিনীর স্পেশাল টিম। সিএনএন, বিবিসি, এনএইচ-কে বড় বড় সব টিভি নেটওয়ার্ক অলরেডি একটিভ।

রেডি আমরা মনে মনে। এ মহা আবিষ্কারের জন্য অবশ্যই নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাবে মামা।

ঈদসংখ্যা : জানুয়ারি, ১৯৯৯



www.pathagar.org

# দিশেহারা টেনু মিয়া

শহীদ আখন্দ

www.pathagar.org

তোমাদের সেই টেনুর কথা মনে আছে কিনা জানি না, সেই যে টেনু ক্লাস সিক্সের বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে চার পেয়েছিল। তারপর চারের ডান দিকে শূন্য বসিয়ে সে ওটাকে চল্লিশ করেছিল রিপোর্ট কার্ডে। কিন্তু শূন্য লিখতে টেনু যে কালিটা ব্যবহার করেছিল সেটি চার-এক ব্যবহার করা কালির সঙ্গে মেলেনি, ফলে বাবা, চাচা ও আম্মার মনে সন্দেহ হওয়াতে চাচা স্কুলে গিয়ে জানতে পারে যে, টেনু অঙ্কে চার পেয়েছে, চল্লিশ নয়। তখন চাচা টেনুকে বেধড়ক গরু পেটা করেছিল। আপন চাচার হাতে আপন ভাতিজার এরকম মার খাওয়ার সেটাই ছিল বিশ্বরেকর্ড। অই গুঁতানির চোটে টেনু তিন দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। সেই মারের স্মৃতি টেনুর মনে এখনো জাগরুক আছে এবং তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। সেই মারের সুফলেই হোক কিংবা ফকির নানার তাবিজের গুণেই হোক, এরপর টেনু ভালো হয়ে গেল এবং ক্লাস সেভেনে সবাইকে টপকে ফার্স্ট হয়ে গেল। টেনু বিশ্বাস করে, চাচার মারের জন্য নয়, ফকির নানার তাবিজের জন্যই তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। তারপর কয়েকদিন আগে যে ক্লাস এইটের বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট হলো, তাতেও টেনু ফার্স্ট হয়ে গেছে। এই ফার্স্ট হওয়ার জন্য টেনুর মনে কোনো অহমিকা নেই। আগে যে ফার্স্ট হতো জাহিদ, ওর সঙ্গে পুরনো বন্ধুর মতোই কথা বলতে চায়, কিন্তু জাহিদ মনে হয়, তার এই উন্নতি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারছে না। ওকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়, আর কথা বলে এমন ভাব করে যে, টেনুর রেজাল্ট ভালো করা উচিত হয়নি। এটা ঠিক না। পরীক্ষা যখন, একজন তো ফার্স্ট হবেই এতে মন খারাপ করার কি আছে? আমি তো আর কোনোরকম কেরদানি করে ফার্স্ট হইনি। জাহিদ মনে হয় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব আর রাখতে চায় না। আর অরুণ তো স্পষ্ট বলেই ফেলেছে, ফার্স্ট হলেই ভালো ছাত্র হয় না। আমরা বাবা-মার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলি। ও বলে?

বিশেষ করে জাহিদ আর অরুণের ব্যবহারে টেনু যারপরনাই মর্মাহত হয়েছে। তার এতদিনের পুরনো বন্ধু, পরপর দুই বছর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে বলে একেবারে পর হয়ে গেল। একটা ভালো কাজ করার আনন্দটা মাটি হয়ে গেল। এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে সারারাত টেনু ভালো করে ঘুমাতে পারেনি। অরুণ এবং জাহিদ ছাড়া তো তার কেউ নেই। নতুন করে কার কাছে যাবে বন্ধুত্ব পাততে?

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল টেনুর। ওদের গাছে তিন দিন ধরে নতুন একটা পাখি এসেছে। ছোট্ট, কালো তীক্ষ্ণ বাঁশির মত গলা। এই গলা শুনেই খুঁজতে খুঁজতে টেনু আবিষ্কার করল দু'জনকে। বাসা বানানো দরকার। দু'জনের মধ্যে তাই সলা-পরামর্শ। উঠেই একবার আমগাছের নিচে গিয়ে ওপর দিকে তাকাবে। গাছটা দোতলা কোন বাড়ির কাছে থাকলে ছাদে দাঁড়িয়ে একেবারে কাছে থেকে দেখা যেতো। এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ খারাপ হলো টেনুর। অতি ভোরে কড়া নাড়ার মানে সে বিলক্ষণ জানে। দেশ থেকে কেউ এসেছে।



www.pathagar.org

আর ভালো লাগে না। এতো অত্যাচার করতেও পারে দ্যাশের মানুষে। সময় নেই, অসময় নেই আসছে কেউ কাজে। কেউ এমনিই বিনা কারণে।

আব্বা হাসিমুখে কুশল বিনিময়ের পর তার আগতজনকে বসানোর পর আম্মার সামনে পড়ল সম্ভবত। আম্মা গলা ছোট করার কোনো চেষ্টা করল না, প্রশ্ন করল কে।

– তুমি চিনবে না।

– তোমার আত্মীয়?

– না! ডেলু ডাকাতের নাম শোননি? ডেলু ডাকাত।

– ওমা! এখানে কি করতে এসেছে?

আম্মার আতঙ্কিত গলার পর আশ্বস্ত করার চেষ্টা আব্বার গলায় ফুটল, আরে না, না, কি যে বলো, এখানে সে ডাকাতি করতে আসেনি। আমাদের পাশের গ্রামের। আমরা একসঙ্গে এক স্কুলে পড়েছি। ও শশধর দত্তের দস্যু মোহন সিরিজের বই পড়তো খুব। তারপর এই অবস্থা।

– কি জন্য এসেছে।

– কিছু বলেনি।

আম্মার গলা চড়ল। তাহলে জিজ্ঞেস কর গিয়ে ক'দিন থাকবে। ডাকাত জেলের বাইরে এমন পাখির মতো ঘুরে বেড়ায় কি করে।

বসার ঘর থেকে ডেলু বের হয়ে আম্মার সামনে এলো বোধ হয়। অচেনা একটা ভরাটগলা টেনুর কানে এল, আপনি যদি এখন আমারে মারেনও ভাবী আমি যাইতাম না। তারপরে কথা ছড়াবে পুলিশ আসবে, ডাকাতের আশ্রয় দিচ্ছেন এই অপরাধে আপনাদের ধইরা লইয়া যাইবো।

টেনু এক লাফে বিছানা থেকে উঠে আব্বার পাশে এসে দাঁড়ায়। ডাকাত বলে বোঝা যায় না। চেহারা দিব্যি সুন্দর। কাঁচা-পাকা চুল, তামাটে গায়ের রঙ। মোটা গোঁফ... পাখিটা ডেকে উঠল।

ডেলু বলল, শহরে টুনটুনি পাখি ডাকে, বিরাট আশ্চর্য কথা!

আম্মার দিকে তাকাল, দুই হাত এক করল, বলল, কাজ হয়ে গেলে আজ, না হইলে কাল। মাফ করতে হইবো, না কইরা উপায় নাই।

একটা ডাকাত কিনা আব্বার ক্লাসফ্রেন্ড। জাহিদ অরুণ শুনলে রক্ষা নেই। এমনিতেই তো আব্বা ক্লার্ক ছিলেন বলে কতো টিটকিরি!

স্কুলের গেট পার হতে না হতেই আজগর কয়েকটা ছেলেসহ কোত্থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে টেনুর বাম বাহুতে কষে চেপে ধরল। ধরে প্রায় টানতে টানতে ওকে রাস্তার দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল, চল। তোর সাথে আমার প্রাইভেট কথা আছে।

–কি কি ক কথা?

– আহা ভয় পাচ্ছিস কেন? চল না।



www.pathagar.org

এই আজগর ওদের সঙ্গে পড়ে। সে কোনমতে পাস করে করে টেনুর সঙ্গে নাইনে উঠেছে। খারাপ ছেলে। ঘাড়ের ওপর চুল রেখেছে। সিগারেট খায়। ওকে টেনু দেখতে পারে না। কারণ, কারণ, না, কারণ আর কিছু নয়। কোনো কোনো চেহারা টেনুর ভাল লাগে না, এই আর কি।

রাস্তায় এনে ফুটপাথের পাশে কাঁচা মাটিতে ওরা এসে দাঁড়াল।

আজগর চিবিয়ে চার্জ করল, কি, বিষয়টা কি, সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছিস ক্যামনে।

তাবিজ টাবিজ ধরেছিস নাকি? টেনুর বুক ধড়াস করে ওঠে। ফকির নানা তাবিজটা দেয়ার সময় কঠিন কণ্ঠে হুঁশিয়ার কারে দিয়েছেন, এই তাবিজ বাইরের কাউকে দেখাবে না। কারো কাছে বলবে না। তাহলে এর গুণ চলে যাবে।

আজগর বলল, শোন যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। পাস্ট ইজ পাস্ট।

– এন্ড ফিউচার ইজ ফিউচার। বুঝছস?

এই কথাটা বলল আলাদীন। সিনেমায় অভিনয় করে কাঞ্চনমালা না কি নাম যেন তার ছোট ভাই। কোনো মতে এসএসসিটা পাস করতে পারলেই সে ফিল্মের হিরো হবে। এজন্য সে এখন থেকে ফিলমি নাচ, ফাইটিং ইত্যাদির ট্রেনিং নিচ্ছে। কাউকে পেলেই সে চা খাওয়ায়, বার্গার খাওয়ায়, আর প্রাণপণে একটানা এসব কথা বলে। মাঝে মাঝে দু'চারটা মারাত্মক ডায়ালগ বলে ফেলে, শয়তান! তুই ভেবেছিস আমার খপ্পর থেকে তুই নিস্তার পাবি! বোকার স্বর্গে বাস করছিস বেঈমান- হা হা হা।

আজগর গর্জে উঠল, কিন্তু কেন? হোয়াই! কেন তুই ফার্স্ট হচ্ছিস!

টেনু ওদের জ্ঞান দিতে চেষ্টা করে, সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেলে ফার্স্ট না হয়ে উপায় নেই।

– কিন্তু বেশি নম্বর পাবি কেন? আগে জাহিদ ফার্স্ট হতো। গত দুই বছর ধরে সে সেকেন্ড হচ্ছে। এতে তার কষ্ট হচ্ছে না?

– গত পরীক্ষায়ও জাহিদের চেয়ে ৬৩ নম্বর বেশি পেয়েছে।

আরেকজন তার ইংরেজি বিদ্যা জাহির করল, সিকটি থ্রি! ওয়ান টু হলে একটা কথা ছিল।

আজগর গর্জে উঠল, জানিস জাহিদের বাবা কতো বিরাট অফিসার। তার কথায় মন্ত্রীরা ওঠে বসে। মন্ত্রীরা তার সামনে কথা বলতে ভয় পায়। আর তোর বাবা তো একজন কেরানি।

– কেরানি না। অফিসার প্রশাসনিক অফিসার।

– অই হলো। চামচিকেও পাখি!

একটু পর বলল, শোন টেনু এসব চলবে না।

– কিসের চলবে না?

– পড়াশুনা করতে পারবি না। সারাদিন আমাদের সঙ্গে আমাদের মতো ঘুরে বেড়াবি।



www.pathagar.org

ক্লাস থেকে পালিয়ে গিয়ে সিনেমা দেখবি। চুল লম্বা রাখবি। আর আজকে কি বার?
– রোববার।
– সামনের রোববারে আমারে এক হাজার টাকা দিবি।
– কেন?
– কেন টেন না। আমি বলছি, এ জন্য। তোমার নিরাপত্তা ফি বলতে পার। বুঝছ! টেনু ওর দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। আজগর নিষ্ঠুরের মতো বলে, এখন তুমি যাও।
বাসায় ফিরে টেনু দেখল ডেলু ডাকাত বাইরের ঘরে পাখা ছেড়ে দিয়ে গেঞ্জি গায়ে ঘরের মাঝখানে হাতলবিহীন চেয়ার এনে তাতে বসে ঘাম শুকাচ্ছে। বোঝা গেল সে ফিরেছে বেশিক্ষণ হয়নি। টেনু ঘরে ঢুকল, একটা হাসি দিল।
– তোমার নাম তো টেনু।
– আপনি এখন আর ডাকাতি করেন না?
– না।
– কেন? ভাল হয়ে গেছেন?
– হ্যাঁ।
– করতে ইচ্ছ করে না?
– না।
– কেন?
ডেলু বলল, আমি ডাকাতি করতাম রাগের ঠেলায়। ডাকাতি করে, খুন করে বড়লোক হয়ে সবার ওপর লাঠি ঘোরায় যারা, তাদের সহ্য করতে পারতাম না। তারপর দেখলাম ডাকাতি করে কিছু হয় না। ময়লার রঙ কালোই থাকে, মাঝখান থাইকা কষ্ট আর কষ্ট। ... তুমি যেন কিছু কইতে চাও?
– হ্যাঁ চাচা।
– বল।
– না, থাক। কিছু না, এই আর কি।
– কও।
– না চাচা, থাক।
টেনু প্রায় দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। বড় অনুশোচনা হয়। ছিঃ একজন ডাকাত লোককে লাগাবে আজগরের পেছনে? কিন্তু আজগর যদি সত্যি সত্যি তার ক্ষতি করে? কথাটা আব্বাকে বলে রাখা দরকার। আব্বা যা ভালো মনে করে করবে। না না, আব্বারে না চাচাকে বললেই হবে। আব্বাকে বললে, আব্বা বলবে আম্মাকে ওরা ভয় পাবে, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেবে। কিন্তু একটা কিছু করা দরকার। চাচাকে সে কথাটা বলবে, চাচা আজগরকে টাইট দেবে। টেনু আবার ডেলু চাচাকে বলবে, ডেলু চাচা– এর কোন মানে



www.pathagar.org

হয় না। তার চেয়ে না কোনো বুদ্ধি আসে না মাথায়।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ার টেবিলে বসল। কোনো পড়াশোনা নেই। বইই কেনা হয়নি এখনো সবগুলো। ক্লাস শুরু হতে হতে আরো এক মাস। তবু নিয়ম রক্ষার জন্য টেনু টেবিলে বসে। ফকির নানা বলেছেন, টেবিল হলো তোর মনোযোগের জায়গা। ধ্যান করতে আগের দিনে পাহাড়ের গুহায় যেতেন সাধু সজ্জনেরা। এখন গুহা নেই, আছে টেবিল। বইপত্র, কাগজ কলম। বসো, পড়ো, চিন্তা করো।

টেনুর এক সময় ফকির নানার আর একটা কথা মনে পড়ল। বাইরে তুমি বানরামি করবা, সব করবা, দেখাবা তুমি পড়ালেখার ধার ধারো না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইস্পাত হবা, ধারালো, চকচকে যা স্পর্শ করবে, তাই কাটবে।

তাহলে আমি যদি আজগরকে এক হাজার টাকা দিয়ে দিই তাহলেই তো সব ঠিক হয়ে যায়। ঘোরাফেরা করব, আবার পড়বও। তা ছাড়া (টেনু মিয়া কেঁপে উঠল) আজগর তো নিজের ইচ্ছায় কিছু করছে না। ওকে নিশ্চয়ই কেউ লাগিয়েছে ভাড়া করে।

এক হাজার টাকা টেনুর কাছে আছে। গত বছর ফার্স্ট হওয়ার পর থেকে ফকির নানা মাসে মাসে তার নামে তিন শ' টাকা পাঠান। এর সবটা টেনু জমায়। এই টাকা টেনু সামনের রোববার আজগরকে দেবে এবং আস্তে আস্তে আজগরকে জয় করবে।

ঢিলের বদলে পাটকেল ছুড়বে। বাইরের ঘরে ডেলু চাচার সাথে আজগরকে দেখে টেনু ভীষণ অবাক। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না। ডেলু চাচা বলে, আমার ছেলে, এ ঢাকায় থেকে পড়ে, গা গেরামে লেখাপড়া হয় না, পোলাপান নষ্ট হয়ে যায়, সে জন্য ঢাকায় রাইখা পড়াই। ডাকাতের ছেলে ডাকাত হলে আর মুখ দেখানো যাবে না, তাহলে ওর ছেলেও ডাকাত হবে।

আজগরের মাথায় একটা গোল টুপি। সবটা মাথা ঢেকে রেখেছে। ঘাড়ের দিক খোলা। বোঝা যায়, মাথা নাড়া করা হয়েছে।

টেনু বলল, তুই আমাদের এলাকার ছেলে, বলিসনি তো!

– আরে তোমাদের পরিচয় আছে মনে হয়?

টেনু বলল, আমরা এক সঙ্গে একই স্কুল পড়ি চাচা। ও খুব ভালো।

ডেলু জোরে হেসে ওঠে, ভাল খুব ভাল। তোমার বাবা আর আমিও একসঙ্গে পড়তাম। ডেলু আজগরকে ডেকে ঘরের এক কোণে নিয়ে যায়, ফিসফিস করে বলে, স্কুলের একটা ছেলে টেনুকে বিরক্ত করে, ডর দেখায়। অরে কি কয়া দিছি, তুমি ডরাবা না। তুই পাশে থাকিস, কেমন? এমনে তুই খুব ভাল ছেলে, কিন্তু কেউ তোদের সাথে বানরামি করতে আসলে ছাড়বি না বুঝছিস?

আজগর মাথা কাত করে একেবারে ঘাড়ের সঙ্গে লাগাতে চেষ্টা করে।

মার্চ, ১৯৯৮



www.pathagar.org

# অসামান্য আলোক শিশু

আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.org

"দেখো দেখো কী সৌভাগ্য আমাদের!
এক অসামান্য আলোক শিশু কুয়োর ভেতর।"
পানি বহনকারী গোলামটির চিৎকারে কাফেলার অনেকেই দৌড়ে এসে কুয়াটির চারপাশে জটলা পাকালো। সবাই মিলে বালতির দড়ি ধরে ঝুলে থাকা কিশোরটিকে টেনে কুয়ার বাইরে আনলো।
সত্যি চারদিক যেন আলোয় ঝলমল করে উঠলো। মানুষের রূপ এমন সুন্দর হতে পারে! মানুষ নয় যেন আকাশের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে।
ষোল-সতের বছরের কিশোরটি মুখ ফুটে কিছুই বলছে না। আর বলবেই বা কি? তার ভাইয়েরা তার সাথে যে ব্যবহার করে গেলো, কোনো শত্রুও বুঝি এমনটি করে না। তাই সে একেবারে চুপসে গেছে। তার মায়ের পেটের তারা দুই ভাই। তাদের মা মারা গেছেন। তাই তাদের পিতা তাদেরকে একটু বেশি ভালোবাসেন। বিশেষ করে তাকে সব ভাইয়ের চাইতে বেশি ভালোবাসেন। সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতেন। তাই দেখে বিমাতার সন্তান অন্য দশ ভাইয়ের মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। "আব্বাজান ইউসুফের মধ্যে কী দেখেছেন, তাকে অত বেশি ভালোবাসেন? সব সময় তাকে সাথে করে রাখেন?"
"কী জানি ওই অথর্ব ছেলেটার মধ্যে কী পেয়েছেন তিনি! হ্যাঁ দেখতে একটু বেশি সুন্দর আর বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে না হয় একটু বেশি। কিন্তু তাই বলে আমরা দশ ভাই দশটি তাগড়া জোয়ান, আব্বাজনের সব কাজে কামে আমরাই তো সাহায্য করি। ওই অপদার্থ সুন্দর ছেলেটা তাঁর কোন কাজে লাগবে?"
"তাইতো, মেজ ভাই ঠিকই বলেছেন। আমাদের ভেড়ার পালের ওপর যখন একদল নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আমরা দশ ভাই এক মিনিটের মধ্যে লাঠিপেটা করে তাদেরকে সাবাড় করে দিই।"
"আর দিনের বেলা হোক বা রাতের আঁধার আমাদের কোনো শত্রুগোত্র যদি আমাদের বাড়ি ঘরের ওপর চড়াও হয় তাহলে লড়াই করে শত্রুদের পরাস্ত করবো তো আমরা দশ ভাই। আদরের দুলাল ইউসুফ তো ভয়ে কাঁপতে থাকবে। অথচ দেখো আব্বাজানের কেমন একচোখা নীতি, তাকে বেশি ভালবাসেন।"
"নাহ আর সহ্য হচ্ছে না। ইউসুফকে এ দুনিয়ার বুক থেকে সরাতে হবে।"
"আমারও তাই মনে হয়। ইউসুফকে সরাতে না পারলে আমরা আব্বাজানের মন জয় করতে পারবো না।"
"আমার তাই মত।"
"আমারও।"
দশ ভাই একমত হয়ে গেলো ইউসুফকে পিতার কাছে থেকে সরাতে হবে। কিন্তু কিভাবে সরানো যাবে?
হযরত ইয়াকুব তাঁর এই ছেলেটিকে খুব বেশি ভালোবাসেন। তাকে সব সময় নিজের কাছে রাখেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে আলাদা করতে চান না। এই ছেলেটির মধ্যে



www.pathagar.org

তিনি পয়গম্বরীর সমস্ত লক্ষণ দেখেছেন। তাছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে তিনি যা ইঙ্গিত পেয়েছেন তাতে তাঁর মনে হচ্ছে, তাঁর পরে আল্লাহ তাঁর এই ছেলেকেই নবুওয়ত দান করবেন। ইউসুফ হবে দুনিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ নবী, বিশেষ করে ইউসুফের সেই স্বপ্নটির কথা তিনি ভুলতে পারছেন না। এগারটি তারকা এবং চাঁদ ও সুরুজ ইউসুফকে সিজদা করছে। অর্থাৎ কিনা ইউসুফের এগারটি ভাই এবং তার পিতা ও মাতা সবাই ইউসুফের সামনে নত হচ্ছে। এ স্বপ্ন তো ইউসুফের একজন শ্রেষ্ঠ নবী হবার ইঙ্গিত দেয়।

এসব কথা ভেবে বৃদ্ধ ইয়াকুব ইউসুফের জীবন রক্ষার জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছেন। ইউসুফকে তিনি বারবার মানা করে দিয়েছেন তার এই স্বপ্নের কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে না বলে। বিশেষ করে তার ভাইয়েরা এ কথা জানতে পারলে তো হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে। ফলে যে কোনো সময় তারা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু ভাইয়েরা তো তাদের পথের কাঁটা ইউসুফকে সরিয়ে ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তারা আবার শলাপরামর্শ করলো। দশ মাথা এক হলো। দশ চালাকি একটি ভয়ঙ্কর রূপ নিল।

"ইউসুফকে আমরা হত্যা করবো। এ ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না। অথবা তাকে এমন কোনো জোয়গায় ফেলে দিয়ে আসবো যেখানে সে নিজে নিজেই সাবাড় হয়ে যাবে। আর কোনো খারাপ কাজে আমরা হাত দেব না। ফলে আব্বাজানের ভালোবাসা আমরা পাবো", বললো একভাই।

"না না, তাকে মেরে ফেলো না, বড় ভাই বললো, বরং তাকে কোনো কুয়ার মধ্যে ফেলে দাও। যাওয়ার পথে হয়তো কোনো কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের থেকে দূরে গিয়ে সে প্রাণে বেঁচে থাক। তাতে আমাদের তো কোনো ক্ষতি নেই। তার অবর্তমানে আব্বাজান আমাদের ঠিকই ভালোবাসবেন।"

তাই দশ ভাই মিলে বাপের কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করলো।

"আব্বাজান। আমরা প্রতিদিন বনে খেলা করতে যাই। কত রকম ফুলমূল পেড়ে খাই। কত আনন্দ করি। কিন্তু আমাদের ভাই ইউসুফ! সে ঘরে বসে থাকে আমাদের সাথে খেলতে যায় না। বনের তাজা ফলমূল খায় না। ফলে সে যেন সব সময় কেমন মনমরা হয়ে থাকে। তাকে আমাদের সাথে বনে খেলাধুলা করতে পাঠান।"

"হ্যাঁ আব্বাজান। দেখবেন কয়েক দিনের মধ্যেই তার মন কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠছে।"

"তাকে তোমাদের সাথে পাঠাতে আমি কেমন জানি ভরসা পাচ্ছি না। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে হয়রত ইয়াকুব বললেন, তোমরা হয়তো খেলায় মত্ত হয়ে থাকবে, তার কথা ভুলে যাবে এবং এই সুযোগে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে। আমি এই ভয়টাই করছি।"

"আব্বাজান যদি নেকড়ে খেয়ে ফেলে তাহলে আমাদের এই দশ ভাইয়ের শক্তির মূল্যটাই বা কি থাকলো! তাহলে তো আমরা নিরেট অপদার্থই প্রমাণিত হবো।" মেজভাই জোর দিয়ে বললো।

শেষ পর্যন্ত হযরত ইয়াকুব রাজি হয়ে গেলেন। তারা ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে বনে খেলা করতে গিয়ে তাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল। তারপর একটি পশু হত্যা করে ইউসুফের



www.pathagar.org

জামা-কাপড় তার রক্তে রাঙিয়ে নিল। পিতার সামনে এসে কাঁদতে কাঁদতে ইউসুফের রক্তরাঙা জামা-কাপড় রেখে দিয়ে বললো, আমরা খেলা করছিলাম আর ইউসুফ আমাদের জামা কাপড় পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের অজান্তে একটা নেকড়ে এসে ইউসুফকে ধরে খেয়ে ফেলেছে।

ওদিকে ইউসুফ মনে করছিল, সে যদি কাফেলা বণিকদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে দেয় তাহলে হয়তো বণিকেরা তাকে ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু ভাইদের হাত থেকে আর সে বাঁচতে পারবে না। এবার ভাইয়েরা তাকে প্রাণে মারেনি, কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আগামীবারে একেবারে জানে মেরে দেবে। কাজেই নিজেকে বণিকদের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো মনে করলো। বণিকেরা যেখানে চায় তাকে নিয়ে যাক। আল্লাহ তার ভালোই করবেন।

ঘটনাক্রমে বণিকদের এই কাফেলাটি যাচ্ছিল মিসরের পথে। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের মিসর। রাজধানী মমফিস তখন পৃথিবীর অন্যতম সুসভ্য নগরী। এই নগরীর বাজারে ইউসুফের দাম খুব বেশি উঠল না। বাদশাহ আপোফিসের রক্ষীবাহিনী প্রধান আযীয পেটিকর নিজেই এই গোলামটি কেনার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। আযীযের আগ্রহ দেখে কেউ আর তার দাম চড়াতে এগিয়ে যায়নি। ফলে খুব সস্তা দামে কিনে আযীয তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তার স্ত্রীকে বললেন, দেখো, ছেলেটা খুব বড় ঘরের বলে মনে হচ্ছে। একে আমাদের বাড়িতে ভালোভাবে মর্যাদার সাথে থাকার ব্যবস্থা করো। আমাদের তো ছেলেমেয়ে নেই, চাইলে আমরা একে নিজের ছেলে হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

জুলায়খা স্বামীর ইচ্ছায় বাদ সাধতে চাইলো না। আঠারো বছরে তরুণটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলো সে। এতদিন তার নিজের এত রূপের গর্ব যেন মিথ্যা হয়ে গেল। এই তরুণটিকে সে নিজের করে পেতে চায় কিন্তু নেকি, সততা ও পবিত্রতার প্রতীক ইউসুফের মনে সে একটুও দাগ কাটতে পারলো না।

আযীয তার নিজের সমস্ত ঘরবাড়ি, সহায় সম্পদ ও জায়গিরের দেখাশোনার ভার ইউসুফের ওপর ছেড়ে দিলেন। তিনি শুধু নিজের সরকারি চাকরিটির সাথে জড়িত থাকলেন। ইউসুফ পূর্ণ আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিল। চতুরদিকে তার রূপের সাথে সাথে আমানতদারি ও সততার কথাও ছড়িয়ে পড়লো।

জুলায়খা ইউসুফের জন্য পাগল হয়ে পড়েছিল। সে আর নিজেকে সামলাতে পারছিল না। একদিন ঘরের মধ্যে তাকে একাকী পেয়ে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। সে বললো,

"ইউসুফ আমার কাছে এসো।"

"আমি আল্লাহকে ভয় করি। আপনি আমার সম্মানিতা মনিবপত্নী। এই পরবাসে একান্ত বিরূপ পরিবেশে আল্লাহ আমাকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। আমি আল্লাহর না শোকর ও নাফরমান বান্দা হতে চাই না।"



www.pathagar.org

ইউসুফ দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু পেছনে জুলায়খা তার জামা টেনে ধরলো। ফলে পেছন থেকে জামা ছিঁড়ে গেলো। কিন্তু ততক্ষণে ইউসুফ দরজা খুলে ফেলেছিল। সামনেই দেখলো তার মনিব দাঁড়িয়ে এবং সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলায়খার এক আত্মীয়। স্বামীকে দেখে জুলায়খার চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেলো। সে অভিযোগ করলো :

"দেখো, এই ইউসুফকে তুমি এত বেশি বিশ্বাস করো কিন্তু সেতো তোমার স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়েছে। এই দেখ না আমাকে একা পেয়ে– তোমরা না এসে পড়লে আজ আমার কী যে হতো।"

"ডাহা মিথ্যা কথা", ইউসুফ বললো।

"ওর কোন কথা শুনবেন না। তোমার স্ত্রীকে যে অপমান করতে চায় তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে। কঠিনতম শাস্তিই তার প্রাপ্য।" জুলায়খা ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মতো ফণা তুলে বলল।

"বরং সেই আমাকে কিছুদিন থেকে ফুসলাবার চেষ্টা করছে এবং আজ ঘরে একা পেয়ে দরজা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল। আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন", ইউসুফ দৃঢ়তার সাথে আবার তার বক্তব্য পেশ করলো।

"ঠিক আছে, এরা দু'জন তো দু'জনকে দোষারোপ করছে মাঝখান থেকে জুলায়খার আত্মীয়টি বলে উঠলো এবং এখানে তৃতীয় কোনো সাক্ষীও নেই, এ ক্ষেত্রে আমরা ঘটনার সাক্ষী গ্রহণ করতে পারি।"

"কিভাবে?" আযীয জিজ্ঞেস করলেন।

"আমরা আসামি দু'জনের কাপড় পরীক্ষা করতে পারি। যদি ইউসুফের কাপড় সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে ইউসুফ অপরাধী এবং জুলায়খা নিজেকে বাঁচানোর জন্য ইউসুফের সাথে যুঝেছে। আর যদি ইউসুফের কাপড় পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে জুলায়খা অপরাধী। কারণ বোঝা যাবে জুলায়খা তাকে পেছন থেকে কাপড় টেনে আটকাতে চেয়েছিল।" তখনই ঘটনাস্থলে ইউসুফের কাপড় পরীক্ষা করে দেখা গেলো তা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া।

আযীয নিজের স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেন না। সেকালের মিসরীয় সমাজে মেয়েরা এত বেশি অধিকার ভোগ করছিল যে অভিজাত পরিবারের মেয়েরা প্রায় হয়ে উঠছিলো স্বৈরাচারী। তাই তিনি তাকে শুধু বলতে পারলেন, "তুমি অপরাধী, কাজেই তোমার পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

ইউসুফকে তিনি বললেন, "ইউসুফ! তুমি নিরপরাধ ও নিষ্পাপ। তোমার চরিত্র আলোর মতো পরিচ্ছন্ন। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকো।"

আগস্ট, ১৯৮৯



www.pathagar.org

# বুদ্ধির জয়

তরজমা : মোবারক হোসেন খান

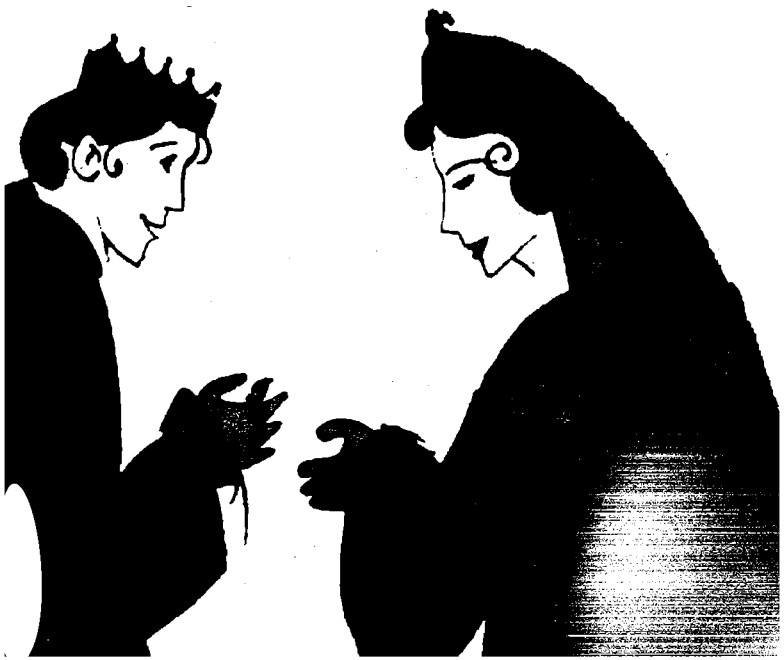

www.pathagar.org

এক দেশে এক বাদশাহ ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র কন্যা। শাহজাদীকে দেখাশোনা করে এক বাঁদি। শাহজাদীর বিয়ের বয়স হয়েছে। বাদশাহর সেদিকে খেয়াল নেই। কিন্তু বাঁদির ছিল বদমতলব। একদিন বাদশাহকে বাঁদি বললো, 'শাহজাদী বড় হচ্ছে, বিয়ের জন্য পাত্র দেখুন। নয়তো বুড়ি হয়ে আপনার বোঝা হয়ে উঠবে।'

বাদশাহ বললেন, 'তা ঠিক, তবে তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়। আমার একমাত্র কন্যা। তার ওপর রূপেগুণে অসাধারণ, যার তার সঙ্গে তো বিয়ে দেয়া যায় না। কি করা যায় বলো তো?'

বাঁদি ছিল শাহজাদীর একমাত্র পরিচারিকা। শাহজাদীকে সে কারো সাথে দেখা করতে দিতো না। দেশ-বিদেশ থেকে শাহজাদারা আসতো, কিন্তু সবাইকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে তা হতো।

শেষ পর্যন্ত বাঁদি এক প্রস্তাব দিলো। পাতালে একটা বাগানবাড়ি করলে কেমন হয়! বাগানে ঢোকার একটা মাত্র পথ থাকবে। শাহজাদী এ বাগানবাড়িতে থাকবে। শাহজাদারা পাতালে গিয়ে শাহজাদীকে খুঁজবে। তিন দিন সময় দেয়া হবে। বিফলে গর্দান কেটে নেয়া হবে। আর যে খুঁজে পাবে শাহজাদীর সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

বাদশাহ বললেন, 'চমৎকার প্রস্তাব! কালই আমি উজিরকে নির্দেশ দেবো।'

বাগানবাড়ি তৈরি করা হলো। শাহজাদীকে লুকিয়ে রাখা হলো।

দেশ বিদেশ থেকে শাহজাদারা আসে। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যায়। কিন্তু শাহজাদীকে খুঁজে পায় না। তিন দিন পর ওদের গর্দান কেটে ফেলা হয়। বাঁদির খুব মজা। আনন্দে দিন কাটতে লাগলো। আসলে সে বাঁদি ছিল না। ছিল ছদ্মবেশী এক রাক্ষসী ডাইনি। কাটামুে-র ঘিলুর প্রতি ছিল তার খুব লোভ। তাই বদমতলব করে সে শাহজাদাদের গর্দান কেটে মহানন্দে তার ইচ্ছা পূরণ করতে লাগলো।

পাশে আরেক বাদশার দেশ। সে রাজ্যের বড় শাহজাদার কানে কথাটা পৌঁছলো। পিতার কাছে শাহজাদীকে বিয়ের কথা বললো।

বাদশাহ কঠিন শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিছে কেন প্রাণটা খোয়াবে? তার চেয়ে অন্য শাহজাদী দেখা ভালো।'

বড় শাহজাদা সে কথা শুনলো না। জেদ ধরলো। অগত্যা বাদশাহ অনুমতি দিলেন। সবরকম ব্যবস্থা করে শাহজাদাকে পাশের রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

বড় শাহজাদা ঐ দেশে গিয়ে বাদশাহকে বললো, 'আমি শাহজাদীকে খুঁজে বের করবো।'

বাদশাহ শুনে হাসলেন। বললেন, কেন বেঘোরে প্রাণ হারাবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।'



www.pathagar.org

আমি শাহজাদা! যুদ্ধ করা আমার জাত ধর্ম। আর সামান্য একটা বাগানে শাহজাদীকে খুঁজে পাবো না? মেহেরবানি করে আমাকে অনুমতি দিন।' শাহজাদা বললো।
বাদশাহ অনুমতি দিলেন। তিনি শাহজাদাকে পাতালে সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন। শাহজাদা তিন দিন ধরে খুঁজলো। বৃথাই খোঁজা হলো। শাহজাদীর দেখা মিললো না। বিষণ্ন বদনে বাদশাহর সামনে হাজির হলো।

কিন্তু শর্ত তো আর ভাঙা যায় না। শাহজাদার শিরশ্ছেদ করা হলো।
এ খবর শুনে পাশের রাজ্যের বাদশাহর ছেলের জন্য চোখের পানি ফেললেন।
এবার মেজ শাহজাদা বায়না ধরলো। বাদশাহকে রাজি করালো জোর করে। সেও ভেবেছিলো সামান্য ব্যাপার, একদিনেই উদ্ধার হয়ে যাবে।
সেও তিন দিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করলো কিন্তু শাহজাদীকে বের করতে পারলো না। অবশেষে তাকেও গর্দান দিতে হলো।
পুত্রের মৃত্যুর খবর শুনে এবারও পাশের রাজ্যের বাদশাহ খুব কাঁদলেন। দুই শাহজাদাই অকালে প্রাণ হারালো। এবার তৃতীয় ও ছোট শাহজাদা বায়না ধরলো। বাদশাহ কপাল মন্দ ভেবে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। ছোট শাহজাদা খুব বুদ্ধিমান। সে এক বস্তা সোনা দিয়ে বড় একটা ছাগল বানালো। কারিগর এমনভাবে তৈরি করলো যাতে শাহজাদা অনায়াসে ভেতরে থাকতে পারে। আবার ইচ্ছেমতো খুলে বেরিয়ে আসতে পারে। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারছে না। এর জন্য কারিগরকে মোটা বখশিশ দেয়া হলো।
এবার ছাগলটাকে পাশের রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। শাহজাদীর নিশ্চয়ই খুব পছন্দ হবে। সোনার ছাগল ঘরে রাখবে। ঐ ফাঁকে শাহজাদা এসব পথঘাট দেখে নেবে এবং কাজ হাসিল করতে পারবে। তারপর শাহজাদীকে নিয়ে দেশে ফিরে আসবে।
বাদশাহ সোনার ছাগল দেখে ভীষণ খুশি। শাহজাদীরও মনের মতো হবে। রাজকর্মচারীদের হুকুম দিলেন সোনার ছাগলটা শাহজাদীর ঘরে নিয়ে যেতে।
শাহজাদী আনন্দে ছাগলটাকে আদর করলো। এতদিন পর মনের মতো একটা সঙ্গী পেয়েছে। ঘরের মধ্যে নিয়ে পালঙ্কের পাশে রাখলো।
এ দিকে শাহজাদা ছাগলের চোখের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথঘাট, গুপ্তঘর সব দেখে নিলো। এবার শাহজাদী তার ভাগ্যেই জুটবে। বিয়ে করে দেশে ফিরে যাবে।
শাহজাদীর খাবার লুকিয়ে খেয়ে নেয় শাহজাদা। কতক্ষণ আর না খেয়ে থাকা যায়! খাওয়া হয়ে গেলেই ছাগলের পেটে ঢুকে লুকিয়ে থাকে শাহজাদা। শাহজাদীর সন্দেহ হলো। কেমন ভুতুড়ে কা-! রোজ রোজ খাবার খেয়ে নেয় কে? শেষে একদিন লুকিয়ে শাহজাদাকে দেখে ফেলে। দু'জন দু'জনকে দেখে দু'জনেরই পছন্দ হয়ে গেল।



www.pathagar.org

কিন্তু বাঁদি দেখতে পেলে বাদশাহকে বলে দেবে। শেষে বাদশাহ শাহজাদীর গর্দান নেবে। তাই ছাগলের একটা ঠ্যাং ভেঙে ফেলে শাহজাদা শাহজাদীকে বললো, তোমার বাপকে বলো, ছাগলটাকে মেরামত করতে বাইরে নিয়ে যেতে। আমি লুকিয়ে বের হয়ে পড়বো। তোমার ঘরের পথঘাট আমার চেনা হয়ে গেছে। তোমাকে খুঁজে বের করে বিয়ের প্রস্তাব দেবো।

বাদশাহর খবর পেয়ে লোকজন দিয়ে ছাগলটাকে বাইরে নিয়ে এলেন। মেকারকে ডেকে এনে মেরামতের হুকুম দিলেন।

ততক্ষণে শাহজাদা ছাগলের পেট থেকে বের হয়ে লুকিয়ে বাদশাহর কাছে চলে গেল। শাহজাদীকে খুঁজে বের করার প্রস্তাব দিলো। বাদশাহ শাহজাদার প্রস্তাব শুনে বললেন, তোমার দুই ভাই মারা গেছে। মিছামিছি কেন চেষ্টা করবে। তোমার বাবা নিঃসন্তান হবেন। দেশে চলে যাও। কিন্তু শাহজাদা একেবারে অনড়। অগত্যা বাদশাহ আর না বলতে পারলেন না।

শাহজাদা দুই দিন মিছামিছি বাগানে ঘুরে বেড়ালো। তৃতীয় দিন বাদশাহকে বললো, বাগানের পুকুরটা সেচে দিন। হুকুম মতো তাই করা হলো। পুকুরটার সব পানি সেচার পর একটা সুড়ঙ্গ দেখা গেল। বাদশাহকে বলতেই সুড়ঙ্গে যাওয়ার দরজার তালা খুলে দিতে আদেশ দিলেন।

তালা খুলে দিলে শাহজাদা গুপ্তঘরে ঢুকে পড়লো কিন্তু শাহজাদী কোথায়? সব যে দাসী-বাঁদি। আসলে ডাইনি বাঁদি সব টের পেয়ে গিয়েছিলো। তাই করলো কি শাহজাদীকে বাঁদির পোশাক পরিয়ে অন্য দাসী-বাঁদিদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলো। তাই শাহজাদা শাহজাদীকে চিনতে পারলো না।

শাহজাদার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো। সে তার গলার মুক্তোর হারটা ছিঁড়ে মাটিতে ছড়িয়ে দিলো। বাঁদি-দাসীরা লোভে মুক্তো কুড়াতে লাগলো। শাহজাদীর তো কোনো অভাব নেই। সে কেন মুক্তো কুড়াবে? সে দাঁড়িয়ে রইলো।

শাহজাদীকে চিনতে আর শাহজাদার কষ্ট হলো না। ডাইনি বাঁদির মুখটা চুপসে গেল। দারুণ জব্দ হলো সে। তার সব কারসাজি ব্যর্থ হয়ে গেল।

বাদশাহ খুব খুশি হলেন। মহা ধুমধামের সঙ্গে শাহজাদার সাথে শাহজাদীর বিয়ে দিলেন। আর ডাইনি বাঁদির মু-টা কেটে ঝুলিয়ে রাখলেন যাতে প্রজারা বুঝতে পারে শয়তানি করলে কি কঠোর শাস্তি পেতে হয়।

শাহজাদীকে নিয়ে শাহজাদা নিজের দেশে ফিরে এলো। বাদশাহ পুত্রের কৃতিত্ব দেখে খুব খুশি হলেন। শাহজাদা শাহজাদীকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলো।

ডিসেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# ভূতুড়ে কান্ড

আবদুল মান্নান সৈয়দ

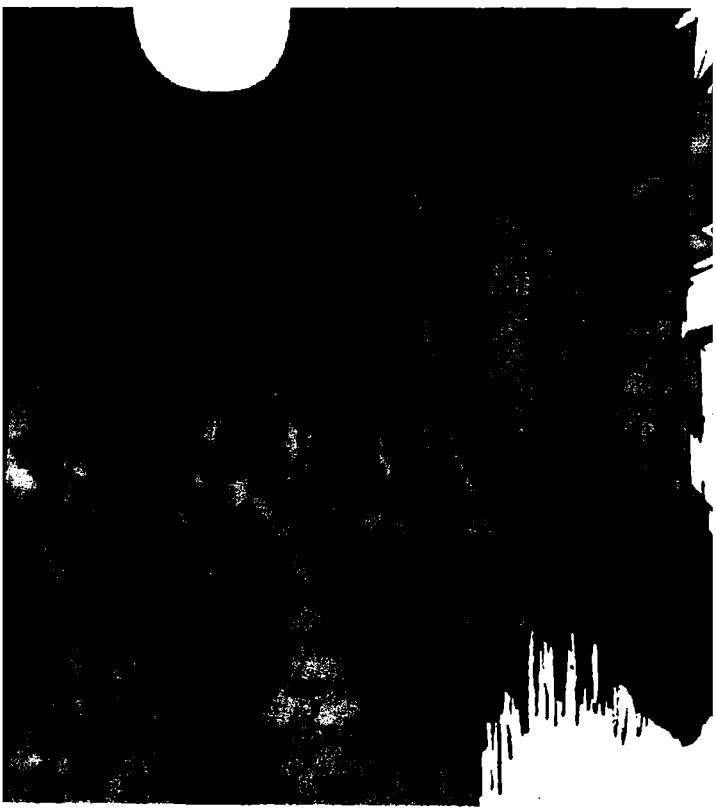

www.pathagar.org

১.

সে অনেক দিন আগের কথা।

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মই হয়নি তখনো। সদ্য এম এ পাস করেছি বাংলায়। তখনকার দিনে মানবিকে ওটাই ছিল সবচেয়ে উঁচু বিষয়। বাংলায় পড়ছি শুনলে লোকে মুচকি হাসতো। তখন দেশে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ধুম চলছে। এখনো বাংলার অবস্থা সে রকম কি না জানি না।

লোকে এখন আমাকে চেনে ব্যাংকার হিসেবে। তখনকার দিনে বাংলায় এম এ পাস করে ব্যাংকে ঢোকা যেতো। এখন যায় কি না জানি না।

ব্যাংকার হিসেবে অবসর নিয়েছি, সে-ও অনেক বছর হয়ে গেল। এখনো নামী ব্যাংকার হিসেবে একটা ব্যাংকের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত আছি। সে প্রায় নাম-কে-ওয়াস্তে। মাঝে মাঝে দু-একটা ব্যাংকিং কর্মশালায় বা অধিবেশনে নিমন্ত্রণও করে।

একটা বেশ বড় ব্যাংকের বড় একটা পদ থেকে অবসর পেয়েছিলাম। তো তাই হয়তো আমার আপনজনেরাও বিশ্বাস করতে চায় না যে আমি একদিন সাংবাদিক ছিলাম। সাংবাদিকতার পেশায় লেগে থাকলে এখন এতো দৈনিক পত্রিকা বেরিয়েছে, হয়তো সম্পাদক হয়ে যেতাম কোনো পত্রিকার, অন্তত পক্ষে ঝানু একজন সাংবাদিক। তবে আমার সেই সাংবাদিক জীবন ছিল খুব অল্প দিনেরই। আমারই ভুলে যাবার কথা।

কিন্তু ভুলতে যে পারিনি, তার একটা কারণ আছে।

এম এ পরীক্ষার রেজাল্ট তখন সদ্য বেরিয়েছে। বেশ ভালোভাবেই পাস করেছি। বন্ধুদের দেখাদেখি এখানে ওখানে চাকরির দরখাস্ত পাঠাচ্ছি। কিন্তু সেসব যে কোথায় লাপাত্তা হয়ে যাচ্ছিল, টের পাচ্ছিলাম না।

একটারও জবাব পাওয়া যায়নি। বন্ধুরা কেউ কেউ হুটহাট করে চাকরি পাচ্ছে। তাতে একটু মনও খারাপ হয়ে গেছে যদিও তবু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ফাড্ডাও চলছে ঠিকই।

এমননি একদিন বড় মামা এসেছেন আমাদের বাড়িতে।

আমি তখন বেরোচ্ছিলাম।

বড় মামা বললেন, কোথায় যাচ্ছিস?

আম্মা বললেন, কোথায় আর যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যাচ্ছে। তারপর বললেন, 'ভাই, ও তো বাংলায় এম এ পাস করেছে। তোমাকে এক ডাকে চেনে সবাই। তুমি ওকে একটা পত্রিকায় ঢুকিয়ে দাও না।'

আমার দিকে তাকিয়ে বড় মামা বললেন, আমিতো ভেবেছি, তুই অধ্যাপনা করবি। তা সাংবাদিকতার দিকে ঝোঁক টোক আছে তোর?

আমি কিছু বলার আগেই আম্মা বললেন, করবে না কেন? সাংবাদিক হিসেবে কম নাম ডাক হয়েছে তোমার?

বড় মামা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পড়েছিস তো বাংলায় ইংরেজিটা ভালো জানিস



www.pathagar.org

তো? ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে দেবো। পারবি?'
বললাম, 'পারব মামা।'
বড় মামা পুরনো দিনের সাংবাদিক। নজরুল ইসলামের দৈনিক নবযুগে কাজ করেছেন। কবি নজরুল ইসলাম, কবি শাহাদাৎ হোসেন, সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল এদের সঙ্গে ভাল আলাপ ছিল তার। আমাদের কাছে নজরুল ইসলামের অনেক গল্প করেছেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে যখন পড়েন, তখন একবার নজরুলকে তাদের বেকার হোস্টেলে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন গান গেয়ে আবৃত্তি করে আসর মাতিয়ে দিয়েছিলেন নজরুল।
আমি যখনকার কথা বলছি, তখনকার দিনে সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা ছিল আজাদ। বড় মামা ঐ দৈনিক আজাদেরই বেশ উপরের একটা পোস্টে কাজ করতেন। তখনকার দিনে যেমন হতো, বড় মামা আরো বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। দৈনিক মিল্লাতেও ছিলেন কিছুদিন। এক কথায়, বড় মামা ছিলেন সেকালের একজন নামকরা সাংবাদিক।
সেদিন বড় মামা বললেন, ঠিক আছে। সামনে, সপ্তায় এসে আমি তোকে নিয়ে যাবো। আম্মার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, ভাই, তোমার যে নাম ডাক, তাতে তুমি একটু বলে দিলেই হলো। কোথায় টো টো করে ঘুরে বেড়ায়।
আমি বেশ খুশি মনেই আড্ডা দিতে বেরিয়ে পড়লাম।

২.

পরের সপ্তায় বড় মামা এলেন।
তখনকার দিনে সাংবাদিকদের তো এতো গাড়ি টাড়ি হয়নি। তার মধ্যেও বড় মামার ছিল রাজকীয় চাল। ঢাকায় তখন বেবি ট্যাক্সি চালু হয়েছে। বড় মামা বেবি ট্যাক্সি করে বেরুতেন। বেবিট্যাক্সি চলতো মিটারে। বড় মামা হয়তো আমাদের বাড়িতে এসেছেন, ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করেছেন। বেবিট্যাক্সির মিটার উঠছে।
এতো দৌড়ঝাঁপও ছিল না মানুষের। ঢাকা শহর বেলা দশটার আগে জাগতো না।
যাই হোক, বড় মামা আমাকে নিয়ে গেলেন ঢাকার তখনকার একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার অফিসে। বড় মামার নিজের পত্রিকায় নয়।
দেখলাম, বড়মামাকে অনেকেই চেনে, সালাম দিচ্ছিল অনেকেই, বড় মামা তার স্বভাবসুলভে সবার সঙ্গে গল্প টল্প করে আস্তে ধীরে দোতলায় উঠলেন। আমাকে নিয়ে গেলেন পত্রিকার মালিক সম্পাদকের ঘরে। দশাসই বিরাট চেহারা। দেখলেই ভয় লাগে।
সম্পাদকের ঘরে ঢুকেই মামা বললেন, মানিক, এই হচ্ছে আমার সেই ভাগনে যার কথা বলেছিলাম তোমাকে।



www.pathagar.org

সম্পাদক সাহেব বললেন, এ তো দেখছি একেবারে বাচ্চা ছেলে।
মামা বললেন, এই তো সদ্য এম এ পাস করেছে এবার।
সম্পাদক সাহেব বললেন, ঠিক আছে। তোমার ভাগনে। লেগে যাক। চলো, সিরাজের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিই।
সম্পাদক সাহেব আর বড় মামার পেছনে পেছনে আমি গেলাম সিরাজ সাহেবের ঘরে। সিরাজ সাহেব আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন।
সম্পাদক সাহেব বললেন, 'বোসো, বোসো।' সিরাজ সাহেব বড় মামাকে বললেন, জাফর ভাই, কেমন আছেন?
'এই আমাদের তরুণতম সহকর্মী। সম্পাদক সাহেব এভাবে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই সম্পাদকের নাম এখন দেশজোড়া। সেদিনই আমি টের পেয়েছিলাম তার মহত্ত্ব।
মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন আমাকে একটা বড় হলঘরে নিয়ে গেলেন। কাজ করছিলেন কয়েকজন। নতুন জয়েন করেছি বলে সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিয়োগপত্র পেতে পেতে অবশ্য মাসও পার হয়ে গেল। তবে এটা বুঝলাম যে আমার অনুবাদ আর বাংলা লেখার ধরন সিরাজ ভাই বা অন্যদের পছন্দ হচ্ছে। অনুবাদের কাজই বেশি করতে হতো।
আমাদের বাড়িতে আব্বা দুটো দৈনিক পত্রিকা রাখতেন। একটা বাংলা আর একটা ইংরেজি। তখনকার দিনে বিখ্যাত ইংরেজি কাগজ ছিল অবজারভার। আব্বা, আম্মা, আমরা অনেক ভাই বোন সবাই তো কাগজ পড়তো। দিনের বেলা আমি সময় পেতাম না। ইউনিভার্সিটিতে উঠে পড়াশোনার চেয়ে আড্ডাই দিতাম বেশি।
রাত দশটা পর্যন্ত নিজস্ব পড়াশোনা করে, খেয়ে দেয়ে পত্রিকা দুটো খুঁটিয়ে পড়তাম। এটা আমার একটা অভ্যাস ছিল । এটাই এখন কাজে দিল।
সাহিত্যের ছাত্র হলেও সাহিত্যের দিকে আমার তেমন ঝোঁক ছিল না। সাহিত্যে একটা বিষয়ই ভাল লাগতো সাহিত্যের ইতিহাস। হয়তো আমার মধ্যে একটা সাংবাদিক প্রবণতা, তথ্য জানার প্রবণতা ছিল।
ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমাদের দু-একজন বন্ধুও খবরের কাগজে পার্ট টাইম কাজ করতো। একজন ছিল শহীদুর রহমান। শহীদ দৈনিক সংবাদে চাকরি করতো। ওর সঙ্গে আমার ছিল বেশ বন্ধুত্ব। ঢাকা হলে থাকতো। সেখানেও অনেকবার গিয়েছি ওর রুমে। শহীদ খুব সম্মানের সঙ্গে নাম করতো রনেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সারদের। ওর সাংবাদিকতার শিক্ষানবিস হয়েছিল ওঁদের হাত ধরেই।
বাংলা আর ইংরেজি খবরের কাগজ দুটো রাত দশটার পরে পড়তাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিন্তু সাংবাদিক হবো, কখনো ভাবিনি।
হতেও পারিনি অবশ্য।



www.pathagar.org

কয়েক মাস পরেই সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তারপরেও বেশ কিছুদিন বসে থেকে বড় মামাই এক ব্যাংকে জুনিয়র অফিসার হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সে-ও আম্মার সুপারিশে।

যে কথা বলছিলাম–

আমার কাজ দেখে সিরাজ ভাই খুশি হয়েছিলেন। সম্পাদক সাহেবও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বড় মামাও ভাবছিলেন যে ভাগনে তার নাম রাখবে। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই আমার সাংবাদিক ক্যারিয়ারে যতি পড়ে গেল। নতুন বলে, আর অনুবাদ ভাল করতে পারি বলে, রাশি রাশি অনুবাদের কাজ এসে পড়লো আমার উপরে।

তখন তো আর বুঝতাম না। পরে বুঝেছি। সিনিয়রদের কিছু কিছু কাজ সইতে হতো আমাকে। তাতে উপকারই হয়েছিল আমার। সরাসরি অনুবাদ করতাম।

অনেক লেখা আবার মূল বিষয় ঠিক রেখে নিজের মতো করে লিখতে হতো।

মাস দু-তিন যেতে না যেতেই আমার নামে অফিসে ছোট বাথরুমের মতো একটা ঘর বরাদ্দ হয়ে গেল। অভাবিতভাবেই। সিরাজ ভাই ছিলেন কাজ পাগল লোক। নাওয়া খাওয়ার ঠিক ছিল না। পত্রিকা কী করে জমিয়ে তোলা যায় এটাই ছিল তার একমাত্র ভাবনা। সিনিয়র-জুনিয়র ধার ধারতেন না। কার কী স্ট্যাটাস সেটা নিয়েও মাথা ঘামাতেন না। শুনেছি সম্পাদকীয় বৈঠকগুলোতে মালিক সম্পাদককেও কেয়ার করে কথা বলতেন না। আমি একটু নিরালয়ে তাকে ভাল কাজ দিতে পারবো বলেই আমার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন।

আগে ঘরটা পুরনো পত্রিকার স্তূপে বোঝাই করা ছিল। এখন ঘর পরিষ্কার করে আলো আর পাখার ব্যবস্থা করা হলো। ছোট একটা জানালাও ছিল। সিরাজ ভাইয়ের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। আলাদা ঘর পেয়ে আরো মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতে পারতাম। আর কাজ করতে ভালও লাগত আমার।

নতুন চাকরি পেয়েছি। মাস গেলে কিছু টাকা পেতাম। এখন শুনলে লোকে হাসবে, মাসে দেড়শো টাকা। তিন মাস পরেই অবশ্য টাকাটা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তবে, মাস শেষ হলেও টাকা পেতাম না। পেতাম মাসের অন্তত অর্ধেক হলে। বা তারও পরে। কিন্তু তারপরেও টাকা যখন পেতাম, কী যে ভাল লাগতো।

পোশাক-আশাকে আমি সব সময়ই একটু সৌখিন। গ্যানিজ, রাজ্জাকস তখনকার ঐসব বিখ্যাত দোকান থেকে কাপড় চোপড় কিনতাম। নানারকম সৌখিন জুতোও ছিল আমার।

খবেরের কাগজের চাকরি, অবসর সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মাইনে পেয়ে বাড়িতে বিপুল খাবার দাবার নিয়ে আসা– এইসবের ভেতর দিয়ে দিন যাচ্ছিল চমৎকার। আব্বা-আম্মাও খুশি। বড় ভাই ডাক্তার হয়েছে। সেজ ভাই পিআইএ-তে জয়েন করেছে। সাংবাদিক হিসেবে বড় মামার জায়গায় আমি একদিন অধিষ্ঠিত হবো



www.pathagar.org

আব্বা-আম্মা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছেন। কিন্তু তখনই ঘটনার মোড় ঘুরে গেল অন্যদিকে।

৩.

আমরা থাকতাম তখন রথখোলায়।

বহুকালের পুরনো একটা বিশাল দোতলা বাড়িতে। একতলা দোতলা মিলিয়ে তার যে কতো ঘর ছিল, কল্পনা করা যায় না। বাড়িটা নিশ্চয়ই কোনো সেকালের জমিদার বা রাজা মহারাজার ছিল। আমরা যখন ছিলাম, বাড়িটার জীর্ণ দশা।

এই বাড়ির দোতলায় এক পাশে থাকতাম আমরা। আর এক পাশে থাকতো আর একটি পরিবার। তরপরও অনেক ঘর খালি পড়ে থাকতো। আমরা সেদিকে যেতামও না। নিচের তলাটা পুরোটাই খালি পড়ে থাকতো। শুধু এক পাশে আমাদেরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় যুবক থাকতেন। আব্বাই তার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তার কোনো ভাড়া দিতে হতো না। আমাদের চেয়ে বয়সে তিনি বেশ বড়।

এহিয়া মামা বলে ডাকতাম আমরা তাকে। তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু ছিলেন অসম্ভব মেধাবী। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। আমরা শুনেছি, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তাকে অধ্যাপনার জন্য ডাকা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যাননি। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার বিজ্ঞানসাধক। একজন মাত্র সহকারী ছিল তার। এহিয়া মামা নিজে কী সব ওষুধ তৈরি করতেন। আর সেসব বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই দিতেন। এছাড়াও তিনি নিজে কী এক গবেষণা করতেন অনেক রাত অবধি। বিদেশী বিভিন্ন জার্নালে তিনি লিখতেন, কিন্তু দেশে কেউ তাকে চিনতো না। আমাদের সঙ্গে দেখা হলে কোনো কথা বলতে পারতেন না এহিয়া মামা। একটু হাসবার চেষ্টা করতেন। এটুকুই। বোঝা যেতো, কথাবার্তায় তিনি ঠিক পটু নন।

ততোদিনে আমাকে একটা আলাদা ঘর দেয়া হয়েছে অফিসে। তার জন্য আমি যে একটু গর্ববোধ করতাম না, তা নয়। আম্মাকেও সগর্বে শুনিয়ে দিয়েছিলাম। লক্ষ্য করতাম, এজন্য সহকর্মী দু-একজনের একটু ঈর্ষাও। তখনই প্রথম ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু যা হয়– প্রথমদিকে আমি খেয়ালই করিনি।

৪.

আজকালকার দিনের মতো তখনকার দিনে লোকে এত গাড়ি, বেবিট্যাক্সি, বাস, রিকসা, টেম্পোয় চড়তো না। হেঁটেই যাতায়াত করতো। আমিও সাধারণত অফিসে হেঁটেই যাতায়াত করতাম।

অফিসে সেদিন বেশ রাত হয়েছে আমার। ওই অফিসে রুমের চাবি আমার কাছেই থাকতো। আর একটা দারোয়ানের কাছে। সেদিন একটানা কাজ করে অসম্ভব ক্লান্ত ছিলাম। এত ক্লান্ত যে শরীর ভেঙে পড়েছিল। হাঁটলেই শরীর চাঙ্গা হয়ে যাবে ভেবে



www.pathagar.org

বেরোলাম। ফ্যান বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দরোজা বন্ধ করে চাবি লাগাচ্ছি, হঠাৎ ঘরের মধ্যে কী যেন পড়ার শব্দ হলো। বেশ জোর শব্দ। ভাবলাম, পেপার ওয়েট পড়ে গেল নাকি? তাড়াতাড়ি দরোজা খুলে আলো জ্বালিয়ে দেখতে গেলাম। দেখলাম কই, কিছুই তো নেই মেঝের পরে। তাহলে বোধ হয় অন্য কোথাও শব্দ হয়েছে। আবার আলো নিভিয়ে দরোজায় তালা দিয়ে বেরুলাম।

তখনও আলো জ্বলছে অফিসে। বড় হলঘরেও কয়েকজন কাজ করছে বা গল্প করছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসার সময় মনে হলো কে যেন আমার পেছন পেছন হেঁটে আসছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি আধময়লা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা এক ভদ্রলোক আস্তে আস্তে নেমে আসছেন। আমাদের অফিসের কেউ নয়। খবরের কাগজের অফিসে কত লোকই তো আসে ভেবে ভুলে গেলাম।

আর একদিন। মানে রাত। আমাদের কাজ তো বেশির ভাগ রাত্রিরভাগ রাত্রিবেলাতেই। সেদিন মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল। কাজ ছিল না তেমন। অল্প কাজ শেষ করে গল্প করছিলাম সহকর্মীদের সঙ্গে। উঠব উঠব করছি রাত তখন দশটা ছাড়িয়েছে– জরুরি একটা লেখা তৈরির জন্য এসে পড়লো। খবরের কাগজের কাজ তো। তখই করতে হবে। আগামীকালের কাগজেই যাবে।

সেই কাজ শেষ করতে করতে বেজে গেল রাত একটা।

গরমে রাত।

ফাঁকা রাস্তা।

ফুরফুরে হাওয়া।

আকাশ তারায় তারায় ছাওয়া।

চমৎকার লাগছিল হেঁটে যেতে। সব ক্লান্তি কেটে যাচ্ছিল। নবাবপুর দিয়েই আমরা সব সময় রথখোলায় ঢুকি। গান টান আসে না আমার। কিন্তু ফুরফুরে হাওয়ায় জ্যোৎস্নায় এমন একটা আনন্দ হচ্ছিল যে আমার গলাতেও গুন গুনিয়ে উঠলো গান।

নবাবপুর হয়ে রথখোলার বাসায় এসে ঢুকলাম। তখনকার দিনে অনেক বাড়িতেই যেমন গেট ছিল না, আমাদের বাড়িটাও ছিল তেমনি। হাট করে খোলা।

এহিয়া মামা তো একতলায় থাকতেন। রাতে তিনি যে কখন ঘুমাতেন জানি না। আমি তো প্রায়ই রাত করে ফিরতাম, দেখতাম তার ঘরে আলো জ্বলছে। দোতলায় উঠবার সিঁড়ির পাশেই ছিল তার ঘর। সিঁড়িতে আমি উঠতে যাবো, পেছনে পায়ের শব্দ শুনে দেখি কে একজন এহিয়া মামার ঘরের দিকে যাচ্ছে। ভাবলাম মামার সহকারী, মামার সহকারীকে তো চিনি। জায়গাটা অন্ধকার। ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখা গেল না। কিন্তু ধরন ধারণ দেখে বোঝা গেল অন্য লোক।

কয়েক দিন পর ছুটির এক বিকেলে সদরঘাটের দিকে বেড়াতে যাব বলে বেরিয়েছি। দেখি, মাথা নিচু করে এহিয়া মামা আসছেন। ধ্যানমগ্নের মতো সব সময় যেমন তিনি



www.pathagar.org

থাকেন।
এমনি জিজ্ঞেস করলাম, 'এহিয়া মামা, নতুন একজন সহকারী রাখলেন নাকি?'
এহিয়া মামা মাথা উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, না তো।
বললাম, সেদিন রাতের বেলা দেখলাম যে। উনি শান্তভাবে বললেন, আগের সেই ভদ্রলোকই কাজ করছেন।
আমি বললাম, একটু উত্তেজিত হয়ে, 'চোরচাট্টা আসেনি তো?'
'কই না তো।' বললেন, এহিয়া মামা।
এহিয়া মামার একটা অভ্যাস হচ্ছে, যার সঙ্গে কথা বলবেন সে না নড়া পর্যন্ত তিনি সরে যান না। তার যেন কোথাও কোনো তাড়া নেই। বড়দের সঙ্গে তো বটেই, আমরা যারা তার চেয়ে বয়সে ছোট তাদের সঙ্গেও তিনি একই আচরণ করেন।
এহিয়া মামার কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ জবুথবু হয়ে থাকলাম। তারপর আমি নড়ার পর এহিয়া মামা তার ঘরে চলে গেলেন।
সেদিন সদরঘাটে আমি গেলাম। বুড়িগঙ্গার ধারে নদীর সুন্দর হওয়ায় হাওয়ায় ঘুরেও বেড়ালাম। নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার ভেসে যাওয়া মানুষের ওঠানামা, কলরব, ভিড় সব দেখতে দেখতে ও ছুঁতে ছুঁতেও ভেতরটা খচখচ করতে লাগলো।
কে এসেছিল অত রাতে?
লোকটার মুখ দেখতে পাইনি, কিন্তু এসেছিল তো একজন কেউ। কে সে?
ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কী ব্যাপার হচ্ছে। একটা ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। কী যেন একটা ঘোরের ভেতরে চলে যাচ্ছিলাম।
আর একদিন রাত্রিবেলা অফিস থেকে ফিরছি। সেদিন আমার এক সহকর্মী আমার সঙ্গে। বয়সে আমার চেয়ে বেশ বড় হলেও তার সঙ্গে আমার বেশ একটা বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। উনি বাংলা পত্রিকায় চাকরি করলে কী হবে, খুব ভালো ইংরেজি জানতেন। আমাকে কেন যেন পছন্দ করতেন বেশ। থাকতেন পুরানা পল্টনে, টিনের একটা বাড়িতে। সে বাড়িতেও তার সঙ্গে গিয়েছি। চা-টা খেয়েছি। তো, সেদিন একসঙ্গে অনেকখানি এসে উনি চলে গেলেন গুলিস্তানের দিকে। আমি নবাবপুরের পথ ধরলাম। দু-চারটে দোকান খোলা ছিল। ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছিল। রথখোলার মুখে এসে গলিতে ঢুকতে যাব, দেখি এক পাল কুকুর রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে। এতো কুকুর কোত্থেকে এল? এতদিন যাতায়াত করছি এ রাস্তায়, দেখিনি তো কখনো। আলো-অন্ধকারে কুকুরগুলোকে আবার ঠিক কুকুর বলে মনে হচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই ওদের চোখ জ্বলে উঠছিল। টর্চলাইটের আলোর মতো।
ভয় পেয়ে আমি আর নড়তে পারছি না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছি। সামনে পেছনে তাকিয়ে দেখি একটি জনপ্রাণী নেই। নবাবপুরের দিক থেকে মনে হলো দু-তিনজন লোক আসছে। ফাঁকা রাস্তায় অনেক দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল। লোকগুলো



www.pathagar.org

কাছে এলে আমি এগোবো মনে করে, সেদিকে তাকিয়ে আছি। তারপর একবার ফিরে দেখি, কুকুরগুলো নেই, চলে গেছে কোথায়।

সাহসে ভর করে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়িতে পৌঁছলাম।

পর পর এই সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। ভয়ে কুঁকড়ে গেলেও আমার জীবনের প্রথম চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারছিলাম না।

ছাড়তে বাধ্য হলাম শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনায়। সেদিনও বেশ রাতেই ফিরছিলাম অফিস থেকে।

বোধ হয় সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল সব। আকাশে সোনার ডিমের মতো চাঁদ। আকাশও পরিষ্কার। তারাভরা আকাশে সাদা মেঘ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। আসলে সেটা ছিল শরৎকালের রাত্রি। শারদীয় পূর্ণিমার রাত্রি।

নবাবপুরের মোড়ে অত রাতেও একটা পান সিগারেটের দোকান খোলা ছিল। খোলা ছিল মানে ঝলমল করছিল। দু-তিনটে হোটেল রেস্টুরেন্টও তখন খোলা। খদ্দের দু-একজন আছে কি নেই। দূরে দূরে লাইটপোস্ট জ্বলছে। খাঁ খাঁ রাস্তা রাত্রিবেলা যেন চওড়া হয়ে গেছে আরো। এরকম অদ্ভুত সুন্দর রাতে হেঁটে যেতে কী যে ভাল লাগছিল। মোড়ের পরে নবাবপুর রাস্তার দু'পাশের দোকান বন্ধ।

দেখলাম সামনে এক ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছেন। আমার একটু ভয় ভয় লাগছিল। তাই ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গ নেয়া দরকার। একটু জোর কদমে হেঁটে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। তখনও একটু দূরত্ব আছে। হঠাৎ সামনের ভদ্রলোক পেছন ফিরে তাকালেন।

মুহূর্তে আমি ভদ্রলোকের চেহারা চিনলাম। এই ভদ্রলোককেই একদিন আমি অফিসের সিঁড়িতে আমার পেছনে আস্তে আস্তে নামতে দেখেছিলাম। তারপরই চলন দেখে মনে হল, আরে! একদিন রাত্রিবেলা এই লোকটিকেই তো এহিয়া মামার ঘরের সামনে দেখেছিলাম। তারপর লোকটির মুখটা হয়ে উঠলো একটা দপদপে আগুনের চাকার মতো।

আমি চিৎকার করে পেছন ফিরে ছুটতে ছুটতে নবাবপুর রাস্তার তখনো খোলা একটা হোটেলের ভেতরে এসে ঢুকে পড়লাম। মূর্ছিতের মতো। তখনো যে ক'জন ছিল, তারা আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো। একটু সুস্থির হয়ে এক গেলাস পানি খেলাম। তারপর ওদের সব বললাম। ওরা এত ভাল লোক যে, দু'জন তাগড়া জোয়ানকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিল। তারা আমাকে বাড়ির একেবারে দোতলা পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়ে গেল। এদের উপকারের কথা আমি কখনো ভুলবো না।



www.pathagar.org

৫.

পরদিন সকাল বেলাতেই প্রচ- জ্বর এল আমার।

শরীর যখন একটু ভাল হলো, আব্বা-আম্মা ভাই বোনদের সব বললাম। বড় মামাও খবর পেয়ে এলেন। বড় মামাকেও সব বললাম। সব শুনে বড় মামা বললেন, ধুৎ! 'যত সব গাঁজাখুরি!'

আম্মা বললেন, 'না বাপু, ওকে আর এ চাকরি করতে দেবো না।'

হাসলেন বড় মামা। বললেন, চাকরি ভাল লাগছে না, তাই বল। কিন্তু তোকে তো ওরা বেশ পছন্দ করেছিল।'

বলে চা-টা খেয়ে বড় মামা সেদিনকার মতো চলে গেলেন। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি বলে আব্বাকে দেখলাম একটু গম্ভীর।

কিন্তু কয়েক দিন পরে বড় মামা এলেন আমাদের বাড়িতে। এসে অফিসে যে খবর পেয়েছেন, সেটা জানালেন।

অফিসের যে ঘরে বসে আমি কাজ করতাম অনেক বছর আগে ঐ ঘরে কাজ করতেন বয়স্ক একজন সাংবাদিক। একদিন তিনি সেই যে অফিস ছেড়ে চলে গেলেন, তারপর পরে কেউ তার খোঁজ পায়নি। পরের দিনই তার বাড়ির লোকজন এসেছিল তিনি বাড়িতে না ফেরায়। তারপর কাগজে আমাদের এ পত্রিকাতেই শুধু না, বাংলা-ইংরেজি তখনকার সবগুলো দৈনিক পত্রিকাতেই বড় বড় করে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। পুলিশে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেউ আর কোনোদিন তার খোঁজ পায়নি। সম্পাদক সাহেব, প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন এই ঘটনা জানতেন। সে জন্যই ঘরটা পত্রিকা বোঝাই করে বন্ধ করে রাখা হতো। সিরাজ ভাই ভেবেছিলেন অনেক দিন হয়ে গেছে, ঘরটা খুলে দেয়া যাক এবার। তিনি নিজেও ঘটনাটি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। আমার একটা কৌতূহল ছিল ভদ্রলোকের কোনো ছবি পাওয়া যায় কি না। কিন্তু এখনো হয়নি তা। সাহসে কুলোয়নি। সত্যি সত্যি যদি মিলে যায়! চেহারাটা তো পরিষ্কার দেখেছি আমি দু'-দু'বার।

তারপর আর ওরকম কিছু ঘটেনি।

ঐ ভদ্রলোককেও আর কখনো দেখিনি কোথাও।

ডিসেম্বর, ২০০০



www.pathagar.org

# মার্জার সারমেয় সংলাপ

আল মুজাহিদী

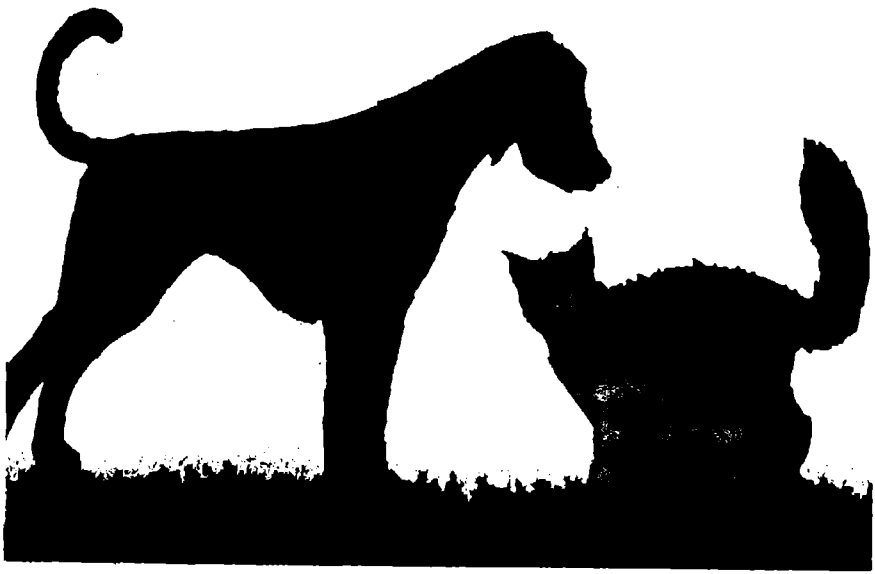

www.pathagar.org

মার্জার আর সারমেয়-তে ভীষণ ভাব। গলায় গলায় খাতির। রাতের ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে দেখা না হলে কথা না বললে ওদের পৃথিবীতে ভোর হয় না কোনোদিন। পৃথিবীর আলো বাতাস থেমে থাকে যেন। পাখি জাগে না। ফুল ফোটে না। বনে বাদাড়ে হই হুল্লোড় হয় না। বাগানে গান হয় না পর্যন্ত। বাস, ট্রাক, রিকশা টেম্পো, ম্যাক্সি, ট্যাক্সি-ক্যাব, ডবল ডেকার, ফেটন গাড়ি, ফিটন গাড়ি কিছুই ছোটে না কোনোদিকে। কোথায় হুলি? কোথায় ভুলি? শহর শুদ্ধ নাম ডাক ওদের। ওরা আগে কাছাকাছিই থাকতো। পাশাপাশি বাড়ি। রাজা শায়েবের খাস তালুকে। হাবেলি প্রজার মতো। তাই বলে ভাড়া করা কোনো বাড়িতে নয়। ভুলি থাকতো রানীবিবির বাড়ি। রাজাশায়েবের বাড়ি থাকতো হুলি। এরা দু'জনেই স্বদেশী বন্ধু। নিজেদের দেখাশুনা নিজেরাই করতো। আন্তরিক ওরা এ ব্যাপারে। কেউ কারুর হিস্যায় বাদ সাধতো না কক্ষনো। কস্মিনকালেও।

একদিন হুলি বললো, ভাই ভুলি, আজ রাত বারোটায় ডাইনিং টেবিলে উঠে যেই খেতে গিয়েছি চুপি চুপি– তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অমনি গলায় বেঁধে গেলো সিলভার কাপের আস্ত একটা কাঁটা। গলায় হেঁচকি উঠল। খকখক খিকখিক করে কাশতে গিয়ে রানীবিরি ঘুম ভেঙে গেল। বিরক্ত হয়ে রাগে ফেটে পড়লেন রানীবিবি। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন–

ওখানে কে রে? এতো রাতে চপ চপ করে কে কি গিলছে ওখানে? চোর! ধর ধর। পাকড়াও কর। রানীবিবির চিৎকারে সবার ঘুম ছুটে গেল। এভাবে কি আর কেউ জেগে থাকতে পারে? টুনি, টিটি, টুম্পা জাগল। কাজের ছেলেমেয়েরা জাগল। সবার হাতে লাঠিসোটা। স্টিলের রোলার। দা, খুন্তি, কিরিচ। কই? কোনোদিকে তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। দরোজা বন্ধ। জানালা বন্ধ। কলাপসিবল গেট বন্ধ। সব দিক তো ঠিকঠাক রয়ে গেছে। চোর আসবে কোন পথে? চোরের বাপের সাধ্যি কোথায়? এতো বড়ো বুকের পাটা কার? হিম্মৎ কার যে রানীবিরিব ঘরে ঢোকে? রানীবিবি ডাকসাইটে মানুষ। ঘরের ভেতর সে রকম আর কাউকে না পেয়ে সামনেই ছিলো হুলি, হুলি কানের নতিটা ধরে উত্তম-মধ্যম বেশ বসিয়ে দিলেন রানীবিবি।

তুই-ই রাতভর ঘরের ভেতর এসব করছিলি। মারের চোটে আর কোনো কথা বলতে পারেনি হুলি। পরদিন ভোরে আগ বাড়িয়ে জানালার ফোকর গলিয়ে ও বাড়ির ভুলিকে বলল, 'আমার বেঁচে থাকা দায় এখানে। এখন ভীষণ দুঃসময়। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না আমাকে। আমার ক্ষিদে পেলে মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। ভুলি সমবেদনা জানিয়ে বলল, হ্যাঁ হুলি, আমাদের তো দিন এনে দিন খেতে হয়। আমাদেরকে মনিব দুটো খাবারই দেয়য মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। সারা রাত জেগে বাড়ি পাহারা দিই। চোখের ঘুম হারাম করে আর সূর্যমামার জাগার আগ পর্যন্ত আমরা জেগে থাকি। শরীর খারাপ হয়ে যায় দিন দিন। হসপিটাল, ক্লিনিকে চিকিৎসা হয় না আমাদের। মুখে কোনোদিন একটু আধটু অরুচি হলে কাউকে কিছু বলতেও পারি না। বলাও যায় না।



www.pathagar.org

আবার মালিক কি মনে করবে– এই ভেবে।

– হ্যাঁ, ভাই। ঠিক বলেছো। ওরা তো সারাদিন খায়। আমাদের চোখের সামনে। ওদের ছেলেপুলেরা কত্তো কি খায়। ভাত মাছ তো আছেই। মুরগি-মোরগ মুসাল্লাম, পোলাও কোর্মা-কোপ্তা-কালিয়া। ফিরনি পায়েস। সস। চাটনি। সালাদ। বেইলি রোডের ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে কত কিছিমের খাবার। কিটকার্ট, পার্ক, জ্যাম, হুগডগ, ভেজিটেবল রোল, স্যান্ডউইচ, উইগ কোন-কাপ-চকবার মিনুবার, লনিপপ, বারগার, পেস্টি কেক, ক্রিমরোল, পিজা ইত্যাদি ইত্যাদি, ইত্যাদি। খেতে খেতে হয়রান হয়ে আবার অরেঞ্জ জুস, এ্যাপল জুস, ম্যাংগোজুস ইত্যাদি ইত্যাদির পরও এতো খেয়েও ওদের পেট ভরে না। আমাদের একটু আধটু দিলেই ওদের সব শেষ হয়ে যায়। রাজভা-ার খালি হয়ে যায় আর কি! ভুলির কথা শেষ হতে না হতেই হুলি বলে উঠলো–

হুলি তুমি আমার পেটের কথাটাই বলে ফেলেছ। আমার রাজাশায়েব হাতে হান্টার নিয়ে গুলশান পার্কে বেড়াতে গিয়ে তাবরিজ শায়েবকে বললেন–

–শোনো, শোনো, ওকে নিয়ে আর পারছি না। ওর পেছনে মাসে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায় আমার। ওর খানা বাবদ। এ ছাড়া হেলথ কেয়ার। অন্যান্য খরচও আছে অনেক। কিন্তু ওর কাছে থেকে রিটার্ন পাই একেবারে কম। বিপদ আপদে আমাকে সাহায্যও করতে পারে না তেমন। ঐ যে, জানো তো আমাকে স্মাগলিং কেসে আসামি করে ধরতে এলে সেদিন ওরা রাতের মুখোশ পরে। রাত দুপুর। সাদা পোশাকের পুলিশেরা। এই হুলির ছোট বোন টুলি পর্যন্ত একটা রা করেনি। সাড়াশব্দ করেনি। ঘেউ ঘেউ করা তো দূরের কথা।

তাবরিজ খান বললেন,

– তাহলে ওদের পেছনে এত পয়সা ঢেলে নাকে মুখে পুষে আমাদের কি লাভ? পুলিশের সাথে ওদের কোনো যোগসাজশ নেই তো? ভাগ বাটোয়ারা পায় টায় নাকি, মাস শেষে? সেটা থাকলে থাকতেও পারে। মাস কাবাড়িতে আমরাও তো কিছু দিয়ে থাকি ওদের। ওরাও ভিন্ন স্বাদের কিছু খাবার দাবার ছুড়ে দিতে পারে দেয়ালের ওপর দিয়ে। কোনো ফিকির ফন্দি করে।

– তুমি জানো না বুঝি কিছু। পাঁচিল গলিয়ে, চোরা কুঠুরির ওধার দিয়ে অনেক কিছু ঘটে যায় রোজ। রাতের আন্ধারে। আমাদের কথাই ভেবে দেখো না কেন?

– হু। হুঁ। ঠিক বলেছো সেটা। আমরাও আমাদের মনিবের প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারি না। আর আজকাল। কারণ তারাও আমাদের দেখেন না আগের মতন। আমরা কি খাই। কি পরি। কখন ঘুমোই। কখন জাগি। কিছুরই খোঁজ খবর করেন না তারা। বাঁচি কি মরি, এর কোনো দায় দায়িত্ব নেই তাদের। দুনিয়ায় আমাদের তো তেমন কেউ-ই নেই।

– এই দেখো। আমার গলায় দাগ বসে গেছে। গলার বেল্টটা কতো ভারী। কতো ওজন। হাতে একটু ধরেই দেখো।

– সেটা আমি জানি। আমাকেও তো তোমার মতই বেঁধে রাখে। দিনের বেলায়। রাত



www.pathagar.org

হলে না ছেড়ে দেয়। ঘরের ভেতর। একটু বাইরে যাবার জো নেই আমার। একটা দুটো শিকার করতে না পারলে দিনের খাওয়া বন্ধ। পঁই পঁই করে আনাচে কানাচে, ঘরের কোনাকঞ্চি, ঘুপটি, ঘাপটি খুঁজে গন্ধ শুঁকে, ইঁদুর, আরসোলা, চিকা, তেলাপোকা, অন্য যে কোনো ছোট বড় পোকামাকড় ধরে আনতেই হবে। রানীবিবিকে দেখাতেই হবে শিকার পেয়েছি। এ না হলে তিনি খুশি হবেন কি করে? হুলির কথা বেশ মন বসিয়ে শুনল ভুলি। সে-ও তার নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে চেষ্টা করে।

– চোর ডাকাত শিকার না পেলেও অন্তত ঘ্যাঁ ঘুঁ, ঘেঁও ঘেঁও করে মুনিবকে একটা কিছু জানান দিতে হয়। রাতের ডিউটি পালন করতে।

– এতেই বুঝি তোমার মনিব খুশি?

– তা বলতে পারো।

– আমিও যখন শিকার ধরি ইঁদুর, ছুঁচো ধরে আছাড় মারি। তখন আওয়াজ পেয়ে রানীবিবি এসে আদর বুলিয়ে দ্যান আমার গায়ে। রানীবিবি বেশি ভালোবাসেন আমাকে।

–এমন তো হতেই পারে কোনো কোনো সময় আমি শিকার নাও পেতে পারি। ওটা তো আমার ভাগ্যের ব্যাপার। তাই বলে আমি কেন এমন মিথ্যে ব্যবহার করবো। মিছেমিছি শায়েবকে খুশি করতে।

– না ভাই। আমার একটু বাড়তি সুবিধে আছে। রানীবিবি আমাকে খুব আদর করেন আমি সারারাত জেগে, ঘুরঘুর করে কোনো শিকার পাই আর না পাই রানীবিবি কখখনো আমাকে একটুও গালমন্দ পাড়েননি। ঝক্কি ঝামেলা যতো ঐ রানীবিবিকে নিয়ে। তার মেজাজটা বড়ো চড়া খিটমিটে। – আমার শায়েব কি রকম সেটা আর কি বলবো। চড়ার ওপর চড়া। যাকে বলে মিলিটারি মেজাজ।

– তোমার শায়েব খাকি উর্দি পরে নাকি?

– বাইরে প্লেইন। ভেতরে ওরকমই। বেশ রাফ।

– খসখসে বুদ্ধির লোক নাকি? এ্যাবড়ো খেবড়ো? ক্ষ্যাপা?

– আমাকে কমেতে ছাড়ে না।

এই কতো চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ভুলি ও হুলি এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আগামীর দিকে। কতো স্বপ্ন নিয়ে। আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ভুলির ভাল্লাগেনা। হুলিরও ভাল্লাগেনা। ভুলি একদিন বলেই ফেললো,

হুলির ও ভাল্লাগেনা। ভুরি একদিন বলেই ফেললো।

– ওই যে আমাদের লোহার কলাপসিবল গেট। ওটা টপকে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।

– কোথায় যেতে চাও? আমাকে সঙ্গে নেবে তোমার?

ওই যে একটা জায়গা। ভারি শান্ত। খুব নির্জন। ওই পুরোনো ভাঙা দালান। পলেস্তরা খসা। ভাঙা ভাঙা ইট সুরকির স্তূপ। চারিদিকে লতাপাতর ঝোপ। ডালপালা ছড়িয়ে



www.pathagar.org

আছে ধুলোবালি। পোড়া মাটি। ওই বাড়িটার সামনে, ফটকের ডান পাশে একটা মূর্তি। মূর্তিটা কোনো নামজাদা মানুষেরই হবে। বাদশাহর না হলে কোনো উজির নাজিরের তো হবেই।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ হুলি! ওই মূর্তিটার দিকে তাকাও। দেখতে পাচ্ছো? ওই মূর্তিটা মাঝে মাঝে মধ্যরাতে চিৎকার করে। কাঁদে উঁচু গলায়। আমি শুনি প্রায় প্রায়ই।

– কি বললে? আমার তো তোমার কথা শুনেই ভীষণ ভয় করছে। তেড়ে আসবে না তো এদিকে?

– সে কি করে হয়? ওই বোবা মূর্তি।

প্রাণহীর-নিথর পাথর এদিকে কি করে আসবে?

– তুমিই তো বললে কাঁদে চিৎকার করে করে। একটা দৌড় ছুট করে হুট করে এখানে চলে আসলে কে ফেরাবে ওকে?

– না পাথর মূর্তি সেটা পারে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে শুধু। নীরবে, নিঃশব্দে। নির্বাক, নিস্পন্দ করুণ কাতর চোখে। এইটুকুই ব্যস। এর বেশি কিছু নয় আর। মূর্তিটাকে মূর্তিই মনে করবে। বোবা-মূক। কালো-বধির।

হয়তো অনেক অনেক দিন আগে। হাজার হাজার বছর আগে। এখানে এক রাজা বাস করতো। আমদের দুই রাজা রানীর মতো। কালের পীড়নে পিষ্ট হয়ে আজ এখানে এই বন্দিদশা। ওখান থেকে কেউ আর তাকে মুক্ত করে দিতে পারছে না। আজ অব্দি। আমি তুমি মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখছি মাত্র। কেউ এখানে হয়তো আসেও না। তার আত্মীয়স্বজন বুঝি কেউ নেই। বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। শুভাকাঙ্ক্ষী। মনে করার মতো কেউ নেই। এখন ওই পাষাণেই সে বন্দী হয়ে আছে। ওই রাজার এখন সোনার তোরণ নেই। সিংহ দারোজা নেই। একদিন সবই ধ্বংস হয়ে যায়। রাজপ্রাসাদ, বালাখানা যাই বলো না কেন– সব ধ্বংস হয়ে স্তব্ধ হয়ে হয়ে পড়ে থাকে কালোর গুহায়। শেষমেশ কারও কোনো চিহ্ন থাকে না।

– ওই পাথরের মূর্তিটার কথা বারবার আমার মনে পড়ছে। আমার রাজা। তোমার রানী। এরা দু'জনেই একদিন বন্দী হয়ে থাকবে। তাদের ফটকের সামনে। কিংবা ঘরের দেয়ালে। অথবা অন্য কাথাও।

– তাই হোক। তাই হোক। হুলি চিৎকার করে বলে উঠলো।

– ওই মূর্তিটা এখন ওখানে একা থাকে। একা ঘুমায়। একা জাগে। একা কাঁদে। কেউ আর তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না। এক দ-ও।

– ঠিক বলেছো ভুলি ভাইয়া। চলো না আমরা ওখানে গিয়ে কাটাই কয়েকটা দিন। এই সংসারে ঝুট-ঝঞ্ঝাট থেকে।

– সেটা মন্দ বলোনি। চলো একদিন যাওয়া যাক।

– ছুটি মিলবে তো তোমার?

– সেটা বলতে পারি না।



www.pathagar.org

– তাহলে বাড়ি থেকে বেরোবে কি করে?
– ছুটি মঞ্জুর না হলে প্রতিবাদ করবো। এ বাড়ি থাকবো না। বলে দেবো।
– বললেই কি মানবে?
– না পেলে বিদ্রোহ করবো। স্ট্রাইক করবো।
– সেটাও না মানলে, কি করবে তখন?
– ধর্মঘট। অনশন।
– কতোদিন অনশন চালাবে?
– আমৃত্যু।
– হুলি তুমি বেশ শক্ত, সাহসী।
– হ্যাঁ, শক্ত না হলে চলবে না আমাদের। ওরা আমাদের আপন কেউ নয়। আমরা যতোই চেষ্টা করি না কেন?
– তারা আমাদের যতো মারুক ধরুক আমরা তো বেঈমানি করতে পারি না।
– বেঈমানি করবো কেন? বিদ্রোহ করবো। ভাঙবো চুরবো।
– কি ভাঙবে চুরবে?
– গ্লাস, প্লেট, পিরিচ। কিচেনে গিয়ে হাঁড়ি পাতিল ফেলে ওলোট পালোট করে দেবো সব খাবার দাবার। ফ্রিজের পাল্লা খুলে রাখবো। বাথরুমের শাওয়ার খুলে দেবো। সব পানি ঝিরঝির করে ঝরে পড়বে। ওদের গোসলের পানি থাকবে না, খাবার পানিও বন্ধ করে দেবো। ইলেকট্রিক লাইন কেটে দেবো। অন্ধকারে ডুবিয়ে মারবো।
– তোমার আইডিয়াটা বেশ ভালো।
– ভুলি ভাইয়া! তুমি আমাকে ভালোবেসে এতো প্রশংসা করলে। আমার ভালো লাগছে খুব। তোমাকে ধন্যবাদ।
– তোমার দাবি সফল হোক।
খুব জোরে মান্টি, বান্টি, মিঠি, দিঠির ঘুম ভেঙ গেল। হুলি সারারাত ম্যাঁও ম্যাঁও করে মৃদু স্বরে মান্টির বিছানার পাশে গিয়ে কেঁদেছে। বান্টির কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছে। মিঠির আর দিঠির রুমে ঢুকে কেঁদে কেটে একাকার করে ফেলেছে সারাবাড়ি।
– মিঠি মনি আপু, ম্যাঁও ম্যাঁও দিঠি মনি আপু ম্যাঁও ম্যাঁও।
– কি হয়েছে রে। কাঁদছিস ক্যান? কেউ মেরেছে তোকে?
– না আপুমনি?
– তবে কেঁদে কেটে চোখ দুটো ভিজিয়ে ফেলেছিস যে। ফোলা ফোলা লাগছে কেমন? শরীরে জ্বর নাকি? মাথা ব্যথা? মন খারাপ?
– দিঠি বললো।
– হ্যাঁ আপুমনি মন খারাপ।
– ক্যানরে! বল না। আমি কি করতে পারি তোর জন্য, দেখি একবার। মিঠি বললো।
– মিঠি মনি আপু, তুমি সব করতে পারো। এ বাড়িতে তুমিই সবচেয়ে প্রিয় আমার।



www.pathagar.org

– হ্যাঁ, তা তো বুঝলাম। এখন কি করতে হবে তাই বল?
– তোমাকে খুব কিছু একটা করতে হবে না। শুধু ক'টা দিন ছুটি দেবে? আমাকে।
– ছুটি পেয়ে কি করবি বল? আমি আম্মুকে বলবো। রাজি করাবো তাকে। তোর ছুটি মঞ্জুর হবে, নিশ্চয়ই।
– করবে আপুমনি?
– হ্যাঁ, হ্যাঁ করবো।
– এখন বল? কি দরকার তোর ছুটির?
– আপুমনি, রাগ করবে না তো?
– রাগ করবো কেন?
– আমি কি তোর সঙ্গে কখনো রাগ করি?
– না, একটুও করো না। তাই তো বললাম তোমাকে। তুমি আমার খুব প্রিয় আপু। মান্টি, বান্টি ভাইয়ারা তো আমার ওপর চটেই থাকে। সব সময়।
– আমি এখনই আম্মুকে বলতে যাচ্ছি। তুই একটু ওয়েট কর।
– হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে আপুমনি।
পাশের কামরায় বসে রানীবিবি নিউজপেপার পড়ছিলেন। হাতে কফির পেয়ালা। পিরিজে ডায়বেটিক বিস্কিট। বিস্কিট চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করলেন;
– হ্যাঁ রে মিঠি মামনি, কিছু বলবি?
– জি, আম্মু। হুলি ক'দিন ছুটি চায়।
– ছুটি? কিসের ছুটি? ক্যান বাড়িতে ওর কাজ কম্ম নেই? কোথায় যাবে? কি করতে, হাওয়া খেতে?
– না, আম্মু। রাগ করো না। ওদের তো একটু আধুট ছুটি ছাড়া থাকা দরকার। মাইন্ডটা ফ্রেস হবে। আমাদেরকে কাজ কর্মে বেশি খাটতে পারবে তখন।
– ওসব কথা রাখো মিঠি। রানীবিবি দিঠির দিকে তাকিয়ে বললেন; শুনছিস দিঠি, আমাদের বাড়িটায় বেশ পাগলামো শুরু হয়েছে। বেড়ালের আবার ছুটি। হাওয়া খাওয়া। এক্কা গাড়ি চড়া।
– রাখো তো আম্মু ও সব ফালতু বায়না। দিঠি বললো মিঠির দিকে তাকিয়ে।
– আমি ওর হয়ে বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সেঁটে দেবো, হ্যাঁ! তখন বুঝবে ঠেলাটা কি! মিঠি বললো।
– তোর হুমকি-ধমকি দেখে মনে হচ্ছে তুই হুলিকে উসকে দিয়েছিস। রানীবিবি বললেন।
– আম্মু উসকে টুসকে দেয়ার কথা নয় এটা। এটা ওদের একটা সিম্পল ডিম্যান্ড। আমার আজকাল মানবাধিকারের জন্য ফাইট করছি। Human Rights. এসব কথা তুমিই তো আমাদের বলেছো। শিখিয়েছো। আব্বুকে নিয়ে রাজপথে নেমেছো। কতোদিন। কতোবার। আর আজ চমকে যাচ্ছো হুলির অধিকারে কথা ভেবে। পশুপাখি,



www.pathagar.org

জীব-জন্তুদেরও রাইট আছে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার। ভালভাবে, সুন্দরভাবে।
ও বুঝেছি। মানুষের কথা বাদ দিয়ে, তুমি পশুর কথা নিয়ে ভাবছো। বাহ! বাহ! বেশ তাজ্জব ব্যাপার দেখছি। রানীবিবি একটু রাগের স্বরেই বললেন। দিঠি এগিয়ে এসে মিঠির দিকে একটু বাঁকা ঠোঁটে বলেই বসলো।
– তোর আশকারা পেয়েই হুলি এদ্দুর এসছে।
– তোমারা যে যাই বলো আমি হুলির পক্ষেই থাকবো। ওর জন্য বলবো। ফাইট করবো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবো।
হুলির অধিকার দিতে হবে। হুলির দাবি মানতে হবে। তোমরা ওর দাবি মানো আর নাই মানো।
– হুঁ। তুমি গিয়ে চেঁচিয়ে দেয়ালে মাথা ফাটাও। কিচ্ছুতে কিচ্ছুতে মনি কাজ হবে না। আমি আজ থেকে দেয়ালে পোস্টার সেঁটে দিচ্ছি। পোস্টারে কাজ না হলে অন্য পথ ধরবো।
– কি পথ ধরবে, বলো? রানীবিবি বললেন।
– স্ট্রাইক। চূড়ান্ত ধর্মঘট। হাঙ্গার স্ট্রাইক। আমরণ অনশন বলতে পারো।
– বেশ তো। তাই করোগে। মরো গিয়ে হুলির সঙ্গে গলায় ঘুন্টি বেঁধে।
এদিকে মান্টি বান্টি ঘরে প্রবেশ করল। প্রবেশ করা মাত্র মিঠি মাথা নিচু করলো। হুলি এসে মিঠির পাশে দাঁড়ালো। মান্টি চেঁচিয়ে বলে উঠলো :
– বাড়িতে বেড়াল নিয়ে এসব কি হচ্ছে? সব স্টপ করো।
– মিঠি দৌড়ে গিয়ে মান্টিকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো।
– ভাইয়া, আমাদেরকে সেভ করো। আমাদেরকে বাঁচাও। পথের আলো দেখাও।
– কি হচ্ছে তোর মিঠি? বলতো আমাকে। কি অসুবিধে তোর?
– ঐ যে আমাদের হুলি। ওকে বাঁচাতে হবে।
– ও তো বেঁচেই আছে। ও আবার মরলো কবে?
– ওরকম বাঁচা-মরা নয়।
– কি রকমভাবে বাঁচা-মরা?
– ভালোভাবে বাঁচা-মরা, ভাইয়া। ভালোভাবে বেঁচে থাকা।
– খারাপ ভাবটা তুই পেলি কোথায়?
– আমি হুলির বিনোদনের কথা বলছিলাম। রিক্রিয়েশনের কথা আর কি?
– কি মুশকিল! এ সমাজে, এদেশের মানুষের কোনো রিক্রিয়েশন নেই। পশুর রিক্রিয়েশন দিয়ে কি হবে? পশু তো পশুই থাকবে।

নভেম্বর ১৯৯৯



www.pathagar.org

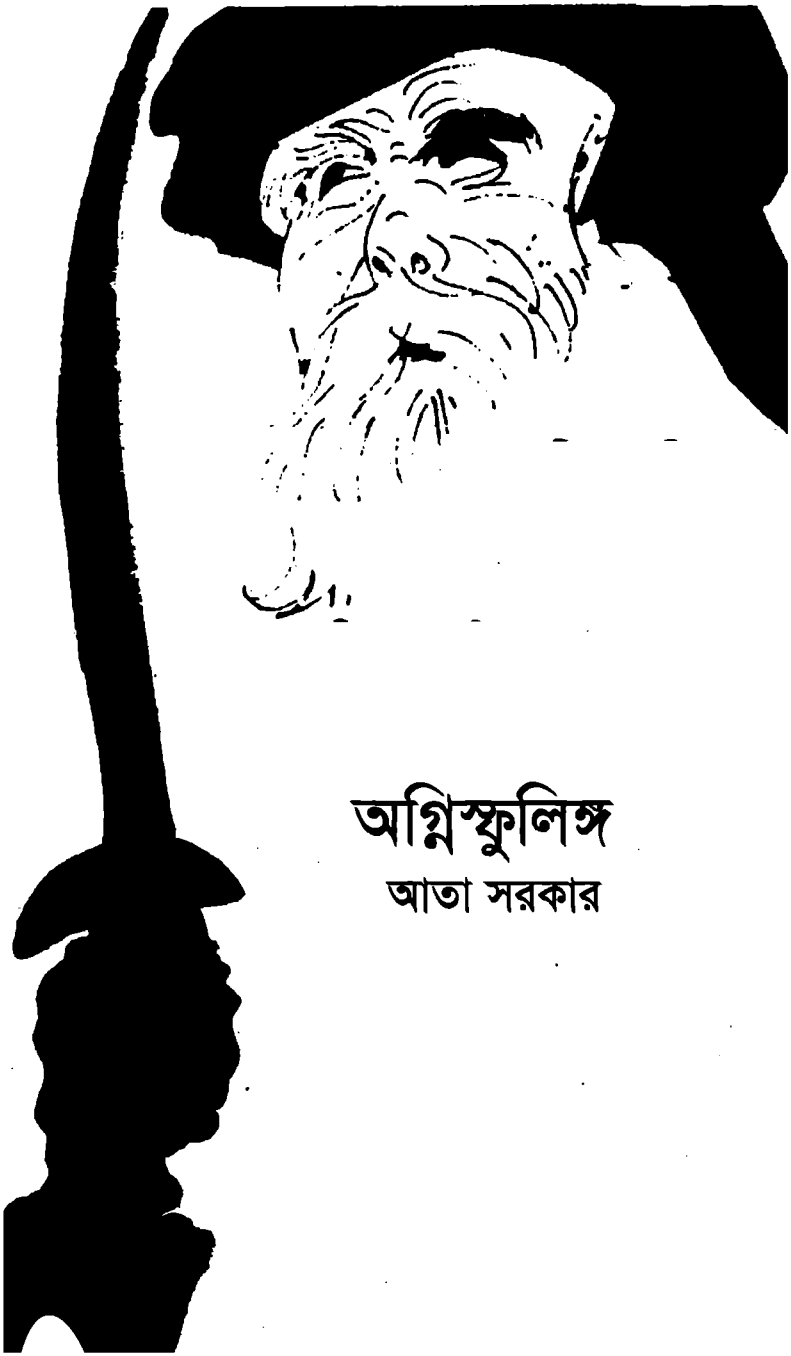

# অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

আতা সরকার

www.pathagar.org

## হয় শহীদ নয় গাজী

মুহররম। ১৭৮২।

উপনিবেশ ভারতবর্ষের চারিদিকে আগুন জ্বলছে। বিদ্রোহের আগুন। ভারতবর্ষের মাটিতে ব্রিটিশ বেনিয়াদের শাসন মানবে না। দিকে দিকে গণবিদ্রোহ।

সিলেট। গত বছর প্রবল বন্যার তোড়ে ক্ষেত-ফসল সব ভেসে গেছে। অভাবী মানুষের পেটে ক্ষুধা। মনে আগুন। হৃদয়ে বিপ্লব।

সিলেটের ইংরেজ কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসে। পাঁচ পাউন্ডের রাইটারের চাকরি নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। দারুচিনি গরম মশলার দেশ ভারত। সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জনপদ বাংলা। বিদেশীদের জন্য ভাগ্য ফেরানোর সহজ উপায় রয়েছে এই দেশে। রবার্ট লিন্ডসে লর্ড ক্লাইভের মতই ধনবান হয়ে বিলেত ফিরতে এসেছেন এই দেশে। প্রথমে কলকাতা। সেখান থেকে ঢাকা। তারপর তয়-তদবির করে হয়েছেন সিলেটের কালেক্টর। সিনিয়র অনেককে ডিঙিয়ে। লিন্ডসে তার আরাম ঘরে বসে ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাব করছিলেন। কড়ির ব্যবসা। চুনাপাথরের ব্যবসা। হাতি আর হাতির দাঁতের ব্যবসা। কাঠের ব্যবসা। জাহাজের কারবার। আরাম হারাম হয়ে গেল। খবর এল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। মুহরমের মাতম নিয়ে জেগে উঠেছে ক্ষুধার্ত মানুষ। শহরের চারদিকে আগুন। ইংরেজ শাসন মানতে চায় না জনগণ।

লিন্ডসে ভাবলেন, ভাগ্য বুঝি ভেঙে যায়। মুহররম মাস। তেজী মুসলমানদের জেগে ওঠার সময়।

লিন্ডসে উঠে দাঁড়ালে। কড়াভাবে দমন করতে হবে এ বিদ্রোহ। ছলে-বলে-কৌশলে। পিস্তলে কার্তুজ ভরলেন। তিনি মোকাবেলা করবেন বিদ্রোহের। কিন্তু ভাবটা থাকবে তিনি নিরস্ত্র। পিস্তলটা দিলেন তার ভৃত্যকে। বললেন, যখনই চাইবেন তখনই যেন ভৃত্য তাকে পিস্তল এগিয়ে দেয়। নিজের কাছে রাখলেন একটা তলোয়ার। তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

হাদা মিয়া। সাধা মিয়া। পীরজাদা দুই ভাই। তাদের সাথে শ'তিনেক মুজাহিদ। ঈদগাহের কাছেই পাহাড় উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছেন। বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত। লিন্ডসে তার দলবল নিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাদের মুখোমুখি।

লিন্ডসে তার তলোয়ার উঁচিয়ে বললেন, শহরে তোমরা দাঙ্গা শুরু করেছ কেন?

পীরজাদার একজন বললেন, সাহেব, দাঙ্গা তো আমরা শুরু করিনি, শুরু করেছ তোমরা পলাশীর প্রান্তর থেকে।

চতুর লিন্ডসে ঘটনার অপব্যাখ্যা করলেন। বললেন, মুহররম মাসে তোমরা ধর্মকর্ম করছ ভাল কথা। কিন্তু হিন্দুদের সাথে দাঙ্গা করছ কেন? মন্দির ধ্বংস করছ কেন?

পীরজাদাদের একজন জবাব দিলেন, ভুল বললেন সাহেব, আমরা হিন্দুদের সথে দাঙ্গা করছি না। তাদের মন্দিরও ধ্বংস করছি না। এদেশ আমাদের। তোমাদের নয়। আমরা তোমাদের উৎখাত করব।



www.pathagar.org

লিন্ডসে ওদের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে কঠোর কণ্ঠে বললেন, এই এলাকার হেড ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমি তোমাদের এখানে এসেছি। আমি শুনেছি খানিক আগে দাঙ্গা হয়েছে। আগামী দিন আমি এর তদন্ত করব। এখন আমার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করে শান্তভাবে ফিরে যাও।

শত শত মুজাহিদ গর্জে উঠল: না!

পীরজাদাদের একজন তার কোষ থেকে তলোয়ার বের করে উঁচিয়ে ধরলেন। বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এখনই সময় হত্যার নয় মৃত্যুর। হয় শহীদ, নয় গাজী। খতম হয়ে এলো ইংরেজরাজ।

তিনি তার তলোয়ার নামিয়ে আনলেন লিন্ডসের ওপর। কিন্তু ফসকে গেল আঘাত। পড়ল লিন্ডসে তলোয়ারের ওপর। লিন্ডসের তলোয়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হাতলটি রয়ে গেল তার হাতে। ভৃত্য দ্রুত এগিয়ে দিল পিস্তল। লিন্ডসে কাল বিলম্ব না করে গুলি করলেন। পীরজাদা পড়ে গেলেন। তার কাপড়ে পিস্তলের গুলির আগুন। পীরজাদার চোখ তখনো খোলা। জ্বলছে।

ইংরেজ সেনাদল হামলা করল মুজাহিদদের ওপর। বেয়নেট চার্জ করে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল বিপ্লবীদের। কিন্তু আর্তনাদ নয়, মুজাহিদদের কণ্ঠে তখনো বিপ্লবী উচ্চারণ খতম হোক ইংরেজ রাজ!

### *যে আগুন ছড়িয়ে যায়*

রণক্লান্ত লিন্ডসে তার আরামঘরে। তখন রাত নেমেছে। এ সময় কয়েকজন ইউরোপীয় দৌড়ে এল তার বাসায়। তারা আশ্রয় চায়। জানাল, বাইরে লোক জমায়েত হচ্ছে। তারা লিন্ডসের বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। একটা একটা করে খুন করবে। ইউরোপীয়দের।

লিন্ডসে জানালার পর্দা সরালেন। দেখলেন তার বাসভবন ঘেঁষে একদল লোক এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের হাতে মশাল।

লিন্ডসে সেনাবাহিনী পাঠালেন। ওদের বাধা দিতে। সেনাবাহিনী এসে থামাল মিছিলটিকে। জিজ্ঞেস করল, মশাল শোভাযাত্রা কেন?

ওরা জানাল, শহীদের দাফন করতে ওরা নিয়ে যাচ্ছে গোরস্তানে।

ওদেরকে জানানো হলো, বিদ্রোহীদের এমন সম্মান দেখিয়ে দাফন করা যাবে না।

থমকে দাঁড়াল শোক মিছিল। একজন তরুণ চিৎকার করে উঠল : আগুন! আগুন! আগুন! মনে হচ্ছে সব জ্বালিয়ে দেই।

একজন প্রবীণ তরুণের কাঁধে হাত রাখলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন : এখন নয় এই আগুন জ্বালিয়ে রাখ নিজের হৃদয়ের নিভৃতে। সময় হলে ছড়িয়ে দিও সব দিকে।

পরদিন লিন্ডসের অনুমতি নিয়ে নীরবে শহীদদের দাফন করা হলো। শহীদদের অনুভূতি নিয়ে নিভৃতে আগুন জ্বলে উঠল সব ক'টি তাজা প্রাণে।



www.pathagar.org

*আল্লাহর দূত*

সিলেটে বেড়াতে এসেছেন রবার্ট হ্যামিলটন। লিন্ডসের বন্ধু। নৈশভোজে বসেছেন তারা। লিন্ডসে বসে আছেন দরজার দিকে মুখ করে। হ্যামিলটন বসেছিলেন টেবিলের উল্টোদিকে, দরজার দিকে ফিরে।

এ সময় ভৃত্য এসে খবর দিল, একজন ফকির লিন্ডসের সাথে দেখা করতে চান।

লিন্ডসে তাকে ভেতরে আনতে বললেন। ফকির ঘরে ঢুকলেন। হ্যামিলটনের পেছনে দাঁড়ালেন। বললেন, সিলেটে ঢোকার পর আমার সব কিছু লুট হয়ে গেছে। এর প্রতিকারের আশায় আমি আপনার কাছে এসেছি।

ফকির বড় বড় করে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন। তার ভেতরে অস্থিরতা। চোখ দুটো জ্বলছে বিজাতীয় বিদ্বেষে। তার ডান হাত ছিল কোমরবন্ধের ওপর। যে কোনো ঘটনা ঘটিয়ে দেয়ার জন্য যেন তিনি প্রস্তুত।

লিন্ডসে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন ফকিরের দিকে। ফকিরের কিন্তু একটা মতলব যেন রয়েছে এ ধরনের ধারণা তার মনে খেলে গেল। কিন্তু তার চেহারা বা মুখভঙ্গি থেকে তা বোঝা গেল না। তিনি যেন ফকিরের সাথে কথা বলছেন, এমন ভাব নিয়ে বললেন, হ্যামিলটন, ধাক্কা দিয়ে ব্যাটাকে ফেলে দাও। হ্যামিলটন হকচকিয়ে গেলেন। তাকে উদ্দেশ করে লিন্ডসে কি বলছেন তা যেন তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। ইতস্তত করছেন।

লিন্ডসে ধমকের সুরে আবার বললেন : যা বলছি তাই কর।

হ্যামিলটন ত্বরিত ওঠে দাঁড়ালেন। ফকিরকে লক্ষ্য করে ঘুষি চালালেন। ফকির মাটিতে পড়ে যাচ্ছেন। পড়তে পড়তে তিনি কোমরবন্ধ থেকে বের করে নিলেন লুকানো ছোরা। হ্যামিলটনকে লক্ষ্য করে হাত চালালেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। হাহাকার করে উঠল তার হৃদয়। ব্যর্থতার হাহাকার। নিজের বুকেই চালালেন ছোরা। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। জ্ঞান হারালেন ফকির।

জ্ঞান ফিরলে লিন্ডসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন করলে কেন? ফকির স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন লিন্ডসের দিকে। ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন : আমি আল্লাহর দূত। আমি এসেছি কাফের জুলুমবাজ ইংরেজ বেনিয়াদের খতম করতে।

লিন্ডসের ওপরই স্থির হয়ে গেল ফকিরের দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে বিদেশী শাসকদের প্রতি আমৃত্যু ঘৃণা।

*বিশ বছরের ঘৃণা*

১৭৮২ মুহররমের দিন থেকে বিশ বছর পর।

পাঁচ পাউন্ডের রাইটার রবার্ট লিন্ডসে এখন ধনকুবের। বিশাল ধনসম্পদের মালিক। বিলেতের অভিজাত পাড়ায় তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন। লিন্ডসে একদিন রুটিন

www.pathagar.org

মাফিক ঘোড়ায় চেপে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। এ সময় তার পথের ওপর এক যুবককে দেখতে পেলেন। পোশাক-আশাক আচরণে প্রাচ্যদেশীয় মনে হয়। পাড়ার পাদরি মিস্টার স্মলের বাসভবনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন যুবক।
যুবককে দেখে বিস্মিত হলেন লিন্ডসে। হিন্দুস্থানি ভাষায় তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন :
তুমি জন্মেছ কোথায়?
যুবক ইতস্তত করে জবাব দিলেন: কলকাতায়।
লিন্ডসে ধমক দিয়ে বললেন, মিথ্যে বলছ। তোমার বলার ঢঙ উচ্চারণ তা বলে না। তোমার জন্ম নিশ্চয়ই অন্য কোথাও।
যুবক বললেন : আপনি ঠিকই বলেছেন। বিদেশে আমাকে কেউ এমনভাবে জেরা করবে, আমি ধারণা করিনি। সাহেব, আপনি কে? কোথায় আপনি থাকেন?
লিন্ডসে তার নাম জানালেন। পাহাড়ের ওপর নিজের বাড়ি দেখালেন। সেখানে পরদিন সকালে তার সাথে দেখা করতে বললেন যুবককে। পরদিন সকাল বেলা। লিন্ডসের বাসভবনে সময়মতো উপস্থিত হলেন যুবক।
লিন্ডসে তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।
লিন্ডসে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার নাম কি?
যুবক বললেন, সৈয়দউল্লাহ।
: প্রথম সাক্ষাতে তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছিলে কেন?
: আমাদের ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছিলেন। সত্যি কথা হলো, আমার জন্ম বাংলাদেশের সিলেটে। এখানে এসেছি মিস্টার স্মলের ছেলের ভৃত্য হয়ে। আপনার নামের একজন আমাদের দেশে খুব বিখ্যাত হয়ে আছেন। লন্ডনে আমি তাকে অনেক খুঁজেছি। কিন্তু এখনো তাঁর কোনো খোঁজ পাইনি।

লিন্ডসে বললেন, মনে কর আমিই সেই।
চমকে উঠলেন সৈয়দউল্লাহ। প্রচ- ঘৃণা নিয়ে তাকালেন লিন্ডসের দিকে। বললেন : ঠিক? আপনিই খুন করেছেন পীরজাদাকে?
লিন্ডসে জবাব দিলেন : হ্যাঁ। কারণ তিনি তলোয়ার হাতে আক্রমণ করেছিলেন আমাকে। তার কৃতকর্মের ফল তিনি ভোগ করেছেন।
লিন্ডসে জিজ্ঞেস করলেন: সংঘর্ষের সময় তুমি কোথায় ছিলেন, সৈয়দউল্লাহ?
সৈয়দউল্লাহ বললেন : আমি তখন বালক, জেহাদের সময় আমি ছিলাম পাহাড়ের ওপর ঘরবাড়ির কাছে।
সৈয়দউল্লাহর কণ্ঠস্বর রূঢ় হয়ে উঠল: আপনি আমার পিতাকেও হত্যা করেছেন।
লিন্ডসে জিজ্ঞেস করলেন : তিনি কি একজন বৃদ্ধ?
: হ্যাঁ।



www.pathagar.org

: তোমার পিতা মারা গেছেন যুদ্ধে। আমার পায়ের কাছে জখম হয়ে পড়েছিলেন তিনি। একজন সিপাহি বেয়নেট দিয়ে তাকে গেঁথে ফেলেছিল প্রায়, সে মুহূর্তে পা দিয়ে আমি তাকে সরিয়ে দিই। আমিই তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। ঠিক কি না?

সৈয়দউল্লাহর চোখ দুটো আর্দ্র হয়ে এল। তিনি স্বগোক্তির মত বললেন : ঠিক। তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। এর ফলেই মাস কয়েক পর তিনি মারা যান।

সৈয়দউল্লাহ কিছুক্ষণ লিন্ডসের পরিবারের সাথে সময় কাটান। কথায় কথায় তিনি জানান, তিনি রান্নাবান্নার জন্য খ্যাত। তাকে পরদিন এসে মুরগি রেঁধে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

পরদিন সকাল। নাশতার টেবিল। গভর্নেস ইতস্তত করে বলল : একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার আছে। আমি জানি, স্বপ্ন বিশ্বাস করতে নেই। কিন্তু– বাক্য শেষ করতে পারল না লিন্ডসে। কান্না এসে গেল তার কণ্ঠস্বরে। ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল : আমি গত রাতে এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছি। এ স্বপ্ন না বলে থাকা যায় না। স্বপ্নে দেখি, পূর্ব থেকে এক কালো লোক এসে মিস্টার লিন্ডসে আর তার পরিবারকে বিষ খাইয়েছে। আমার করজোড় নিবেদন, আজ যা রান্না হবে তা যেন টেবিলে দেয়া না হয়।

সৈয়দউল্লাহ নির্ধারিত সময়ে এসে রান্না শুরু করলেন।

নৈশভোজের আগে বৃদ্ধা হাউসকিপার পাশের রুমে মিসেস লিন্ডসেকে ডেকে নিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল: ম্যাডাম, এই সামান্য বিষয় আপনাকে জানানো ঠিক কি না জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় ঘটনাটি আপনাকে জানানো দরকার। সে যখন রান্না করছে তখন আমি দেখেছি। রান্নার সময় সে একবারও তরকারিটা চেখে দেখেনি। আমি বললাম, লবণ বোধ হয় ঠিক হয়নি। সে বলল না, না সব ঠিক আছে। ম্যাডাম, সাহেবকে বলুন তিনি যেন এ তরকারি না খান।

লিন্ডসের পরিবারের সবাই লিন্ডসেকে এই অনুরোধ জানাল। লিন্ডসে কান দিলেন না। সৈয়দউল্লাহর রান্না খেললেন। তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বললেন : এত চমৎকার রান্না আগে দেখিনি। এত চমৎকার নৈশভোজও এর আগে আর কখনো করিনি।

রান্না নিয়ে সন্দেহের কথা হলে সৈয়দউল্লাহ বললেন, মুরগিটা মেরেছিল আপনার রাঁধুনে। যদি সে হালাল মতো জবাই করত, তাহলে রান্না চেখে দেখার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি থাকত না। সৈয়দউল্লাহ গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন : একজন খাঁটি মুসলমান খাবারে বিষ মিশিয়ে শত্রুকে মারে না। সে লড়াই করে মুখোমুখি। যে বিষ আমার হৃদয়ে আমি বহন করছি বিশটি বছর ধরে, তা নিয়ে আমি দাঁড়াব সামনাসামনি

সৈয়দউল্লাহর দুই চোখে ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠল।

আগস্ট ১৯৯৯



www.pathagar.org

# তানিয়ার জন্য যত কথা

চেমন আরা

www.pathagar.org

তানিয়া আমার নাতনী। বয়স মাত্র দুই পার হয়ে তিনে পা রেখেছে। প্রথম বছর খানিক সবার কোলে কোলে, সবার চোখে চোখে সে বড় হয়েছে। কিন্তু যখন একটু হাঁটতে শিখলো তখন থেকে আর বেশি কোলে ওঠে না বললেই চলে।

কেউ আদর করে কোলে নিতে চাইলে সে পিছলে নেমে যায়। ছোট ছোট পা ফেলে এঘর ওঘর ছোটাছুটি করে। মাঝে মাঝে দরজার আড়ালে খাটের তলায় লুকিয়ে থাকে। কেউ দেখে ফেললে হাততালি দিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। স্বাস্থ্য ভাল, রঙ ফর্সা। মিষ্টি চেহারার তানিয়াকে বাড়ির সবাই ভালবাসে। আমাদের অবসর জীবনের ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলোতে তানিয়া আনন্দের উৎস। সে প্রতিদিন একটু একটু বড় হচ্ছে, সঙ্গে নতুন কিছু কথা, নতুন ভাবভঙ্গি আয়ত্ত করছে। পৃথিবীর পাঠশালা থেকে নিত্যনতুন পাঠ গ্রহণ আমাদের আনন্দ দেয়, আমরা তার নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে প্রতিদিন পরিচিত হই। দাদা-দাদু, ফুফু, চাচা, এই শব্দগুলি সে স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে এখন। যদিও ফুফু শব্দটি উচ্চারণ করতে সে বেশ সময় নিয়েছে।

ছোট চাচুর খুব আদরের তানিয়া। তার সব রকমের দুষ্টুমি, আদর সব ছোট চাচার সঙ্গে। চাচু অফিস থেকে ফিরে যখন বিশ্রামের জন্য একটু বিছানায় গা এলিয়ে দেয়– তখন তানিয়া এসে হাজির হয়ে চাচার কাছে খাটে উঠে আস্তে আস্তে চুলে বিলি দিতে থাকে। বুকের ওপর বসে গেঞ্জি সরিয়ে কালো কালো লোম নিয়ে খেলা করে। চাচু যদি গম্ভীর হয়ে একটু বকা দেয়– সে ফ্যাল ফ্যাল করে চাচুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে কোলে উঠতে চায় না। এটা জেনেও তার চাচু মাঝে মাঝে তাকে কোলে নেয়ার ভান করে দু'হাত বাড়িয়ে দেয়– বলে আও মেরা বেটি আও, মেরা কোল মে আও। চাচার এই ভঙ্গিতে সে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। চাচুর নাগালের বাইরে গিয়ে মুচকি হেসে বলে – তুমি আমাকে কোলে নিতে পারবে না। আমার ওজন বেড়ে গেছে! আমি বড় হইছি?

কয়েকদিন ধরে মশার উপদ্রব বেড়ে গেছে। তানিয়ার সারা শরীর মশার কামড়ে লাল হয়ে ফোস্কার দাগ পড়ে গেছে। চুলকানিতেও কষ্ট পাচ্ছে। তার মধ্যেও তার প্রাণচাঞ্চল্যের কমতি নেই। মার কাছে কান্নাকাটি করলেও দাদা, দাদু, ফুফু চাচাকে দেখলে সে তার কান্নাকাটি ভুলে যায়। প্রাণময় হাসি দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে রাখে। ইদানীং তানিয়া একটা নতুন খেলায় মেতেছে। আমি নামাজে বসলে আমার পাশে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। ওড়না মাথায় দেয়ার জন্য আশেপাশে যারা থাকে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ওড়না পেলে মাথায় দিয়ে আমার মতো সেজদায় যায়। সেজদায় গেলে আমি যদি বলি, দাদু! আল্লাহ, আল্লাহ বলো।

সে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আল্লাহ বলে। আমার হাতে তসবি দেখলে ওটাও টেনে নেয়, সেই সঙ্গে বলতে থাকে আল্লাহ আল্লাহ। তাকে নিয়ে আমাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছে এক নতুন উন্মাদনায়।



www.pathagar.org

তানিয়ার দাদার অসুখ। বমি ও মাথা ঘুরছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমরা সব তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, সঙ্গে তানিয়াও। খুব উৎকণ্ঠিত সে। বারবার দাদাকে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে তোমার? তার দাদার মাথায় তেল দিয়ে দিচ্ছে কাজের ছেলে আরিফ। তানিয়া বলে, আমাকে দাও। আমি দাদার মাথায় তেল মালিশ করবো। শুধু বলা নয়, সত্যি সত্যি হাত দিয়ে বাটি থেকে তেল নিয়ে তার দাদার মাথায় হাতে-পায়ে মালিশ করতে থাকে। আর কতক্ষণ পর জিজ্ঞেস করে দাদা, তোমার কি হইছে? অসুখ? তুমি বমি করছো। তার কথা শুনে আশপাশের সবাই হাসে।

পড়ার টেবিলে কাউকে বসতে দেখলে বলে, কি করছো? বই পড়ছো? আমিও পড়বো। আমাকে কলম দাও। তার ফুফিদের আঁকাজোকার অভ্যাস আছে। সে ঐ ঘরে ঢুকে রঙ ও তুলি নিয়ে ইচ্ছে মতো রঙের খেলা করে। সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে ওর দাদা দুবাই গিয়েছিলেন। আসার সময় তানিয়ার জন্য একটা সোনার চেইন নিয়ে এসেছেন। আগামী জন্মদিন আসতে আরো মাস পাঁচেক দেরি দেখে আমি চেইনটা ওর মার হাতে দিয়ে দিলাম। চেইনটা গলায় পরে তার কি খুশি! সুন্দর একটা ফ্রক পরে ছোট ছোট পা ফেলে সে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সবাইকে এক বিশেষ ভঙ্গিতে চেইনটা দেখাচ্ছে। তানিয়া সব কথা গুছিয়ে এখনো বলতে না পারলেও তার দাদা যে তার জন্য চেইন এনেছে এই কথাটি সে খুব গুছিয়ে সবাইকে জানান দিয়ে বেড়াচ্ছে। এক বিশেষ ভঙ্গিতে মুখটা নিচু করে চেইনের ঝুলানো অংশটি ডান হাত দিয়ে ধরে সে প্রথমে তার ছোট চাচুকে দেখাতে যায়। বলে, চাচু- দাদা এনেছে। এটা আমার। চাচু বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। আমি তার পাশে বসা। তানিয়ার কথা শুনে আমি বলি কে বলেছে এটা তোমার? এইটাতো আমার জন্য এনেছে। দাও আমার চেইনটা আমাকে। আমার কথা শুনে সে খুব গম্ভীর হয়ে ওঠে। চোখের কোণে পানি টলমল করে। কিছুক্ষণ চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে– না, আম্মু বলেছে দাদা আমার জন্য এনেছে। এটা আমার। বলে বটে কিন্তু মুখের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া। যদি আমি সত্যি সত্যি তার কাছ থেকে চেইনটা নিয়ে নিই!

আমি তার মুখের অসহায়তা আঁচ করতে পেরে বলি, না না দাদু এটা তোমারই। আমি তোমার সঙ্গে রসিকতা করছি। আমার কথা শুনে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বলে দাদু, তুমি মিথ্যা কথা বল? আমার আব্বু বলেছে মিথ্যা কথা বললে আল্লাহ রাগ করে। তোমার আব্বু তোমাকে এ কথা বলেনি?

আমি হেসে বলি, না দাদু আমি জানতাম না। এবার থেকে আর মিথ্যা বলবো না। কেমন? সে আমার কথা শুনে পরম খুশি হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে তার মার ঘরের দিকে চলে যায়।

দুই বছর পর ৯ মাসের দিন তানিয়ার মা-বাবা আমাদের কিছু না বলে অনেকটা চুপি



www.pathagar.org

চুপি  তানিয়াকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলো। জীবনে প্রথম ছোট নাতনী আমার ঘরের বাইরে পা বাড়াচ্ছে। ঘরে কোনো সাড়া শব্দ নেই। কোনো প্রস্তুতিও নেই। তানিয়া খুব গম্ভীর মুখে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, দাদু! স্কুলে যাচ্ছি। ওখানে অনেক বেবি আছে। ওদের সঙ্গে খেলবো।

তিন বছরও হয়নি। এমন শিশুকে ওরা স্কুলে দিচ্ছে ভাবতেও কষ্ট লাগছে আমার। এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একটুও আলাপ করেনি। এখন কিছু বললেও কাজ হবে না। সুতরাং চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। আমি যখন এই সব ভাবছি, তানিয়া আমার হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে- কি, দাদু! তুমি কিছু বলো না যে। বলো আল্লাহ হাফেজ! আমি ওর কথায় শঙ্কিত হই, হেসে বলি আল্লাহ হাফেজ। সে একটা সুন্দর গোলাপি রঙের বেল্টসহ প্লাস্টিকের ছোট বাক্স নিয়ে ওর মা-বাবার সঙ্গে গাড়িতে উঠে যায়। তাকে আল্লাহ হাফেজ বলে বিদায় দিলেও আমি খুশি হতে পারি না। এই মাসুম বাচ্চাটির  আজ থেকে পৃথিবীর  পথে যাত্রা শুরু হয়ে গেল। পৃথিবীর পথে নতুন অভিযাত্রী। ...

তারপর?

অক্টোবর, ২০০০



www.pathagar.org

# অভিমানী বন্ধু আমার

জুবাইদা গুলশান আরা

www.pathagar.org

ছোটদের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী গড়বো বলে আমরা সবাই খুব আশা করি। আর সেই জন্যই তোমাদের সঙ্গে, মানে ছোটোদের সঙ্গে যখন গল্প করতে বসি, কত যে গল্প কত যে কাহিনী মনে পড়ে যায়, সে আর কী বলবো। মজার কথা হল, সারা পৃথিবী ঘুরে দেখেছি, ছোটোদের ভাবনাগুলো, খেলাগুলো, দুঃখকষ্ট আর মায়া মমতাগুলো সবই এক রকম।

আচ্ছা বলোতো, আদর, মায়া, মামতা, এই জিনিসগুলো কেমন? মনের মধ্যে আলোর মতো, রূপকথার ঝিলিমিলি ঝালর যেমন, ঠিক তেমন। এ কথা কেন বলছি জানো? আজকের এই অঘ্রাণের দাওয়াত বয়ে আনা সকালে হঠাৎ হঠাৎ বাদল মেঘের হাওয়ার মতো স্মৃতির চাদর এসে জড়িয়ে ধরছে আমাকে। চোখটা কেমন ভিজে ওঠে। মনটা ছটফট করে। ইচ্ছে করে স্মৃতিগুলো ফিরিয়ে আনি। মন চলে যায় সেই দূর বিদেশে। সেই যে দেশটা, সে হল ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন। সেখানে আমাকে যেতে হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। মস্ত বড় একটা হাসপাতাল। ছিমছাম, নিঃশব্দ। নিচে বিশাল বাগান ঘেঁষে কাফেটারিয়া। আমার ঘরটাও মস্ত বড়। ক্লোসেটে জিনিসপত্র, টেবিলে ফুল, জানালা ঘেঁষে চেয়ার। চিকিৎসার পরে যখন ডাক্তার আমাকে কিছুটা চলাফেরা করার অনুমতি দিলেন তখন আমি মনের সুখে ওপর-নিচ চলাচল করতে শুরু করলাম। তখনও আমাকে পুরোপুরি ঘুরাঘুরি করার অনুমতি দেননি তো, তাই অসময়ে বাইরে দেখলেই বলতেন, এই মেয়ে, তুমি আবার বেরিয়েছো?

হাসপাতালে থাকতে থাকতে ওখানকার নার্সদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। একদিন এক সিস্টার আমাকে বললো- চলো, তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই। আমার ঘরটা পেরিয়ে একটু দূরে আর একটা কেবিন। সেখানে এক তরুণ বসে আছে। তার আশেপাশে টেবিলে, নানা রকম এ্যারোপ্লেনের মডেল। ছোটো বড় নানা রকম এ্যারোপ্লেন। এত সুন্দর যে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু ছেলেটির গলায় মস্ত এক ব্যান্ডেজ বাঁধা। তার কথা বলার যন্ত্রটি নাকি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে ইশারায় কথা বললাম, কাগজে লিখলাম, শুভেচ্ছা জানালাম। তারপর বিদায় নিলাম। সিস্টারকে জিজ্ঞেস করলাম, ওকি আর কখনও কথা বলতে পারবে না?

মনে হয় না। অথচ কলেজে অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট করেছে। এভাবেই একদিন ফিরে যেতে হবে ওকে। জীবন কি কঠিন, তাই না?

মনটা ভারী হয়ে যায়। আমরা কত অসহায়, ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে আসি। আমার ঘরের পাশেই নার্সদের ছোট্ট ঘর। ঘন্টি বাজালেই দৌড়ে আসে। ওদের ব্যবহার খুব সুন্দর। মানুষের কষ্ট দেখলে সব সময় সেবা দিয়ে, মমতা দিয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করে।

আমার কেবিনের পাশের কেবিনে একদিন এলো একটা ছোট্টো ছেলে। খুব জ্বর তার। এ জ্বরটা খুব খারাপ। ডাক্তার তাকে খুব যত্নে রাখতে বলেছেন। ওদেশে হাসপাতালের এত সুনাম যে অসুখ হলেই সবাই হাসপাতালে চলে আসে। কিন্তু পাঁচ বছরের ছেলেটি কিছুতেই তার মাকে ছাড়বে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আর কেবল তার মাকে চায়। ও দেশে গুরুতর কিছু না ঘটলে, আত্মীয় স্বজনের থাকার নিয়ম নেই। ছেলেটিকে প্রাথমিক পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্যই ওখানে আনা হয়েছে। তাই তার মা-বাবা আসেন নিয়ম বেঁধে বিকেল বেলা। তার কাছে সব সময় একজন নার্স থাকে। সিস্টারের কাছে অনুমতি নিয়ে একদিন দুপুরে আমি তাকে দেখতে গেলাম। তাকে মজার মজার ছবি এঁকে দিলাম। খাবে না বলে খুব ঝামেলা করছিলো ছেলেটি। শেষে ছবি আঁকা আর গল্প বলার ফাঁকে খেয়ে নিলো। শেষে ক'দিন পরে এমন হল যে, আমি না গেলে সে খায় না ঘুমায় না। রোজ সন্ধ্যা বেলা আমি ওর সঙ্গে ছবি আঁকি, খেলি,



www.pathagar.org

আর ড্যানিশ ভাষায় কথা বলি। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। ও ঘুমিয়ে গেলে আমি পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে আসি।

একদিন নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, ও ভালো হয়ে উঠবে তো?

নার্সের মুখটা একটু কালো হয়ে গেলো। বললো 'আমরা আশা করছি, ও সেরে উঠবে। তোমার আদর ওকে অনেক সাহায্য করেছে।'

– আচ্ছা ওর মাকে এক আধ দিন থাকতে দিলে কি হয়?

– ওরে বাব্বা! এখানকার নিয়ম কানুন খুব কড়া। একটুও নিয়ম ভাঙা চলবে না।

ওদিকে আমার যাবার সময় ঘনিয়ে এলো। আমি কিন্তু সাহস করে ইয়েনকে বলিনি যে আমি চলে যাচ্ছি। বলেছি, ক'দিন পরে কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে আমাকে। ও নীল চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে। বললো,

– না যে... না যে...। ছোট্টো মাথাটা জোরে জোরে ডাইনে বাঁয়ে দোলালো সে।

তখন সন্ধ্যা বেলা। খাবার এনেছে নার্স। আমার হাতে শান্ত ছেলেটির মতো খেয়ে নিলো ইয়েন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ছড়া শুনালাম। ঘুমিয়ে পড়লো সে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইয়েনের বাবা-মা আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু আমি তো পড়েছি বিষম মুশকিলে। হাসপাতাল ছেড়ে যেতে হবে একটু পরেই। কেমন করে ইয়েনের কাছ থেকে বিদায় নেবো?

নার্স বললো, আমি ওকে বলেছি, বাংলাদেশে ওরই মতো একটি ছোট্টো মেয়ে আছে তোমার, তার কাছে ফিরে যাচ্ছো তুমি। কিন্তু ও মানছে না। তুমি যাও, দেখ, বুঝাতে পারো কিনা।

আমি অনেক কষ্টে নিজের মনকে শক্ত করে ইয়েনের কাছে গেলাম। ডাকলাম- ইয়েন, আমি তোমার বন্ধু... জুবাইদা...না। ইয়েন মুখ তুললো না। দুই হাতে বালিশ আঁকড়ে মুখ গুঁজে রাখলো ইয়েন। বালিশের নিচে স্তূপ করে রাখা অনেক ছবি, যেগুলো এঁকে এঁকে ওকে ভুলিয়েছি, ঘুম পাড়িয়েছি।

– ইয়েন, আমার দিকে তাকাবে না? আমি আবার এসে তোমাকে দেখে যাবো। ওর রেশমের মতো চুলের ওপর হাত রেখে কতবার যে ডাকলাম! নিঃশব্দ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠলো ওর সারা শরীর। হাতের কচি কচি আঙ্গুলগুলোয় হাত ছোঁয়ালাম। নার্স তার ভিজে ওঠা চোখ মুছে বললো,

–ও তোমাকে এতো ভালোবেসেছে যে তোমার যাওয়া ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তোমার আঁকা ছবিগুলো নিয়ে শুয়ে আছে। ওর জন্য প্রার্থনা করো তুমি।

আমিও তো ঝাপসা হয়ে ওঠা চোখে পথ দেখতে পাচ্ছিলাম না। দূর বিদেশে কতজন বন্ধু হয়ে উঠেছিল তাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বিদায় নিতে পারলাম না শুধু ছোট্টো ইয়েনের কাছ থেকে। আজও সেই অভিমানী, শিশুটি আমাকে মনে করিয়ে দেয়, পৃথিবীতে ভালোবাসা আর মমতা কত সুন্দর দূর আকাশের তারার মতো সে পথ দেখায়। হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব পাহাড়, নদী, সাগর, পেরিয়ে সে ফিরে ফিরে আসে। হাসে, হাসায়, কাঁদে, কাঁদায়। মনে করিয়ে দেয়, সব মানুষ ভালোবাসার মহত্ত্বেই বড় হয়। আজ তাই সেই ইয়েনের কথা তোমাদের সবার কাছে জানালাম। তোমরা তাকে ভুলো না কিন্তু।

ঈদসংখ্যা : জানুয়ারি ২০০০



www.pathagar.org

# এক অঙ্কুরের কথা

নয়ন রহমান

www.pathagar.org

ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নেয় নাদেরা। অনেক আগে সে ঢাকায় এক বাসায় কাজ করেছে। আপাতত পুরনো আশ্রয়ে এসে উঠবে। তারপর একটা ব্যবস্থা হবেই। নাদেরার কোলে পাঁচ বছরের অঙ্কুর। অঙ্কুর কিছুটা পথ হাঁটে আবার কোলে চড়ে। মৃধাবাড়ি থেকে লঞ্চঘাট প্রায় মাইল তিনেকের পথ। মহিপুরের মৃধাবাড়ি ওর শ্বশুর বাড়ি। এখন আর শ্বশুর বাড়ি নয়। মজিদ মৃধা সবার সামনে ওকে তালাক দিয়েছে। তালাক শব্দটা ওর মাথার চাঁদিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

গ্রামের উঁচ-নিচু পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরও পা ধরে আসে। বুকের ভেতর অপমানের জ্বালা। মজিদ মৃধা এক কাপড়ে ওকে বের করে দিয়েছে। ছেলেকে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, এই আপদও বিদায় করে দিলাম। নাদেরা 'আপদ' বুকে তুলে নেয়। মাতৃহৃদয় স্নেহে আপ্লুত হয়। অঙ্কুরকে ওর বাবা দাবি করলে নাদেরার বুক ফেটে যেত। নাদেরার বুকে হাজারো প্রশ্ন। আমার কি অপরাধ? বিয়ের সময় গৃহস্বামী দু'খানা গয়না দিয়েছে। শাড়ি কাপড়-চোপড়, জামাইর সাজসজ্জা এমনকি নগদ পাঁচ হাজার টাকা। খালাম্মা বলেছেন, তুই আমাদের জন্য অনেক করেছিস। আমার মেয়ের সঙ্গী হিসেবে ছিলি। তোর কোন ঠেকা পড়লে নিঃসঙ্কোচে আমাদের কাছে চলে আসবি।

নাদেরা দু' দু'বার এসেছে। এসেছে স্বামীর তাড়নায়। দু'বারই টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে গৃহস্বামী বরকত চৌধুরী। শেষবার বলেছেন, এ রকম বারবার এলে তো আমি সাহায্য করতে পারব না। শুনেছি তোর স্বামী হালচাষ করে। জমাজমিও কিছু আছে। আমি তোকে একটা দুধের গরু কেনার টাকা দেব, ঐ দিয়ে তুই চলিস। মজিদ মৃধার লোভ বেড়ে গিয়েছিল। এখন সে জমি কেনার জন্য টাকা চায়। বর্গাচাষি মজিদ মৃধা জমির মালিক হতে চায়। নাদিরার ওখানেই আপত্তি। মাতৃপিতৃহীন নাদেরা পাঁচ বছর বয়সে বাসাবাড়ির কাজে নেমেছে। একটানা দশ বছর কাজ করেছে চৌধুরী সাবের বাসায়। দিলারা আপা ওকে কিছু লেখাপড়াও শিখিয়েছে। নাদেরা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। চালচলন ভালো, ওর মামা ওকে বাসা থেকে তুলে এই বিয়ে দেয়। মামার ওপর নাদেরার প্রচ- রাগ। তালাক হওয়ার পর মামা নয়, ঢাকার খালাম্মার কথা মনে হয়েছে ওর।

তা নাদেরার কপাল মন্দ। চৌধুরীদের বাসায় গিয়ে দেখতে পায় অন্য লোক সে বাড়িতে। চৌধুরীরা বাড়িঘর বিক্রি করে আমেরিকা চলে গেছে। নাদেরা চোখে অন্ধকার দেখে। অভিমানে বুক পুড়ে যায়। দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে খালাম্মা কি আমাকে একটা খবর দিতে পারতেন না? খড়কুটোর মত ভেসে বেড়াতে থাকে নাদেরা। নাদেরার বয়স কম। দেখতে সুশ্রী। কোলে একটা বাচ্চা আছে। বাসাবাড়িতে স্থায়ী কাজ হয় না। ঠিকা কাজ নেয় নাদেরা। ঠাঁই করে নেয় রাস্তার পাশের আস্তানায়। ওর মত আরো অনেকে এই আস্তানায় থাকে। অঙ্কুরকে একেবারে অরক্ষিত রেখে নাদেরা কাজ করতে যায়। দুপুরে ভাত নিয়ে আসে। দু'জনে খায়। আবার বিকেলে কাজে যায়। রাতের খাবার নিয়ে আসে। নাদেরা কাজে পটু। রান্না-বান্নায় পারদর্শী। চৌধুরীর গিন্নি ওকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন।



www.pathagar.org

কাজের অভাব হয় না নাদেরার। কিন্তু এভাবে কাজ করে তো জীবন কাটাতে চায় না নাদেরা। ওর আশা অঙ্কুর লেখাপড়া শিখে বড় হবে। একটা ছোটখাটো চাকরি করবে। নাদেরার দুঃখ ঘুচবে।

অঙ্কুর বলে, আম্মা এই পচা জায়গায় থাকতে মন চায় না। চলো আমরা নানার বাড়ি খুঁইজ্যা বাইর করি। অঙ্কুর চৌধুরীর বাড়ি এসেছিল। ওর মা বলেছিল, এইটা তোর নানাবাড়ি। অঙ্কুরের চোখে সেই বাড়ির ছবি ভাসে। নাদেরা অঙ্কুরকে বর্ণমালা শেখায়। ছড়া শেখায়। নিজের অল্পবিদ্যা দিয়ে অঙ্কুরের ভিত রচনা করে।

দিন বসে থাকে না। সময় কেবলই ওড়ে চলে। নাদিরা অঙ্কুরকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দেয়। বিনি পয়সার স্কুল। এনজিওরা নাকি চালায়। অঙ্কুর তখনি জানতে পারে ওর নাম সোবহান মৃধা। নাদেরা বলে, অঙ্কুর তোর ডাকনাম। আমার দিলারা আপা তোর নাম রেখেছে অঙ্কুর।

অঙ্কুর যথাসম্ভব পরিষ্কার শার্ট-প্যান্ট পরেই স্কুল আসে। নাদেরার এদিকে খুব খেয়াল। স্কুলের অন্যান্য ছাত্রদের সমতুল্য করে রাখতে চায় অঙ্কুরকে। অঙ্কুর বলে, আম্মা আমি তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারি। আপারা আমারে খুব আদর করে। ময়লার ডাস্টবিনের কাছে দিনরাত কাটালেও অঙ্কুর কলাবতি ফুলের মত মাথা উঁচু করে চলতে চায়। বাসস্থানটা ওর মোটেই পছন্দ নয়। এত নোংরা আর লোকজন এত ঝগড়াটে। অঙ্কুর বলে, আম্মা ফুটপাথে শুইতে পিঠ ব্যথা করে। আমি তোশকের বিছানায় ঘুমামু। নাদেরা ছেলের কথার জবাব দেয় না। এতদিন তো তোশক বালিশ মশারি চৌকি এসবই ছিল অঙ্কুরের আয়ত্তে। নাদেরা মনে মনে কাঁদে। পাষাণ বাপ। একটা খোঁজও নেয় না। আর নিলেই কি নাদেরা অঙ্কুরকে ছাড়তে পারবে? এক এক সময় ভাবে, দেনদরবার করে অঙ্কুরকে ওর বাপের কাছে দিয়ে আসাই ভালো। এই কষ্টের তো অবসান হবে? ঝিয়ের ছেলে এই বদনাম তো ঘুচবে?

অঙ্কুরের এখন দশ চলছে। ক্লাস ফোরে পড়ে অঙ্কুর। রাত্রে পড়ার জন্য আলো নেই। অঙ্কুর দিনেই পড়া শেষ করে রাখে। রাস্তার আলোতে মাঝে মাঝে পড়ে। বস্তির লোকেরা নানা মন্তব্য করে। লাট হবে পড়াশুনা করে। তার চাইতে মিস্তির কামে লাগায়ে দেও। পথচারীরা অবাক হয়। কেউ কেউ উপহাস করে। বলে, এই যে দেখছি বস্তিঘরে বিদ্যাসাগর।

অঙ্কুর এখন অনেক কিছু বুঝে। ওর মনের বয়স অনেক বেশি। স্কুল ছুটির পর বই-খাতা বুকে চেপে বস্তিতে ফিরতে ওর ভালো লাগে না। সবাই কেমন বাঁকা চোখে তাকায়। স্কুলের স্যাররা যখন প্রশংসা করে তখন অঙ্কুরের বুকটা আনন্দে ভরে যায়। অঙ্কুর বলে, আম্মা আমি বাসায় কাজ করুম আর পড়ুম।

নাদেরা যেন আকাশ থেকে পড়ে।

বাসায় কাজ করবি? বাসায় কাজ কইরা কি পড়ার সময় পাবি? কে তোরে কাজে রাখবে?

তুমি চেষ্টা করো আম্মা। রাস্তায় থাকতে ভালো লাগে না।



www.pathagar.org

অঙ্কুর তো এ কথা সব সময় বলে আসছে। নাদেরা এখন কি করে? বস্তির জীবন কত বিপজ্জনক নাদেরা নিজে তা হাড়ে হাড়ে টের পায়। নাদেরারও তো বয়স কম, চারদিকে লোভের হাতছানি। আর এক বছর অঙ্কুর ঐ স্কুলে পড়তে পারবে। তারপর? নাদেরা ছেলের কাছে প্রস্তাব রেখেছিল, তুই মহীপুর চলে যা। তোকে দেখলে তোর আব্বা ফেলতে পারবে না। ওখানে তোদের কত বড় ঘর। উঠান। বাগান। পুকুর। তুই খুব আরামে থাকবি রে অঙ্কুর।

না আম্মা, তোমারে ছাইড়া আমি যাইতে পারুম না। নাদেরা মনে মনে ভাবে, আমিই কি তোকে ছাড়া থাকতে পারব?

ঝড়- বৃষ্টি-বাদলের সাথে পাল্লা দিয়ে অঙ্কুর মাথায় বাড়ে। বুদ্ধিতে বাড়ে। ওদের পলিথিন ঘেরা ছোট্ট আস্তানা কখনো পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। ওরা এক দঙ্গল মানুষ ছোটবড় সবাই-কখনো ভাঙা দালানে আশ্রয় নেয়। কখনো কলোনির সিঁড়ির নিচে। ওদের জীর্ণ দীর্ণ আসবাবপত্র বিছানা বালিশ তছনছ হয়। রোদের আলোতে তা শুকায়। আবার সংসার গোছায়। নাদেরা সেদিন ছেলেকে বলে গেছে আইজ স্কুল বন্ধ। দূরে যাবি না। আমি তাড়াতাড়ি আসব।

অঙ্কুর বস্তির মধ্যে বসে সময় কাটাতে চায় না। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে কমলাপুর রেলস্টেশনে। এখানের উঁচু পুলটা ওকে খুব আকর্ষণ করে। ঝিকিমিকি রোদ বাতাসের প্রবল তাড়নায় মানুষের বিচিত্র কর্মব্যস্ততা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে অঙ্কুর। একটা ট্রেন তীব্রস্বরে হুইসেল দিতে দিতে চলে যায়। দুটো শালিক অনেক নিচে সবুজ ঘাসের ওপর নাচানাচি করে। একটা ছোট মেয়ে টুকরো টুকরো কাগজ কুড়িয়ে বস্তায় ভরে। অঙ্কুর ভাবে কত লোক কত কাজ করে। বড়রা করে। ছোটরা করে। আমি কোন কাজ করি না। আম্মা কেবলই গ্রামে আব্বার কাছে যেতে বলে। আব্বা কেমন? আম্মা কেন আব্বার কাছে যেতে চায় না? গ্রাম কি এই শহরের চাইতে ভালো? গ্রামে গেলেই কি আমি লেখাপড়া করতে পারব? অঙ্কুরের ক্ষুদ্র বুকে অজস্র প্রশ্ন নদীর ঢেউয়ের মত ওঠানামা করে। একটা ছেলে বোঝা নিয়ে পুলের ওপর ওঠে এসেছে। বোঝা বইতে ওর কষ্ট হচ্ছে। সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে। ছেলেটি হ্যাংলা পাতলা। অঙ্কুর ছেলেটির কাছে এগিয়ে যায়। বলে এই বোঝাটা আমারে দেও। পুল পার হইতে তোমার কষ্ট হইবে। আমি পারব।

ছেলেটি বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, ইয়ার্কি না? সাহেবের পোলারা বোঝা বয় না। যাও। ফোট।

অঙ্কুর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখ দিয়ে কথা সরে না। রোদ তখন তেতে উঠেছে। সূর্য মাথার ওপর যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অঙ্কুরের মনে পড়ে, মা কাজের বাসা থেকে এখুনি হয়ত ফিরবে। কিন্তু রাস্তার বস্তিতে ফেরার জন্য ওর মন চায় না। পা সরে না।

নভেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# এক ধূর্ত কবির কথা

জামান মনির

www.pathagar.org

প্রায় হাজার বছর আগের কথা। ইরান দেশের খোরাসান রাজ্য। সেখানকার বাদশাহ্ তখন সন্‌জর।

তা বাদশাহ্ সন্‌জর যেমনি ছিলেন কাব্যরসিক, তেমনি দিতেন বিদ্যার কদর। যার জন্য তাঁর রাজধানীতে ছিলো বিদ্বান লোকের ছড়াছড়ি। সেই সাথে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের ভালো ভালো কবিরাও এসে ভিড় জামাতেন। তবে সব কবিই যে তাঁর দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে কবিতা শুনাতে পারতেন, তা নয়। তার দরবারের প্রধান কবি ছিলেন মুয়িজ্জী। দরবারি কবি ছিলেন তিনি। সেই মুয়িজ্জীর ছাড়পত্র ছাড়া কেউ-ই তার দরবারে ঢুকতে পারতেন না।

আর বাদশাহ্ সনজরের আদেশও ছিলো তাই। তাঁর আদেশ ছিলো, নতুন করিয়া প্রথমে মুয়িজ্জীর কাছে তাদের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শুনাবে। তাদের মধ্যে যাদের যে কবিতাটি তিনি ভালো বলে বিবেচনা করবেন, শুধুমাত্র তারাই সেই কবিতাগুলি বাদশাহর দরবারে পাঠ করতে পারবে। এই শাহি-আদেশের সুযোগ নিতেন দরবারি কবি মুয়িজ্জী। তবে, তার আগে বলে নিতে হয়, এই মুয়িজ্জী ছিলেন এক বিশেষ গুণের অধিকারী। ভালো, তাঁর অদ্ভুত স্মরণশক্তি। সেই স্মরণশক্তি গুণেই তিনি একবার যে কবিতা শুনতেন, পরক্ষণে তিনি তা অবিকল গড় গড় করে আবৃত্তি করতে পারতেন। শুধু কি তাই? তাঁর ছিলো একটি গুণধর পুত্র। সে দু'বার যা শুনতো পিতার মতোই তা গড় গড় করে আবৃত্তি করতে পারতো। এমন কি দোয়াতদান হিসেবে তাঁর যে চাকরটি সবসময় তাঁর পাশে থাকতো, সে-ও কম গুণধর ছিলো না। সে-ও যে কবিতা তিনবার শুনতো, অবিকল তা তোতাপাখির মতো আবৃত্তি করতে পারতো।

এই কবি মুয়িজ্জী ছিলেন যেমনি ধুরন্ধর, তেমনি হিংসুটে প্রকৃতির। তিনি নিজের আসন ঠিক রাখার জন্য কখনোই চাইতেন না অন্য কোন প্রতিভাবান কবি তার ভালো কবিতা শুনিয়ে বাদশাহ্ সন্‌জরকে মোহিত করে। তাই তিনি যখন দরবারের অন্যান্য অধস্তন কবিদের সাথে নিয়ে নবাগত কবিদের কবিতা নির্বাচন করতেন, তখন সেখানে নিজের পুত্র ও চাকরটিকেও সঙ্গে রাখতেন। অতঃপর কবিতা নির্বাচনকালে কোনো প্রতিভাবান কবি তাঁর সদ্যরচিত সুন্দর কবিতাটি পাঠ করা শুরু করলেই তিনি সজাগ হতেন। সজাগ করে দিতেন নিজের পুত্র ও চাকরটিকেও।

এরপর নব্যকবির কবিতা পাঠ শেষ হলেই কবি মুয়িজ্জী স্বগর্বে বলে উঠতেন, আরে! এ তো আমারই লেখা কবিতা : শুনবেন তাহলে?

এই বলে তিনি তখ্‌খুনি সেই কবিতাটি গড় গড় করে আবৃত্তি করতেন। তা সে যতো বড়ো কবিতাই হোক না কেন। মুয়িজ্জীর স্মরণশক্তিতে তা ঠিকই ধরা থাকতো।

এমনকি, কবিতাটি যে তাঁরই রচিত- সেটা প্রমাণ করার জন্যে- নিজের আবৃত্তি শেষ হবার সাথে সাথেই বলে উঠতেন, এ কবিতাটি যে আমারই রচিত তার বড়ো প্রমাণ- এটি আমার ছেলেরও মুখস্থ।

এই বলে তিনি পুত্রের মুখের দিকে তাকাতেন। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হিসেবে-ইতোমধ্যে তার যেহেতু দুইবার শোনা হয়েছে কবিতাটি, সেহেতু তা মুখস্থ তার। সুতরাং তা আবৃত্তি করতে এতটুকুও তার বাধতো না।

তাছাড়া আরো প্রমাণের উদ্দেশ্যে মুয়িজ্জী তাঁর পুত্রের আবৃত্তি শেষ হবার সাথে সাথেই তাঁর



www.pathagar.org

সেই গুণধর চাকরকেও তা আবৃত্তি করতে বলতেন।
চাকরটি ততক্ষণে কবিতাটি যেহেতু তিনবার শুনেছে, সেহেতু তারও তা মুখস্থ হয়ে যাওয়ায় তোতা পাখির মতো সে-ও গড় গড় করে আবৃত্তি করে যেতো।
উপস্থিত সভা কবিরা এতোগুলো প্রমাণের পর, মুয়িজ্জীকে আর কোনোক্রমেই অবিশ্বাস করতে পারতো না। ফলে, প্রতিভাবান নব্যকবি শাহি দরবারে প্রবেশের ছাড়পত্র না পেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে, ঘরে ফিরে যেতো।
কবিতা বাছাই সভার অন্যান্যরা মুয়িজ্জীর চাতুরীপূর্ণ প্রতারণা বুঝতে না পারলেও যারা প্রতারিত হতো তারা তা স্পষ্টতই বুঝতো। কিন্তু সেই সভায় তারা বাদ-প্রতিবাদটুকুও করতে পারতো না। কেবলমাত্র বাড়ি গিয়ে তারা, পাড়া প্রতিবেশীদের ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির স্মৃতিশক্তি ও প্রতারণার কথা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রচার করতো।
এই সময় খোরাসান রাজ্যের এক পল্লীতে উদয় ঘটে কবি আনোয়ারীর। যুবক আনোয়ারীর মধ্যে কাব্যপ্রতিভা গজ গজ করলেও 'ধন সম্পদের সাথে সাহিত্য সংস্কৃতির চির বিরোধ' বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে, তারই নিমিত্তে তিনি কাব্যচর্চা বাদ দিয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি যখন কোনো এক শাহি দরবারের কবিকে হাতির ওপর সওয়ার হয়ে বেড়াতে দেখলেন তখন তিনি ভাবলেন, এতোদিন ধরে তিনি যেটা জেনে এসেছেন– সেটা নির্জলা মিথ্যা। ভিত্তিহীন।
এইভাবে তিনি সেই দিনই-বীজগণিত, জ্যামিতি, ভূগোল শাস্ত্রাদি বাক্সবন্দী করে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। এমনকি, প্রথম চোটেই তিনি বাদশাহ্ সন্‌জরের প্রশংসা গেয়ে দীর্ঘ একটি কবিতা রচনা করে ফেললেন। কবিতাটি লিখে তিনি তা বারবার পড়লেন। সমঝদার প্রতিবেশীদেরকেও শুনালেন। শুনে বাহ্‌বা দিলো প্রতিবেশীরা। আর পায় কে আনোয়ারীকে! সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মাতলেন তিনি। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে, যার প্রশংসা গেয়ে রচনা করলাম কবিতাখানি, তাকে শুনাতে না পারলে এই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মাতার সার্থকতা কোথায়?
কথাটা ভেবে, শাহি দরবারে যাবার এবং বাদশাহকে তা নিজের মুখে আবৃত্তি করে শুনিয়ে আসার বাসনা জাগলো আনোয়ারীর অন্তরে!
কিন্তু তাঁর দরবারে যেতে গেলে নাকি দরবারি কবি-প্রধান মুয়িজ্জীর ছাড়পত্র লাগে। তাছাড়া ওই কবিপ্রধান নাকি ভালো কবিতাগুলোকে-অন্যান্য দরবারি কবিদের সামনে নিজের কবিতা বলে প্রমাণ করেন। করেন প্রতারিত। সেসব ঘটনা তো আমি বহুবার বহু প্রতিভাবান কবির মুখেই শুনেছি। ... তাহলে কি আমি এতো সুন্দর কবিতাখানি বাদশাহকে শুনাতে পারবো না?
হৃদয়খানি মথিত হতে লাগলো কবি আনোয়ারীর। তিনি ভাবতে লাগলেন গভীরভাবে।
অনেক ভেবে, তিনি 'শঠে শঠ্যাং' অর্থাৎ শঠের সঙ্গে শঠতা করবেন, ঠিক করলেন। এমনকি, সেই শঠতার ধরন কেমন হবে, তা-ও ঠিক করে ফেললেন তিনি। অতঃপর আশায় বুক বেঁধে, খোরাসানের রাজধানীতে হাজির হলেন আনোয়ারী। এবার দরবারে ঢোকার জন্য ছাড়পত্র নেবার পালা। তার জন্য মনে মনে কৌশল ঠিক করাই ছিল। তিনি ভালো জামা-কাপড়ের ওপর ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে, নানাভাবে অঙ্গভঙ্গি করতে করতে



www.pathagar.org

গিয়ে হাজির হলেন মুয়িজ্জীর দরবারে। সেখানে গিয়ে তিনি বিচিত্র রঙের একটা পাঁচালি গাইলেন। মুয়িজ্জী তাঁকে একজন কৌতুককারী ভাঁড় মনে করে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাও তুমি?

কবি আনোয়ারী তেমনি অঙ্গভঙ্গি করে বললেন, হুজুরের মেহেরবানি হলে এ বান্দা শাহানশাহকে একটা ছড়া শুনিয়ে নসিব বুলন্দ করতো। মুয়িজ্জী ভাবলেন, এতে আর আপত্তির কি। বললেন, ঠিক আছে, একটু পরেই শাহি দরবারে যাবো। তখন সঙ্গে যেয়ো। এরপর তিনি কবি আনোয়ারীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন বাদশাহ্ সনজরের শাহি দরবারে। যেতে যেতে তিনি ভাবলেন, এই লোকটার ভাঁড়ামিতে দরবারে আজ কি কৌতুক-ই-না হবে।

দরবারে উজির-নাজির, আমির-ওমরাহ সবাই এসে গেছেন। কবি মুয়িজ্জীও তাঁর দলবল নিয়ে হাজির হলেন। সাথে নব্যকবি আনোয়ারী। তবে, কবি আনোয়ারীকে তখ্খনি দরবারে হাজির না করে, সভাসদদের রসের খোরাক হিসেবে রাখলেন অন্তরালে।

নকবী শোহরৎ দিলো। বাদশাহ্ সন্জর এসে তখ্তে বসলেন। অতঃপর মুয়িজ্জীর ইশারায় অন্তরাল থেকে বেরিয়ে দরবারে হাজির হলেন কবি আনোয়ারী। কিন্তু এ কী! ওর ছেঁড়া-খোঁড়া বেশবাশ গেলো কোথায়? তাছাড়া অঙ্গভঙ্গি করতে করতেও তো দরবারে এলো না।

আরো অবাক হলেন মুয়িজ্জী, আনোয়ারী যখন বাদশাহকে অভিবাদন করে-একটা সুন্দর ধরনের কবিতা পাঠ শুরু করলেন, তখন। কিন্তু কবিতার প্রথম স্তবক পাঠ করেই থামলেন আনোয়ারী। হতভম্ব মুয়িজ্জীর দিকে তাকালেন। সবিনয়ে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, এ কবিতা যদি হুজুরের রচিত হয়, তাহলে আমি আর বাকিটুকু পড়তে চাই না। হুজুরের মধুর কণ্ঠেই তা ভালো শুনাবে। শাহানশাহ্ও খুশি হবেন।

মুয়িজ্জীর গৌরবর্ণ মুখশ্রীটা মুহূর্তে কালো হয়ে গেলো। তিনি যে কোনো কবিতা একবার শুনেই মুখস্থ বলতে পারেন বটে, কিন্তু না শোনা কবিতা তো আর আবৃত্তি করতে পারেন না। আর তাই তিনি স্পষ্টই বুঝলেন, এবার তিনি সহজ পাল্লায় পড়েননি। পড়েছেন বেকায়দায়।

ততোক্ষণে বাদশাহ্ সন্জর মুয়িজ্জীর মুখের পানে তাকালেন। অমনি ফাঁদে পড়া মুয়িজ্জী বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, না খোদাবন্দ। এ কবিতা আমার নয়। অতঃপর আনোয়ারী তাঁর কবিতার বাকি অংশটুকু পাঠক করতেই, দরবারের চারদিকে থেকে ধন্য ধন্য রব উঠলো। বাদশাহ্ সন্জর সে কবিতা শুনে এমনি মোহিত হলেন যে, মণিমুক্তায় কবির দু-হাত ভরে না দিয়ে পারলেন না। অতঃপর তিনি কবি আনোয়ারীকে বসালেন মুয়িজ্জীর আসনে। এবং মুয়িজ্জীকে হুকুম দিলেন-দরবারের অধস্তন কবিদের আসনে বসার। পরশ্রীকাতর ধূর্ত মুয়িজ্জী নিতান্ত নিরুপায়ের মতো ম্লান মুখে কবি আনোয়ারীর কবিতার প্রশংসা করতে করতে দরবারের নিম্নতর আসনে গিয়ে বসলেন।

এতোদিন ধরে মুয়িজ্জীর প্রভাব প্রতিপত্তিকে যারা ঈর্ষা করতেন, তারা মনে মনে খুশি না হয়ে পারলেন না।

মে, ১৯৯৯

উৎস : মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর পারস্য প্রতিভার নেজারী অধ্যায়



www.pathagar.org

# এক যে ছিল রাজা

আকরাম ফারুক

www.pathagar.org

কোন এক সময় আরবের এক মরুভূমির পাশে একটি ছোট রাজ্য ছিল। সেই রাজ্য চলতো এক অদ্ভুত নিয়মে। প্রতি দশ বছর অন্তর তার রাজা বদল হতো এবং প্রজাদের ভোটেই রাজার নির্বাচন সম্পন্ন হতো। নির্বাচিত রাজা তার দশ বছরের শাসনকালে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারতো। প্রজাদের কাছে তাকে কোনো জবাবদিহি করতে হতো না। তাকে প্রথম দিনেই বলে দেয়া হতো যে, তোমার এই দশ বছরের শাসনকালে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেমন খুশি তেমন দেশ চালাতে পারবে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যত টাকা ইচ্ছা ব্যয় ও ভোগ করতে পারবে। কিন্তু দশ বছর ফুরিয়ে গেলে তোমার ঠিকানা হবে পাশের মরুভূমির শুষ্ক প্রান্তরে। সেখানে ছায়া নেই, পানি নেই, এবং খাবার নেই। রোদে পুড়ে ক্ষুধা ও পিপাসায় ছটফট করে তোমাকে মরতে হবে। এসব জেনে শুনে যে ব্যক্তি রাজি হতো এবং যার ভেতরে শাসকসুলভ প্রয়োজনীয় যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যেতো, তাকেই সিংহাসনে বসানো হতো। রাজার অভিষেক অনুষ্ঠিত হলো মহা ধুমধামে। আবার যেদিন তার দিন ফুরিয়ে যেতো, সেদিনও তাকে হাত-পা বেঁধে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে রেখে আসা হতো মরুভূমির নির্দিষ্ট জায়গায় একই রকম ধুমধামের সাথে। রাজত্বের প্রথম দিনেই তাকে একবার ঐ বিরান জায়গাটা দেখিয়ে আনা হতো, যেখানে ইতঃপূর্বে বহু রাজা মারা গেছে এবং তাদের অনেকের কঙ্কাল আশপাশে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ রাজাকে তপ্ত মরুভূমিতে একটা লোহার খুঁটিতে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে আসা হতো। তারপর অত্যন্ত মজবুত পাহারা বসানো হতো, যাতে সে কখনো ছুটে লোকালয়ে আসতে না পারে কিংবা লোকালয় থেকে কেউ গিয়ে খাবার দাবার দিয়ে আসতে না পারে।

এভাবেই চলছিল রাজ্যটি শত শত বছর ধরে। কিন্তু এক সময় দেশটিতে রাজার আকাল পড়লো। মেয়াদ ফুরানো রাজার করুণ পরিণতি দেখে ঐ সিংহাসনটির ব্যাপারে এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো যে, এখন আর কেউ রাজা হতে চায় না। দশ বছরের আয়েশি জীবনের পর এমন ভয়ঙ্কর অপমৃত্যুর পথ কেউ আর স্বেচ্ছায় বেছে নিতে চায় না। তাই দেশের অভ্যন্তরে রাজসিংহাসনের প্রার্থী বলতে গেলে একেবারেই দুর্লভ হয়ে উঠলো। অনেক সাধাসাধি করেও কাউকে আর রাজা হতে আগ্রহী করা যায় না।

এমতাবস্থায় প্রজারা বাধ্য হয়ে বিদেশী পর্যটকদের কাছে ধরনা দিতে লাগলো রাজসিংহাসনে বসার জন্য। কিন্তু তাদের রাজ্যের নিয়ম ভীষণ কড়া। কোনমতেই শর্তগুলো শিথিল করার উপায় নেই। যাকেই অনুরোধ করা হয়, তাকে শর্তগুলো ও নিয়মাবলি জানিয়ে দেয়া হয়। পদটি গ্রহণ করতে হলে সকল নিয়ম ও শর্ত জেনে নিয়েই গ্রহণ করতে হবে।

এসব শর্ত শুনে পর্যটকরাও ভয়ে ও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে লাগলো। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন বিদেশীকে পাওয়া গেল। সে



www.pathagar.org

অত্যন্ত ধীরস্থির মস্তিষ্কে সব নিয়ম ও শর্তাবলি জেনে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসতে রাজি হয়ে গেল।

সিংহাসনে বসে প্রথম দিনেই যে মনোযোগ দিল মরুভূমির যে জায়গাটিতে দশ বছর পরে তাকে বসবাস করতে হবে, সে জায়গাটির উন্নয়নের দিকে। রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন, যত টাকা লাগে লাগুক, প্রয়োজনে বিদেশী প্রকৌশলী ও কারিগর এনে পরিকল্পনা করে সেখানে একটি আরামদায়ক আবাসভূমি নির্মাণ করতে হবে। যে কথা সে কাজ। রাজা বিদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনলো, কারিগর আনলো এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করলো। অতঃপর দেশের কিছু জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মরুভূমির সেই অংশটিকে শ্যামল শস্যক্ষেত ও ফলফুলে সুশোভিত বাগানে পরিণত করলো। পরিকল্পনা মোতাবেক সে স্থানে পুকুর ও লেক এবং নিজের বসবাসের জন্য বিশাল এক প্রাসাদ নির্মাণ করলো। গোটা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময় রাজা একটি কথা সব সময় মনে রেখেছিল। সেটি এই যে, নির্দিষ্ট দশ বছরের শাসনকালে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এবং রাজ্যের সমগ্র ধনভা-ার ও জনশক্তি তার নিয়ন্ত্রণাধীন। এগুলোকে ব্যবহার করে সে ইচ্ছা করলে তার দশ বছরের শাসনকাল ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে ঐ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সে ঐ মেয়াদকালে এবং তার পরবর্তী সময় এই দুটোকেই আরামদায়ক বানাতে পারে। সে এই শেষোক্ত কর্মপন্থাই অবলম্বন করলো, যা তার পূর্ববর্তী রাজাদের কারো মাথায়ই আসেনি। রাজা তার মেয়াদকাল পূর্ণ করলো। দেশের মানুষ তার শাসনকালে অত্যন্ত সুখী ছিল এবং অনেকেই তাকে আরো একটি মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় রাখতে উদগ্রীব ছিল। কিন্তু দেশের নিয়মকানুন ও ঐতিহ্য ছিল অলঙ্ঘনীয়। তাই মেয়াদ পূর্তির দিন যথানিয়মে রাজধানীতে বিশাল জনসমাগম হলো। সকলে শোভাযাত্রা সহকারে রাজাকে সেই তিলে তিলে বধ করার বধ্যভূমিতে নিয়ে চললো। একটি ব্যাপার দেখে সবাই অত্যন্ত বিস্মিত হলো, যা ইতঃপূর্বে আর কোনো রাজার বেলায় দেখা যায়নি। এই বিদেশী রাজাটি শোভাযাত্রীদের সাথে বধ্যভূমিতে যাওয়ার সময় এমন আমোদ স্ফূর্তি-সহকারে যাচ্ছিল, যা ছিল অভাবনীয়। কেননা এর আগে প্রত্যেক রাজাকে মরুভূমিতে ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে হতো। কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চাইতো না। কিন্তু এই বিদেশী রাজা শোভাযাত্রীদের সাথে সমান তালে নর্তন কুর্দন করতে করতে চললো। যখন শোভাযাত্রা মরুভূমির প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছলো, তখন সকলের চোখ তো ছানাবড়া। এ কি! কোথায় সে ধু ধু প্রান্তর! এ যে এক মনোরম শ্যামল বাগান আর তার মাঝে এক নয়নাভিরাম প্রাসাদ। সবাই কৌতূহলী হয়ে রাজাকে জিজ্ঞেস করলো, এসব তুমি কোথা থেকে পেলে। রাজা জবাব দিল, আমার রাজত্বের পরবর্তী জীবনটির কথা আমি ভুলিনি। তাই আগে ভাগেই এ সব তৈরি করে রেখেছি।

এপ্রিল, ১৯৯৭



www.pathagar.org

# আলোর ফোয়ারা

জাফর তালুকদার

www.pathagar.org

লুলুর মন ভাল নেই। তার খুব ভয়ানক এক অসুখ হয়েছে। দেড় মাস হাসপাতালে কাটিয়ে এই মাত্র ক'দিন হল সে বাড়ি এসেছে। ডাক্তার বলেছে রোগ ভাল করতে হলে বিদেশে যেতে হবে। কিন্তু বিদেশ যাবার মতো অত টাকা লুলুদের নেই। মা সারাক্ষণ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদেন। বাবা আদর করে কপালে হাত বুলিয়ে বলেন, 'চিন্তা কর না মা, আমরা খুব শিগগির তোমাকে নিয়ে বিদেশ যাব। তুমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে আবার স্কুলে যাবে। কী খুশি তো?'

লুলুর চোখ ছল ছল করে ওঠে, 'বাবা, আমি সত্যি সত্যি আবার স্কুলে যেতে পারব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব পারবে।'

'কিন্তু সবাই যে বলে...।'

'কী বলে মা?'

'আমি নাকি আর কখনও ভাল হবো না!'

'ছিঃ মা, ওরা মিথ্যা কথা বলেছে। তুমি আবার ভাল হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই ভালো হবে।'

'জানো বাবা, স্কুলের বান্ধবীরা এসেছিল আমাকে দেখতে। ওই দেখো কত কী এনেছে ওরা। কাল নাকি রুবী ম্যাডাম আসবেন।'

'হ্যাঁ মা, তোমার জন্য ওঁরা অনেক করেছে। তোমাকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে কাগজে। গোটা দেশের মানুষ তোমার সঙ্গে আছে, ভয় কী মা।'

রাতে কিছুতেই দু'চোখ বন্ধ করতে পারে না লুলু। ডাঙায় তোলা মাছের মতো কেবলই ছটফট করে বিছানায়। কতদিন হল সে স্কুলে যেতে পারে না। দুটো পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। ফাইনাল তো এসে গেল প্রায়। কষ্ট করে সে পরীক্ষা দেবে। রুবী ম্যাডাম সেদিন এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'আগে ভাল হও, তারপর পরীক্ষা। আমরা সবাই তোমার জন্য দোয়া করছি। খুব শিগগির তুমি ভাল হয়ে স্কুলে যেতে পারবে।'

আজ নানা কথা ভেবে লুলুর ঘুম আসছিল না। মিলা একটা বই দিয়ে গেছে। অ্যানি ফ্যাংকের ডায়েরি। এত কষ্টের বই পড়তে তার ভাল লাগে না। বারবার ঝাপসা হয়ে আসে চোখ। বাইরে চমৎকার জোছনা উঠেছে। জানালার কাছে কদমের পাতাগুলো দোল খাচ্ছে বাতাসে। একটা পাখি শিস দিয়ে ডেকে উঠল। গভীর ঘুমে দু'চোখের পাতা জড়িয়ে এল লুলুর।

কতক্ষণ এভাবে ঘুমিয়ে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হল কে যেন জানালায় হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে, 'লুলু, এই লুলু শুনছ?'

'কে তুমি ওখানে?'

'আমি লাল পরী।'

'লাল পরী! কী চাও আমার কাছে?'

'কিছুই চাই না। তোমার অসুখের কথা শুনে দেখতে এসেছি। খুব বুঝি কষ্ট হচ্ছে সোনা। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

'কোথায় যাব?'

'পরীর দেশে। আমরা সাত পরী তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াব সেখানে। কত পাহাড়,



www.pathagar.org

ফুল, ফল ঝর্ণা, ময়ূর, প্রজাপতি– তুমি সারাদিন নেচে খেলে বেড়াবে, তোমার অসুখ ভাল হয়ে যবে... ।'

'কিন্তু আব্বু-আম্মুকে ছেড়ে কী করে থাকব আমি?'

'পাগল, তুমি কি সারাজীবন থাকবে নাকি ওখানে। তোমার অসুখ ভাল হয়ে গেলে আবার চলে আসবে।'

'আমি কি করে যাব তোমার সঙ্গে, আমার তো ডানা নেই।

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। ভাল মেয়ের মতো আমার ডানায় চড়ে বসবে, আর চোখের পলকে তোমাকে নিয়ে উড়ে চলে যাব স্বর্গ-পরীর দেশে।'

'স্বর্গ-পরীর দেশ কোথায় লাল পরী?'

'সে অনেক দূর। সাত পাহাড়ের দেশে।'

'আমার খুব ভয় করছে।'

কেন, ভয় কিসের, একবার চলই না আমার সঙ্গে, তখন আর ফিরতে মন চাইবে না।'

'না, না, কক্ষনই না। বাবা- মাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

'তাহলে কী তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকবে এভাবে? তোমাকে নিয়ে বাবা-মার মনে কত কষ্ট তো কি জানো?'

'জানব না কেন। আমার অসুখ ভাল করতে হলে অনেক অনেক টাকার দরকার। এতো টাকা তো আমাদের নেই।'

'তুমি কিচ্ছু ভেব না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ধীরে ধীর উঠে ছাদে চলে যাও। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য।'

লাল পরী চলে যাবার পর ঘরের আলো আলো ভাবটা সরে গেল। চাঁদ হেলে গেছে। অপূর্ব এক ঘ্রাণের সুরভি ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়। লুলু প্রাণভরে নিশ্বাস টেনে বিছানা ছেড়ে উঠল। কেমন এক আশ্চর্য সুতোর টানে সে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল ছাদের ওপর।

মিহি চাঁদের আলোয় লাল পরীর রূপের আভা জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল। তাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, কী এসেছো? চল, এবার তাহলে যাই। রাত অনেক হল।'

লাল পরীর ডানায় চড়ে লুলু উড়ে চলল রাতের আকাশে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। অগণিত তারা ঝুলে আছে পুঁতিদানার মতো। নিচের দিকে কিছুই চোখে পড়ছে না। পেঁজো তুলোর মেঘ কেটে কেটে উড়ে যাচ্ছিল লাল পরী। হিম ঠা-া বাতাসে লুলুর চোখ জড়িয়ে এল। লাল পরী হেসে বলল, 'কি ঘুম এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, চোখ বুজে আসছে।'

'কেমন লাগছে আকাশে উড়তে?'

'খুব মজা। ইস, আমার যদি ডানা থাকত তোমার মতো!'

'তুমি নেবে আমার ডানা?'

'তা কী করে হয়। আমি কি পরী নাকি!'

'হ্যাঁ, তুমি হলে আমাদের হলুদ পরী।'



www.pathagar.org

'বাহ, আমার যে ডানা নেই!'
'ডানা থাকলেই বুঝি পরী হয়। তুমি তো পরীর মতো সুন্দরী আর ভাল মেয়ে। তোমাকে সবাই ভালবাসে।'
'তুমি বাস না?'
'খুব বাসি। না হলে তোমাকে কেন নিতে এসেছি বুঝতে পার না। আচ্ছা, আর কথা বলতে হবে না। তোমার দুর্বল শরীর। এখন একটু ঘুমাও।'
ঘুম যখন ভাঙল অবাক হয়ে গেল লুলু। এ কোথায় এসেছে সে? পাহাড় আর ঝর্ণাঘেরা ভারী সুন্দর একটা বাগানে মখমলের ঘাসে শুয়ে চোখ বড় হয়ে গেল তার। ফুলে ফুলে হাসছে চারদিক। হাজার প্রজাপতির মেলা বসেছে সেখানে। গাছে গাছে ঝুলে আছে বাহারি টসটসে ফল। পাখিরা উড়ছে এ ডাল থেকে ও ডালে। ঝর্ণার স্বচ্ছ পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে ধবল রাজহাঁস। হঠাৎ সেখানে নেচে নেচে হাজির হল সাত টুকটুকে পরী। তাদের কলকাকলি ঝর্ণার শব্দে মিশে অপূর্ব এক কলতানের সৃষ্টি করল।
সাতপরী ফুল ছিঁড়ে গুঁজে দিল লুলুর বাহারি খোঁপায়। প্রজাপতি আর ময়ূরের পেছনে ছুটতে ছুটতে গাছ থেকে পেড়ে খেল কত কী মধুর রসের ফল। সে ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠল। রোগাটে ফ্যাকাশে মুখ বদলে গিয়ে কেমন আলোর ফোয়ারার মতো ঝলমলিয়ে উঠল। সাত পরীর মতো সেও বুঝি ডানা মেলে উড়ে যাবে এক আকাশ থেকে অন্য আকাশে।
'লুলু, এই লুলু, আর কতো ঘুমোবিরে মা! সেই কখন থেকে ডেকে মরছি। ওষুধ খাবার সময় পার হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওঠ।'
মায়ের ডাকাডাকিতে গাঢ় নিদ্রার তার ছিঁড়ে গেল লুলুর। বড় হাই তুলে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল চারদিকে। তার চোখে জড়িয়ে আছে স্বপ্নের সেই লাল টুকটুকে পরী, পাহাড়, ময়ূর, প্রজাপতি, ঝর্ণা আর ফুল-ফলের বাহারি তপোবন। সেই সব দৃশ্যের কাছে বাস্তবের সবকিছু মনে হল বড় বেশি বেমানান আর মলিন।
লুলু অসহায় চোখে বিরক্তির মুখ করে বলল, 'আমার ওষুধ খেতে ইচ্ছে করে না মা।'
'তোর স্কুলের রুবী ম্যাডাম অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। তাড়াতাড়ি ওঠ মামণি।'
অবশেষে রুবী ম্যাডাম এলেন। হাসি-খুশি-স্নিগ্ধ সুন্দর মানুষটিকে দেখেই মন ভাল হয়ে গেল লুলুর। উনি এসে পাখির মতো ছটফটিয়ে গল্প গুজবে মাতিয়ে তুললেন দমবদ্ধ অসুস্থ ঘরের পরিবেশ। লুলুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে একখানা চেক হাতে ধরিয়ে বললেন,
'আর চিন্তা নেই। তোমার চিকিৎসার টাকা জোগাড় হয়ে গেছে। এখন তুমি বিদেশে গিয়ে ভালো হয়ে আসবে, কেমন।'
পেছনে দাঁড়ানো লুলুর বাবা-মা হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। আর সুখের নদীতে ভাসতে ভাসতে লুলুর চোখ বেয়ে আনন্দ-অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

ডিসেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# মিরাকল

দিলারা মেসবাহ

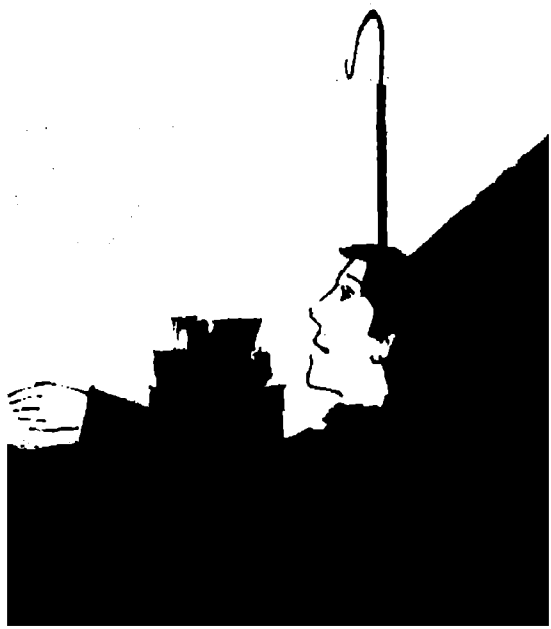

www.pathagar.org

অযুত নিযুত বছরের ঘুম ভাঙল যেন ওমরের। ভারী চোখের পাতা তবুও আধবোজা। অত্যাধুনিক হাসপাতালের সাত তলার জানালা বরাবর ভেসে গেল ওর দুর্বল দৃষ্টি। ... চারদিকে সফেদ দেয়ালজুড়ে এসির শীতলতায় নিঃসঙ্গ বাতাস থমথম করছে। এই নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গ ভিআইপি কেবিন কি ওকে আমূ- গ্রাস করবে। ডান পায়ে ভারী ব্যান্ডেজ। বিদ্যুৎলতার মতো এক ফালি তীব্র ব্যথা হঠাৎ চিন চিন করে উঠল। অপারেশন শেষে ঘণ্টাখানেক আগে ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে ওমরকে আনা হয়েছে বেডে।

ওমর বহু কষ্টে তাকায় জানালা বরাবর। হালকা দুধ-সাদা পর্দা পরিপাটি জড়ো করা দু'পাশে। স্বচ্ছ কাচের ওপারে আকাশটা দেখা যাচ্ছে ... ফিকে অপরাজিতার রঙে রাঙানো অথৈ আকাশ নাকি শিম ফুলের মতো নীল, বেগুনি সাদায় মেলামেশি। আশ্চর্য সুন্দর মেঘমালা উড়ছে। ওমর চোখ সরায় না। ... এলোমেলো ভাবনাগুলো ঐ দুধ-সাদা মেঘে সওয়ারী হয়েছে বুঝি। ... মনে হচ্ছে কে যেন মেঘের পিঠে ভর করে অথৈ ফিরোজা আকাশে সাঁতরে সাঁতরে আসছে। ... কে ... এ ... কে... ও?

কে যেন ফিস ফিস করে।

– ওমর ... আমি ... আমি ... রে তোর রাজু মামা। আসছি। তোর খুব একা একা লাগছে তো। আমি বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি রে...।

ওমর নিজের অজান্তে চিৎকার করে ওঠে।

রাজুমামা ... এসো ... এসো– এই যে আমি এখানে। ৩১২ নম্বর ভিআইপি কেবিন। একা শুয়ে আছি রাজু মামা। এত একা কি থাকতে পারে মানুষ! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে মামা।

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে হাঁফাতে থাকে। দুর্বল শরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে তের বছরের ওমরের। স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও।

বাইরের বারান্দায় হাই হিলের দ্রুত টকটক শোনা গেল। কর্তব্যরত নার্সের আগমন।

– কী ব্যাপার? কী প্রবলেম, ব্যথা করছে।

কেমন খ্যানখেনে শোনা গেল সিস্টারে কণ্ঠস্বর।

কিশোর পেশেন্টের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপন মনে অনুচ্চ কণ্ঠে সিদ্ধান্ত নেন সিস্টার,

– দাঁড়াও ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। গুডবয়ের মতো ঘুমিয়ে থাক। চেঁচামেচি কর না প্লিজ।

বলতে বলতে আলগোছে বেদনানাশক ইনজেকশন পুশ করেন সেবিকা। আবার সেই পাতানো ঘুম।

ওমরের বাবা জামিল খান প্রখ্যাত শিল্পপতি। *ঠাসা* প্রোগ্রামে তার প্রতিটি দিন সাজানো থাকে। ছেলের জন্য টেনশন আছে মনের মধ্যে গোপন দেরাজে– কিন্তু সঙ্গ দেয়া রূপকথার কল্পকাহিনী। মা মিরানা খানও ব্যস্ততার তুঙ্গে, সেমিনারে অ্যাটেন্ড করতে গেছেন আমেরিকা। ফিরতে আরো সপ্তাহখানেক লেগে যাবে। ওমরের



www.pathagar.org

অস্ট্রিয়মাইলেটিক্স হয়েছিল। বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে সাকসেসফুল অপারেশন হয়েছে। অসুখটাও ছিল প্রাইমারি স্টেজে। বিদেশী ডাক্তার ফিরে গেছেন স্বদেশে– এখন দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ড. ইমতিয়াজ দেখছেন। কোনো কিছুর অভাব নেই। কোনো কিছুর না। একেবারে ছকে ছকে মিলানো।

ওমরের পায়ের ড্রেসিং হচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানা বর্ণের গন্ধের ট্যাবলেট ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে। গম্ভীর গম্ভীর রামগড়ুড়ের ছানারা এসে যত্নের মতো ডিউটি করে যাচ্ছে। অচেনা রোবট মানব যেন সব। কী পরিপাটি বেশ-ভূষা চলন বলন। কেউ ভুলেও এক টুকরো কাষ্ঠ হাসিও হাসেন না। হয়তো বা অত্যাধুনিক ক্লিনিকের এই বিধান!

ওমরের দম বন্ধ হয়ে আসে কেন? এত নিয়ম ডিসিপ্লিন তবুও ... কেন মনে হয় সে কাঠগড়ার আসামি। গুরুতর কোনো অন্যায় করেছে। তারই প্রায়শ্চিত্ত করছে।

কেন মনে হয় ও নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না।

আজ প্রথম লিকুইড খাবে ওমর। স্যালাইনের কষ্টকর যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। গুলশানের ফ্ল্যাট থেকে সময়মতো সুদৃশ্য ফ্লাস্ক ভরে ক্লিয়ার চিকেন স্যুপ করে এনেছে বাবুর্চি লালুচাচা।

বেডের পাশে টুল টেনে বসল লালুচাচা। দ্রুত অভ্যস্ত হাতে ফ্লাস্ক খুলে বাটিতে স্যুপ ঢালল। অন্যমনস্ক গলায় বলল,

– ওমর ভাইয়া ন্যান তো দেখি স্যুপটুকু ঢকত কইর‍্যা গিল্ল্যা ফ্যালান।

ওমর দেখে বাবুর্চি চাচার কপালে সাত ভাঁজ। রাগী রাগী মুখে রুক্ষচরের মতো কাঠিন্যের আঁকিবুঁকি। ওমরের কিশোর মনের বাগানে আজ খানিক আগে কয়েকটা গঙ্গাফড়িং ওড়াউড়ি করছিল যেন। ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওমরের চোখের পাতা হঠাৎ ভিজে উঠল। মা কত দূরে। বাবা কি আজ ঘণ্টাখানিক সময় বের করতে পারলেন না? আর দিলরুবা খালা, সানজিদা ফুফু কারো হাতে সময় নেই এতটুকু। হয়তো যেদিন ওমর রিলিজ হয়ে ঘরে ফিরবে সেদিন সোনারগাঁ হোটেলে বিশাল কেক কাটবে। রোগমুক্তি উৎসব উপলক্ষে, ক্যামেরায় ক্লিক ক্লিক হবে। আন্টিরা আসবেন ফুরফুরে প্রজাপতির মতো ডানা মেলে। বাবা উপস্থিত থাকবেন। ওমরের গলা জড়িয়ে ছবি তুলবেন। মা এলে সেই সব স্মৃতিচিহ্ন দেখানো হবে জাঁক করে। মা ঝর্ণার মতো হেসে হেসে সবাইকে থ্যাঙ্কস জানিয়ে গিফট প্যাকেট তুলে দেবেন।

বিষণ্ন চোখজুড়ে কালোমেঘ। ঝড় উঠবে নাকি।

ভাঙা গলায় বলে ওঠে ওমর।

– ওফ ... স্যুপ কেউ ঢক করে গিলে ফেলে না লালুচাচা। একটু একটু করে চেখে চেখে খায়।

– ওহোরে বাবা! পাকের ঘরে আজ হাজারডা ভেজাল। সায়েবের ফরেনার ফেরেনড



www.pathagar.org

খাইবেন লানচো। ভেটকি মাচের ফেরাই করতি হবে– গুলশান বাজারে ভেটকি পায় নাই আবুইল্ল্যা। বোঝেন ঠ্যালাডা। কপালে না জানি কত গাইলগজব আছে আজকা। বুঝতে পেরেছি। আপনি যান এখন। আমি পরে খাব। ওমরের গলা অসহিষ্ণু শোনায়। সারা দুপুর দুই চোখে অবাধ্য কান্না ঝরল। ওমর যে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না নিজেকেই। স্যুপের বাটি পড়ে রইল অমনি।

সন্ধ্যায় এক দঙ্গল ডাক্তার এল। মিছিল সাজিয়ে। সবার আগে ড. ইমতিয়াজ। জুনিয়র ডাক্তার তিনজন। নার্স জনা কয়। ঢাউস ঢাউস ফাইল তাদের হাতে।

– হ্যালো? কেমন আছো আজ?

ডা: ইমতিয়াজ চশমার ফাঁকে তেরছা করে মিনিটখানেক অবজার্ভ করলেন কিশোর পেশেন্টকে। কেউ টেম্পারেচার নিল। কেউ পালস টিপল। ফটাফট টুকে নিল ফাইলে সব গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট। ডক্টর ওমরের চোখ টেনে দেখলেন। ব্যান্ডেজ করা পা-টায় একটু আঙুল ছোঁয়ালেন। তারপর এবাউট টার্ন করে মিছিলটা বেরিয়ে গেল।

ওমর জোরে একটা নিঃশ্বাস নিল। আজ সারাদিন কিছু খায়নি। সারা দুপুর কেঁদেছে বোকার মত। ভাগ্যিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের রাউন্ডে কিছুই ফাঁস হয়ে যায়নি।

ডা: রাকিব ইন্টার্নি ডাক্তার। মিছিলের শেষ প্রান্ত থেকে দলছুট হয়ে হঠাৎ আবার ওমরের বেডের পাশে এসে দাঁড়ায়। ওমরের এলোমেলো চুলগুলো আরো এলোমেলো করে দেয়। 'মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন ওমর! একা একা লাগছে না? মনে হয় দুপুরে লিকুইড খাওনি, বল ঠিক বলছি না।'

বলতে বলতে ডা: রকিব শুকনো লাল গোলাপগুলো ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দেয়। ওমর শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকায়। একি ডা: রকিবের মুখটা রাজুমামার মতো লাগছে যে, কথা বলার ভঙ্গিটি পর্যন্ত। ওমরের বুকের ভেতরটা ছলছল করে ওঠে। মনে হয় ডা: রকিবের নীল শার্ট টেনে ধরে।

– আপনি কিছুক্ষণ আমার কাছে বসুন ডক্টর। অল্প কিছুক্ষণ।

মনে মনে বিড় বিড় করে ও। বলা হয় না।

– সময় পেলে আসব। এখনত স্যারের সঙ্গে রাউন্ডে আছি। চলি ওমর। ভাল থেক কিন্তু।

চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে ওমরের,

– কী করে ভাল থাকতে হয় ডক্টর। এই চারদেয়ালের নিঃসঙ্গ নিষ্ঠুর বেডে শুয়ে।

আমি জানি না। আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যান। শিখিয়ে দিয়ে যান।

কিছুই বলা হয় না। বলা যায় না।

পরপর দুই দিন। ওমরের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে কালো থমথমে মেঘ। সেই প্রথম দিনের পলকা মেঘমালারা কোন দেশে গেছে বেড়াতে, রাজু মামা এসেছিলেন যে মেঘের পিঠে সাওয়ার হয়ে!...

রীতিমত চমকালেন ডা: ইমতিয়াজ।



www.pathagar.org

– নো নো ... ভেরি ব্যাড সাইন। এত স্লোলি রিকভারি হলে চলবে কি? হোপলেস। থমথমে মুখে দুটো নতুন দামি ক্যাপসুল লিখে দিলেন। নার্স দু'জনকে বদলিয়ে নতুন দু'জন নসার্স নিযুক্ত হলো। নার্সিং এবং অবজারভেশন আরো জোরদার হলো। শিল্পপতি জামিল খানের সবেধন পুত্ররত্ন বলে কথা। আশানুরূপ ইমপ্রুভ করছে না কেন। রহস্যটা কোথায়! ঈষৎ চিন্তিত দেখায় বিশেষজ্ঞের মুখ। মিছিলের জুনিয়র ডাক্তারবৃন্দের মুখও ঈষৎ চিন্তান্বিত।

আট দিনের মাথায়ও ওমর অকারণ বিষাদবোধের জলজ্যান্ত প্রতীক হয়ে কাশফুলের মতো ধবধবে বেডে শুয়ে থাকে। ওর চার পাশে নিঃসঙ্গ বাতাস নেচে বেড়ায়। জানালায় মেঘমালা। অপলকে দুর্বল দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় ওমর। মামা কি আসছেন? ... চুলে বিলি কেটে দিতে। হাতের আঙুল ফোটাতে। রাজু মামা নাকি ঐ দূরের আকাশের নক্ষত্র হয়ে গেছেন? কী করে আসবেন ওমরের দুঃসহ নিঃসঙ্গতা কাটাতে। মাঝে মধ্যে ওমরের কী যে হয়। সবকিছু গুলিয়ে যায়। ... রাজুমামাকে এতবেশি প্রয়োজন ছিল ওমরের। ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়। রাজু আজ আর এই তুচ্ছ পৃথিবীর কেউ নন। পরলোকে চলে গেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিলেন, তাই দিন-দুপুরে প্রকাশ্য জনপদে তার বিশাল সমুদ্রের মতো মমতাময় হৃদয় ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। আজও ওমরের চোখে সেই রক্তের ধারা শুকিয়ে যায়নি।

দরজা ঠেলে ঢোকেন ডা: রকিব। হাতে একগোছা টকটকে গোলাপ। খানকয় প্যাকেট করা সদ্য কেনা বই। ওমর ক্লান্ত চোখ মেলে তাকায়। এক ঝলক বিস্ময়ভরা আনন্দ যেন লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ছে ৩১২ নম্বর কেবিনে।

– ওমর কেমন আছ ভাই?

খুশি ছড়িয়ে পড়ে নিরানন্দ কেবিনটার আনাচে কানাচে।

– এই মুহূর্তে বেশ চাঙ্গা লাগছে রাজুমামা। বলেই খানিক দ্বিধান্বিত হয় ওমর।

– না মানে আপনাকে আমার রাজু মামার মত লাগছে। কিছু মনে করবেন না ডাক্তার। প্লিজ...।

– আরে ... আরে .... আমি তোমার রাজু মামাই। আমি বরং খুশি হয়েছি। আজ থেকে আমি রোজ তোমাকে খানিকটা সময় দেব, কেমন? ওমরের ছোট্ট দুর্বল হৃৎপি- আনন্দে দোল খায়। মনে মনে আল্লাহর কাছে খুব মিনতি করে কিছু চাইলে তা কি এভাবেই মিলে যায়! ওমরের ম্লান সুন্দর মুখে বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়ায় কী অপরিমেয় স্নেহের পিপাসা ডা: রকিব তা আবিষ্কার করেছেন সেই প্রথম দিনেই। নানা নিয়মের বেড়া ডিঙাতেই এত দেরি।

পেশেন্টের রুগ্ণ আঙুলগুলো নিজের আঙুলে মিলিয়ে মৃদু চাপ দেন ডা: রকিব। ওমরকে খুব কাছের আপনজন বলে মন হয়।

– উঠে বস ওমর। তাড়াতাড়ি ভালো হতে হবে আমাদের। তাই না? সাহস চাই– উইলফোর্স চাই।



www.pathagar.org

ওমর নড়ে চড়ে। উঠতে চায় পারে না। দরজা ঠেলে লালুচাচা ঢোকে। হাতে চকচকে টিফিন ক্যারিয়ার নরম ভাত বাচ্ছা মুরগি এনেছে বুঝি। গতকালতো ছয় চামচ কোনো রককমে মুখে দিয়ে একাগাদা ওষুধ গিলেছিল ওমর। নবনিযুক্ত নার্সের হাত থেকে। আজ নতুন রাজুমামার হাতে অনেকটা ভাত খেল ওমর। কী যত্নে লেবু চিপে ঝোল ঢেলে চামচে নেড়ে মুখে তুলে দিচ্ছিলেন ডা: রকিব। প্রথমবার খুব লজ্জা করছিল। পরে গ্রাসে অমৃতের স্বাদ। লোভ সম্বরণ করা সম্ভব হয়নি কিশোরের। কত দিন পর এমন তৃপ্তির মধ্যাহ্নভোজ।

– না খেলে মনে প্রাণে সুস্থ হতে না চাইলে সুস্থ হবে কী করে বলতো ওমর? নিজেকে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে নেই ওমর।

লাল গোলাপগুলো সাজাতে সাজাতে নরম গলায় বললেন ডা: রকিব।

ওমর উঠে বসেছে। মামার লেখা নির্বোধ বিবৃতির কয়েক পঙ্‌ক্তি খুব মনে পড়ছে। অনুচ্চ উচ্চারণে আবৃত্তি করে বসে,

মানুষের চেয়ে বটবৃক্ষ ভাল।
মানুষের চেয়ে ভাল নিধুয়া পাথর
মানুষের চেয়ে ভাল লিলুয়া বাতাস।

ওমরের গলা আবেগে কাঁপছে।

– অ্যাঁ ওমর তুমি কি তাই বিশ্বাস কর?

– করতাম। আজ আর করি না। মামা কবিতা লিখতেন। ওটা মামার লেখা। মামা বোধহয় তার ভালমানুষীর জন্য অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। ভাল মানুষের হদিস পাওয়ার আগেই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিতে হয়েছে তাকে। বেঁচে থাকলে...

ডা: রকিব মনে মনে বিস্ময় মানেন। কিশোরের ভাবনার গভীরতায়। কিশোর উপন্যাস 'রায়হানের রাজহাঁসে' ততক্ষণে ওমরের মন উড়ে বেড়াচ্ছে। ওকে আজ প্রাণবন্ত সুখী ওমর বলে মনে হচ্ছে। ডা: রকিব বারবার আত্মবিশ্বাসের রঙ দেখছিলেন ওর চোখে মুখে।

পরপর তিন দিন। ওমরের রাজু মামা ঢোকেন নিঃশব্দে। আশ্চর্য রিকভারির সরজমিনে পর্যবেক্ষণে হৃদয়বান মানুষটি আপ্লুত হন। প্রতিদিন ম্লান খোলস বদলে একটু একটু করে প্রাণবন্ত হচ্ছে ওমর। ডা: রকিব দুপুরে প্রায়ই ভাত খাইয়ে যান।

আনন্দে আতসবাজির মত জ্বলে ওমরের ডাগর চোখ। ওর বন্ধু জগলুল, হায়দর, অপূর্ব, তিতুর গল্প শোনে। বাবার কড়া নির্দেশে ওরা ক্লিনিকে আসতে পারছে না। ইনফেকশনের ভয়। ওমরের ছোট্ট বুকে নিঃসঙ্গতা যে ভয়াবহ ইনফেকশন তৈরি করেছে তা কারো চোখে পড়ে না। না মি. খানের না বিশেষজ্ঞ ড. ইমতিয়াজের। চারদিনের মাথায় ওমরের বেডের পাশে এক দঙ্গল পঙ্গপালের মতো মিছিলটি সারি বেঁধে দাঁড়ায়। ড. ইমতিয়াজের চোখেমুখে খেলা করে তীব্র আত্মবিশ্বাস। তিনি স্পষ্টতই আবিষ্কার করেন রিকভারির রঙে রাঙানো সেই হালছাড়া কিশোর মুখটি। বাঁচা



www.pathagar.org

গেল। শিল্পপতি মি. খানের সামনে বড় গলায় খবরটি পরিবেশন করা যাবে। পরিপাটি আনন্দের এক রকম গর্বিত ভাব ক্লিনসেভড বিজ্ঞ চোয়ালে ফুটে ওঠে। জুনিয়র ডাক্তারের দলটিও দারুণ সারপ্রাইজড! ডা: ইমতিয়াজের ট্রিটমেন্ট বলে কথা। গতকাল ব্যান্ডেজ খুলে হালকা লোশন মাখিয়ে রাখা হয়েছে। মিরাকল ব্যাপার স্যাপার। টেম্পারেচার নরমাল। পালস পারফেক্ট। কমপ্লিট রিকভারি। কিশোরের দুই গালে স্বাস্থ্যের লালিমা। দুই চোখে চকচকে আনন্দ। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ৩১২ নম্বর কেবিনের নিঃসঙ্গ বাতাসে তোলপাড় তুলে হাসলেন পৌরুষদীপ্ত হাসি। চিবিয়ে চিবিয়ে এক টুকরো ধন্যবাদ জানালেন নবনিযুক্ত নার্স দু'জনকে। তাদের অভাবনীয় নার্সিংয়ের জন্য। এবং জুনিয়র ডাক্তারদের ত্বরিত এবং যথাযথ অবজারভেশনের জন্য। ওরাও যথেষ্ট সৌজন্য সহকারে তাদের স্যারকে কংগ্রাচুলেট করলেন। সব কৃতিত্বই মূলত তারই পাওনা! ওর হাতযশেই সম্ভব এমন মিরাকল রিকভারি।

আনন্দ সভার সমাপ্তি পর্বে ডা: রকিব একবার উঁকি দিলেন দরজায়। জ্বল জ্বল করে উঠল ওমরের চোখ জোড়া।

– রাজুমামা। কখন থেকে তোমাকে খুঁজছি আমি। এস মামা।

বিড় বিড় করে ওমর। হাত নাড়া বার দুই। ডা: রকিব আড়াল থেকেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে যান একটু পরে ঢুকবেন বলে।

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। ওমরের তেলেগু ভাষায় কথাগুলো এক বর্ণও বোঝে না কেউ। মিনিট খানেক পর দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যান বিজ্ঞ চিকিৎসক। পেছনে অবিকল মিছিলটি... দরজা পেরোয় মিছিলটি। সরীসৃপের মতো।

৩১২ নম্বর কেবিনটি এখন কোলাহলমুক্ত। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজুমামা থুড়ি ডা: রকিব। হাতে আজ একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। কাশফুল সাদা এপ্রোন দুলছে যেন। হাস্যমুখ মানুষটির স্নেহের ভাষা পড়তে পারে ওমর। মনে হয় দরজাজুড়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী মানুষটি বেহেশত থেকে নেমে আসা ফেরেশতা! ওরই মমতার মলম জড়ানো আঙুলের ছোঁয়ায় আরোগ্য হয়েছে ওমরের দেহ মনের সব ক্ষত।

ওমরের দুই ঠোঁট কাঁপছে কৃতজ্ঞতায়। ও দু'হাত হাত ইশারা করে। নির্ভার আনন্দে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে ফেরেশতা। অলীক আলোয় ভরে গেছে ৩১২ নম্বর কেবিন।

ডিসেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# ঝড়

এ কে আরদাত

তরজমা : হোসেন মাহমুদ

www.pathagar.org

আগে থেকেই মেঘ জমতে শুরু করেছিল আকাশে। এতক্ষণে তা বেশ কালো হয়ে এসেছে। পশ্চিমের দিগন্ত রেখার জমাট বাঁধা মেঘে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমক দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে পর্বতমালার আড়ালে। তার পরপরই ভেসে আসছে মেঘে মেঘে সংঘর্ষের জোর আওয়াজ। মানুষ তো দূরের কথা, কোথাও কোনো প্রাণীরও সাড়া মেলে না। মনে হচ্ছে, একটি ঝড় ঘনিয়ে আসছে। জীবজন্তুরা মানুষের মতো বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। মানুষের মত বেঁচে থাকার নানাবিধ কৌশলও তারা জানে না। কিন্তু প্রকৃতিগত ক্ষমতার গুণে আগে ভাগেই তারা বিপদের আগমন টের পায়। তৎপর হয়ে ওঠে নিজেদের জীবন বাঁচাতে। তাই ঝড় বৃষ্টি নামার আগে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসতে দেখলেই তারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে।

জেবা আকাশে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে ভীত হয়ে ওঠে। জুটকোর উদ্দেশে বলে

*এক:*

– ঝড় আসছেরে ভাই, চুপ করে বসে থাক। ভয় করছে আমার। জুটকো জেবার ছোটভাই। ওরা দু'জন মাত্র গতকালই এখানে এসে পৌঁছেছে। চেটনিক জানোয়াররা অর্থাৎ সার্বসৈনস্যরা ওদের গ্রামে নির্মম হত্যাকা- চালিয়ে চলে। যাবার পর জুটকোকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে জেবা। সার্ব পশুরা ওদের আব্বা ও বড়ভাইকে গুলি করে মেরেছে, ধরে নিয়ে গেছে মা আর বড় বোন ফাজিলাকে। ওরা দু'জন তখন চিলেকোঠায় গিয়ে পালিয়ে ছিল। চেটনিকরা কেন যেন ওদের আর খোঁজেনি। সৈন্যরা যতক্ষণ তা-ব চালালো ততক্ষণ আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে বলেছিল ওরা। একসময় সার্বরা চোখের আড়াল হতেই ভীষণ ভয় তাড়া করে জেবাকে। দশ বছরের জেবা সাত বছরে ছোটভাই জুটকোকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে ছুটতে শুরু করে। ছুটছে তো ছুটছেই। কোথায় যাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে কিছুই জানত না ওরা। জেবার শুধু মনে হচ্ছিল আব্বা ও ভাইকে হত্যার পর সার্ব সৈন্যরা ওদেরকেও হত্যা করার জন্য খুঁজে ফিরছে।

গতকালটি জেবার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে।

**দুই.**

সার্ব সৈন্যদের একট দল ঢুকে পড়েছিল তাদের বাড়িতে। ওরা সবাই তখন জড়োসড়ো হয়ে বড় ঘরের মধ্যে বসে। একজন সৈনিক লাথি মেরে বন্ধ দরজা খুলে ফেলে ঢোকে ভেতরে। তার আঙ্গুল হাতে ধরা এক-৪৭ রাইফেলের ট্রিগারে। প্রথমে জেবার বড় ভাই সতের বছর বয়সী আলিজার দিকে রাইফেল তাক করে সে। সন্তানকে বিপদগ্রস্ত দেখে স্নেহময় পিতা জামাল ইসমাইলোভিচ তাকে আগলে দাঁড়ালো, সার্ব পশুটি এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে গুলি করে। সাথে সাথে তিনি লাশ হয়ে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। আব্বা বলে চিৎকার করে পিতার দিকে এগোতেই সৈন্যটি জেবার ভাইকেও গুলি করে। মুহূর্তের মধ্যে সেও পরিণত হয় মৃত মানুষে। মা ও বোনের মর্মভেদী কান্না ও হাহাকার



www.pathagar.org

তাদের অতিপ্রিয় আব্বা ও ভাইয়ের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ শরীর, আজরাইলের মত সশস্ত্র সার্ব সৈন্য– সব মিলিয়ে জেবার মাথার মধ্যে যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। একছুটে পাশের ঘর হয়ে চিলেকোঠার সিঁড়ির কাছে পৌঁছে যায় সে। সার্ব সৈন্যটি মা ও বোনকে অস্ত্রের মুখে ঘর থেকে বের করে নিচ্ছিল। জেবা চিলোকোঠায় ওঠে এককোণে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। আর তখনি দেখে তার সাথে জ্লাটকোও উঠে এসেছে। একটু পরই সব শব্দ থেমে যায়। জেবা বুঝতে পারে সার্বরা মা ও বোনকে ধরে নিয়ে চলে গেছে। জ্লাটকোর হাত ধরে দ্রুত পায়ে নেমে আসে সে। রাস্তায় উঠে দু'জন ছুটতে শুরু করে।

আতঙ্কগ্রস্ত জেবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ছোটার মধ্যেই পর পর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে তার পেছনে জ্লাটকো আছে কি না। এই পৃথিবীতে এখন জ্লাটকো ছাড়া তার আর কেউ নেই। আব্বা-ভাই-মা-বোন কেউ নেই। বুক ফেটে কান্না আসে তার। একবার মনে হয় চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। ছোটা বন্ধ করে থেমে পড়ে জেবা। তার দেখাদেখি ছোট ভাইটিও। হাঁফাতে হাঁফাতেই হাত বাড়িয়ে ছোট ভাইয়ের মাথায় মুখে শরীরে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে চলে জেবা। তারপর জ্লাটকোকে জড়িয়ে ধরে সে ভেঙে পড়ে কান্নায়। তবে শিগগিরই সে সামলে নেয় নিজেকে। এখন কান্নার সময় নয়। নিজের চোখ মুছে ভাইয়ের চোখও মুছে দেয় সে। তারপর শক্ত করে চেপে ধরে তার হাত। কে জানে, সার্ব সৈন্যরা এদিকেও আবার আসছে কি না। এতটা পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দু'জনই। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়া মানেইতো সার্বদের হাতে ধরাপড়া। না, এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে ওঠে জেবা। ছোট ভাইটিকে বাঁচাতে হবে। নিজে ছোটা শুরু করে জ্লাটকোর উদ্দেশে বলে :

দৌড়া ভাই, দৌড়া।

কিন্তু কোথায় যাবে জেবা? কার কাছে যাবে? দু'জন শুধু ছুটছে আর ছুটছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটছে তারা। যে নির্মম নৃশংস ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করেছে, প্রাণপণে দৌড়ে সে স্থানটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে জেবা। পুরো ঘটনাটিই মন থেকে মুছে ফেলতে চায় সে। মাত্র দশ বছর বয়সেই এই পৃথিবীটা তার কাছে অচেনা, নিষ্ঠুর রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। জেবা এখন প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে ছোট ভাইকে নিয়ে। জানে না কোথায়? বিশ্ব মানবাধিকার সনদ, তাবৎ হৃদয়বান লেখক, সহানুভূতিশীল দার্শনিক ও মানবপ্রেমী কবিকুলে পূর্ণ এবং আইনের চোখে সকল মানুষ সমান, এই আপ্তবাক্যের বুলি আউড়ানো পৃথিবীর পথে সর্বৈব হারোনো জেবা ও জ্লাটকো শুধু ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। সীমাহীন এক আতঙ্ক ও অসহায়তা তাদের তাড়া করছে।

জেবা ও জ্লাটকো যে আজ থেকে এতিম হয়ে গেল, এ কথা জেবার মনে একবারও জাগে না। মা ও বড় বোন ফাযিলার সাথে আর কখনো দেখা হবে কি না সে চিন্তাও তার মনে আসে না। এখন জেবার একমাত্র চিন্তা বাঁচতে হবে। সার্ব সৈন্যরা যেকোনো মুহূর্তে তাদের ধরে ফেলতে পারে। তবে নিজের চেয়ে জ্লাটকোর জন্যই তার বেশি



www.pathagar.org

চিন্তা। এই প্রথমবারের মত তার কাঁধে দায়িত্বের বোঝা চেপে বসেছে যার ওজন তার বয়সের চাইতে অনেক অনেকগুণ বেশি। জেবার মনে হয় এক লাফে সে যেন বিশ বছর বয়সে পৌঁছে গেছে। সে বিড় বিড় করে বলতে থাকে– জ্লাটকো। দৌড়া ভাইটি আমার দৌড়া। বাঁচতে হবে। সার্ব পশুরা আমাদের পেলে মেরে ফেলবে। হঠাৎ জেবার মনে হয় তার দৌড়ানোর শক্তি বুঝি ফুরিয়ে আসছে। মনে হয় দু'ঘণ্টা, চার ঘণ্টা নয়- অনন্তকাল ধরে সে দৌড়ে চলেছে। আর কত দৌড়াবে সে।

জেবা ও জ্লাটকো জানে না, যে পথে তারা দৌড়ে চলেছে সে পথ গিয়ে মিশেছে একটি ইয়ুথ লজে। বনের মধ্যে লজটি। সাবেক যুগোশ্লাভিয়া সরকার যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ ধরনের ইয়ুথ লজগুলো নির্মাণ করেছিল কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ নয় এমন সাধারণ নাগরিকরাও অবসর বিনোদনের জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারত নামমাত্র ভাড়া দিয়ে। এগুলোতে সবচেয়ে বেশি ভিড় জমাতো অভিযাত্রী ও পর্যটকরা। তবে এক সপ্তাহের বেশি লজগুলোতে থাকার অনুমতি কাউকেই দেয়া হতো না।

এক সময় ইয়ুথ লজটির সামনে পৌঁছে যায় ওরা দু'জন। লজটি জনমানবহীন মনে হচ্ছিল। ঘরগুলোতে দরজা বা জানালো কিছুই ছিল না। জেবা ও জ্লাটকো অনায়াসেই ভেতরে ঢুকে পড়ে। লজের সব কিছু এলোমেলো হয়ে আছে। সেলারের ডানদিকের কোণে একটি বিশাল হিটার সিলিন্ডার দেখতে পায় জেবা। এর পেছনটা লুকিয়ে থাকার জন্য চমৎকার স্থান হতে পারে, সে ভাবে। ভীষণ ঠা-া সেলারের মেঝে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সিলিন্ডারের পেছনে গিয়ে বসে পড়ে জেবা। জ্লাটকোকে ইঙ্গিত করে তার কোলের ওপর বসে পড়তে। জ্লাটকো এসে বসে পড়ে তার কোলে। নিবিড় স্নেহে ভাইয়ের মাথাটা বুকে টেনে নেয় জেবা। যেমন করে নিতো তাদের মা।

বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যায়। জেবার বুকের সাথে মিশে আছে জ্লাটকো। কে জানে, হয়ত মায়ের কথাই ভাবছে সে। সবার ছোট বলে সে ছিল সবচেয়ে বেশি আদরের। আজ তাদের জীবনে যে কি সর্বনাশ ঘটে গেল, কি তার পরিণতি, জ্লাটকো এখনো তেমন কিছু বুঝতে পারেনি। জেবাই কি বোঝে? তার চোখ গড়িয়ে পড়তে থাকে পানি। এখন কী করবে সে ভেবে পায় না।

এক সময় ফিস ফিস করে বলে ওঠে জ্লাটকো,

– আচ্ছা চেটনিকরা কি আব্বা আর আলিজাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে?

জ্লাটকোর কথায় ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে জেবা। জ্লাটকো এখনো বুঝতে পারেনি যে আব্বা আর ভাই লাশ হয়ে গেছে। আর কোনোদিনই তারা ফিরে আসবে না। কিন্তু ভাইকে এখন কি জবাব দেবে সে! মিথ্যা কথা বলা যায় যে হ্যাঁ, আব্বা আর ভাইকে ওরা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কিন্তু লাভ তাতে? বেঁচে থাকলে একদিন সত্য তো জানবেই জ্লাটকো। কিন্তু সত্যটাই বা সে বলে কি করে? শেষে উত্তর দেয় জেবা,

– হয়তো নিয়ে গেছে। আবার নাও নিতে পারে। ওরা তো মানুষ নয়, মানুষ নামের পশু।



www.pathagar.org

জ্বাটকো আবার জিজ্ঞেস করে,

– চেটনিকরা মা আর ফাজিলাকে নিয়ে গেল কেন? জেবা ভেবে পায় না এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে। কোনো জবাব তার জানাও নেই। আবার দু'চোখ পানিতে ভরে ওঠে তার। আব্বা ও ভাইকে চেটনিক সৈন্যটা গুলি করে মেরে ফেলার পর মা আর বোন কাঁদছিল চিৎকার করে। মা আব্বা আর ভাইয়ের লাশের কাছে ছুটে যেতে চাইছিল বারবার। কিন্তু তার চুল টেনে আটকে রাখছিল সৈন্যটা। এ মুহূর্তে জেবার ইচ্ছা করে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে। কিন্তু জ্বাটকো এবং তার প্রতি দায়িত্বের কথা মনে করে কান্না রোধ করে সে।

– আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে আর খুব শীত করছে। চল, আমরা বাড়ি যাই। এখানে আর থাকব না। জ্বাটকোর এ কথা শুনে আর ঠিক থাকতে পারে না জেবা। তার জন্য এটা ছিল অনেক বেশি। দশ বছরের একটি মেয়ে আর কত সহ্য করতে পারে? ভাইকে জড়িয়ে ধরে জোরে কেঁদে ওঠে সে। তার সাথে জ্বাটকোও।

চমকে ওঠেন ডাক্তার দোদো রেজাকোভিচ। নিজের রুম থেকে দু'টি কচি গলার জোর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন তিনি। কি ব্যাপার। ফ্ল্যাশ লাইটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। সেলার থেকে কান্নার শব্দ আসছে। ভেতরে ঢুকে আলো ফেলেন তিনি। কাউকে চোখে পড়ে না। এগিয়ে যান হিটার সিলিন্ডারের দিকে। ডাক্তার রেজাকোভিচ একজন সার্জন। সার্ব সৈন্যদের কারণে তার চাকরি করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। গত সাত মাসে এমন একটি দিন যায়নি যেদিন তিনি ভয়াবহ নির্মম ঘটনা দেখেননি। সে দিনগুলোতে তিনি যা ঘটতে দেখেছেন তা একজন সাধারণ মানুষের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে মাসখানেক আগে। সার্ব সৈন্যদের একটি দল বারো বছরের একটি বালিকাকে তার কাছে নিয়ে আসে। মেয়েটিকে পাইকারিভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। তার প্রচ- রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। এমনই অবস্থায় যে কিছুতেই রক্ত বন্ধ করতে পারলেন না তিনি। আরো পারলেন না তার দুঃসহ যন্ত্রণা বিন্দুমাত্র লাঘব করতে। কেউই পারত না। তবে তার কারণ শুধু এই নয় যে অপারেশনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, পেনিসিলিন বা এ্যানেসথেশিয়া তার কাছে ছিল না। আসল কারণ হলো মেয়েটি ইতোমধ্যে সকল চিকিৎসার উর্ধ্বে চলে গিয়েছিল। তখন একটি মাত্র কাজই করতে পারতেন তিনি– একটি ইনজেকশন দিয়ে তার মৃত্যুটাকে দ্রুত করা যেত।

– জানোয়ারের দল।

– দুঃসহ কষ্ট ও ক্রোধে জ্বলতে থাকা ডাক্তার রেজাকোভিচ সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দ দু'টি উচ্চারণ করেছিলেন।

চোখের পলকে একজন সার্ব সৈন্য একে-৪৭ রাইফেলের বাঁট দিয়ে দাড়াম করে আঘাত করে তার চোয়ালে। প্রচ- আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন ডাক্তার। তারপর শুরু হয় নির্মম প্রহার। জ্ঞান হারানোর আগে ডাক্তার সৈন্যটির জান্তব চিৎকার



www.pathagar.org

শুনতে পেলেন।

– বেজন্মার দল, তোদের মুসলমানদের সবগুলো মেয়ের পেটে আমাদের বাচ্চা পয়দা করব বুঝলি। আমাদের সন্তানগুলো পেটে ধারণ করতে বাধ্য করব তাদের। তা যদি না হয়, তোদের মেয়েদের বাচ্চা পয়দা করার অবস্থায় রাখব না। দেখে নিস। ডাক্তার রেজাকোভিচের মুখে একদলা থু থু ছিটিয়ে বেরিয়ে যায় সৈন্যটি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন ডাক্তার। পরে যখন চেতনা ফিরে এল, আর থাকেননি সেখানে। এ জায়গাটায় এসে উঠেছেন। আর হ্যাঁ, তার চলে আসার আগেই মারা গিয়েছিল মেয়েটি।

ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় সিরিন্ডারে পেছনে লুকিয়ে থাকা দু'টি ভয়ার্ত কচি মুখ দেখতে পান ডাক্তার রেজাকোভিচ। সীমাহীন বিস্ময়ে দু'চোখ কাপালে ওঠার অবস্থা হয় তার। এতটুক দু'টি বাচ্চা এখানে এলো কী করে? ইয়ুথ লজের ধারে কাছে তো কোনো গ্রাম নেই। যা হোক, ডাক্তার বুঝতে পারেন, শিশু দু'টি তাকে দেখে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। ওদের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারেন তিনি। কোমল গলায় বলেন,

– ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। তোমরা এখানে নিরাপদ।

কিন্তু রেজাকোভিচের কথায় তাদের ভয় দূর হয়েছে বলে মনে হলো না। বরং ভাই-বোন পরস্পরকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। আসলে ডাক্তার লোকটি যে কে বা তিনি কি চান তা ওরা জানে না। জানে না– তিনি কেন এখানে এসেছেন। ওদের অবস্থা বুঝতে পেরে গভীর সহানুভূতিতে তার মন ভরে ওঠে। তিনি ওদের আশ্বস্ত করতে চাইলেন,

– বাচ্চারা তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না।

তার কথা শুনে কাঁদতে শুরু করে জেবা। সে অবস্থায়ই বলে,

– তুমি আমাকে নিয়ে যাও। কিন্তু আমার ভাইটিকে মেরো না। আমরা কোনো অন্যায় করিনি, বিশ্বাস করো। আমরা ঠা-ায় খুব কষ্ট পাচ্ছি। ক্ষিদে পেয়েছে খুব। অনেকক্ষণ দৌড়েছি। আমরা কিছু চাই না। শুধু একটু ঘুমাবো। তারপরই চলে যাব। তুমি দেখো, আমাদের কাছে কিছুই নেই। তুমি আমার ভাইটিকে মেরো না।

একটানা অসংলগ্নভাবে এতগুলো কথা বলে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে জেবা।

জেবার আকুতি ও কান্না দেখে ডাক্তার স্তব্ধ বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা এতই ভীত হয়ে পড়েছে যে তাকে একটুও বিশ্বাস করতে পারছে না। ওদের দিকে আলো ফেলেন তিনি। দু'জনের গায়ের জামা ছিঁড়ে গেছে। ওরা যখন প্রাণের ভয়ে বনের মধ্য দিয়ে দৌড়াচ্ছিল তখন গাছের ডাল পালার সাথে খোঁচা লেগে কখন জামা ছিঁড়ে গেছে তা নিজেরাও জানে না। শরীরে দু'চার জায়গা কেটে ছিঁড়েও গেছে। সে সব জায়গা থেকে তখনো রক্ত ঝরে চলেছে। দু'জনের কারো পায়েই জুতা নেই। ওদের জন্য গভীর মমতা অনুভব করেন ডাক্তার। দরদভরা গলায় বলেন–



www.pathagar.org

– কেঁদো না, কেউ তোমাদের ক্ষতি করবে না। আমাকে ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের বন্ধু। আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই, সত্যিই।

শিশু দু'টি যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়। জেবার মনে হয়, মানুষটিকে বিশ্বাস করা যায়। তার পোশাক চেটনিকদের মত না, হাতে কোনো অস্ত্রও নেই। তবে সে ভেবে পেল না যে লোকটি তাদের সন্ধান পেল কী করে। যা হোক, তার কথায় বিশ্বাস করে ভাইকে শান্ত করার চেষ্টা করে জেবা।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গে। জেবা দেখে ডাক্তার ইতোমধ্যেই ওদের জন্য খাবার তৈরি করে ফেলেছেন। তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। খুব ইচ্ছে করে ডাক্তারের কাছে খাবার চাইতে। কিন্তু লজ্জায় তা পারে না। ডাক্তার জেবার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন ভালো ঘুম হয়েছে কি না। তারপর বললেন,

– আমার নাম দোদো রেজাকোভিচ। একজন ডাক্তার এবার তোমার নাম বলো তো খুকি।

– আমি জেবা ইসমাইলোভিচ। আর এ আমার ছোট ভাই জ্লাটকো ইসমাইলোভিচ। তুমি কি ডাক্তার? যারা হাসপাতালে রোগী দেখে তাদের মত?

– হ্যাঁ, তাই। আর সে কারণেই আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের ক্ষতগুলোর চিকিৎসা করা দরকার।

ডাক্তারে কাছে থেকে জেবা জানতে পারে তারা এখন স্রেব্রেনিসার সাত মাইল দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে। আর তাদের গ্রাম জুবলিজা থেকে এ জায়গাটির দূরত্ব চৌদ্দ মাইল। ডাক্তার ইতোমধ্যে বসনিয়া রেডিওর খবরে জুবলিজা গ্রামের নির্মম পরিস্থিতির কথা জেনে গেছেন। গ্রামের সকল মানুষকে হয় হত্যা করেছে না হয় ধরে নিয়ে গেছে চেটনিকরা। আর সকল মহিলা ও বালিকাকে নিয়ে তারা তুলেছে ধর্ষণ শিবির।

*তিন.*

আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যে কোনো সময় ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হতে পারে। এ সময় কাছেই কোথাও প্রচ- শব্দে বাজ পড়ে।

– বজ্রপাতের এত ভয়াবহ শব্দ আমি আগে কখনো শুনিনি বললেন ডাক্তার।

জ্লাটকো বড়দের মত গম্ভীর মুখে বলে,

– আল্লাহ মানুষের ওপর রেগে গেছেন। সে জন্যই তো আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় আর বজ্রপাত হয়। এ সময় জেবা চেঁচিয়ে বলে,

– দেখ জ্লাটকো ঝড় আসার আগেই পিঁপড়াগুলো একটা বড় মরা বোলতাকে তাদের বাসায় টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে।

ডাক্তার রেজাকোভিচের দিকে তাকিয়ে সে বলে,

– আচ্ছা ঝড় আসার ব্যাপারটা ওরা আগে থেকে টের পায় কী করে?



www.pathagar.org

– এটা সৃষ্ট জীবজন্তুর প্রতি আল্লাহর অসীম কুদরত। আল্লাহ ওদের এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যে কারণে আগে থেকেই ওরা ঝড়ের আগমন বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপদ আসন্ন হলেও বুঝতে পারে ওরা।

পিঁপড়াগুলো বোলতাটিকে টেনে তাদের বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর আগের গুলোর চেয়ে রঙের দিকে থেকে উজ্জ্বল ও দ্রুতগতি একদল পিঁপড়ার আবির্ভাব ঘটে। তারা আগের পিঁপড়াগুলোর ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। জ্বাটকো এ অন্যায় দেখে খেপে ওঠে। মেঝেতে পড়ে থাকা একটি পাথরের টুকরো নিয়ে সে বড় পিঁপড়াগুলোর দিকে ছুড়ে মারে। মুখে বলে,

– খারাপ, খুবই খারাপ এটা।

ডাক্তার জ্বাটকোর কা- দেখে হেসে ফেলেন। তারপর তার উদ্দেশে বলেন,

– জ্বাটকো এ দিকে দেখ। একটা মাকড়সা ঝড় আসার আগেই নিজেকে কিভাবে গুটিয়ে নিচ্ছে। এটা এখন গিয়ে আশ্রয় নেবে কোনো ফাঁকফোকরে নয়তো কোনো গাছের পাতার নিচের দিকে। জানালার বাইরে একটি গাছের দিকে আঙুল তুলে দেখান তিনি, হয়ত ওটাতেও আশ্রয় নিতে পারে মাকড়সাটা।

জ্বাটকোর একদৃষ্টে পিঁপড়াগুলোর দিকে চেয়েছিল। সেগুলো এখনো পরস্পরের সাথে লড়াই করে চলেছে। কালো ও ছোট পিঁপড়াগুলো লড়ে চলেছে তাদের চেয়ে রঙের দিক দিয়ে উজ্জ্বল ও আকারে বড় পিঁপড়াগুলোর সাথে যারা তাদের বয়ে আনা খাবার কেড়ে নিতে চাইছে। তবে আকারে ছোট হলেও তারা ভালই লড়ছিল। সবচেয়ে প্রশংসনীয় হচ্ছিল, যে কোনো মূল্যেই হোক তাদের সংগ্রহ করা খাবার তারা কেড়ে নিতে দেবে না।

ডাক্তার রেজাকোভিচের চোখ যায় জেবার দিকে। ছোট ভাইটির প্রতি তার মাতৃসুলভ স্নেহ ও দৃঢ়তা তাকে মুগ্ধ করেছে। এ সময় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করা ধর্ষিতা মেয়েটির কথা মনে পড়ে যায় তার। তার যেন মনে হয়, সেই মেয়েটি ছিল জেবার মতই একটি মিষ্টি চেহারার মেয়ে।

এ সময় জেবাকে ডাকে জ্বাটকো,

– জেবা দেখ, বড় পিঁপড়াগুলো ভারি বদমাইশ। ছোটগুলো ওদের সাথে পেরে উঠছে না। আচ্ছা আমি ছোট পিঁপড়াগুলোকে সাহায্য করব?

– তুই ওদের সাহায্য করবি কিভাবে? দেখছিস না, বড় পিঁপড়াগুলো সংখ্যায় কত বেশি?

এ মুহূর্তে আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করে। ফোঁটাগুলো বেশ বড় ও ভারী। জেবা ও জ্বাটকোকে লক্ষ্য করে ডাক্তার বলেন,

– ঝড় বৃষ্টি একসাথে এসে গেল বলে মনে হচ্ছে। যাক, ভাগ্য ভাল যে আমাদের একটি আশ্রয় আছে। সহজে বিপদ ঘটার ভয় নেই।

পকেট হাতড়ে কয়েকটি চকলেট বের করে আনেন তিনি। কয়েকদিন আগে



www.pathagar.org

স্রেব্রেনিসায় গিয়ে জাতিসংঘের লোকদের কাছ থেকে রিলিফ হিসেবে এগুলো পেয়েছিলেন তিনি। জাতিসংঘের কর্মীরা তাকে চকলেটগুলো দিয়ে বলেছিল,
– নিয়ে যান, বাচ্চারা এগুলো খুবই পছন্দ করে।
– কথা না বলে হাত পেতে নিয়ে এসেছিলেন তিনি সেগুলো। নিজের খেতে ইচ্ছে হয়নি তাই পকেটেই রয়ে গেছে। কে জানত, আজ দুটি মাসুম শিশুর হাতে এভাবে চকলেটগুলো তুলে দিতে পারবেন তিনি যারা প্রকৃতই এগুলো পছন্দ করে।
– জেবা চকলেটগুলো নেয়। কিন্তু জ্লাটকোর এদিকে খেয়ালই নেই। সে এখানে গভীর মনোযোগের সাথে পিঁপড়াদের লড়াই দেখছে। ডাক্তার তাকে চকলেট নেয়ার জন্য ডাকলেন। কিন্তু সে সাড়া দিল না। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন,
– কি ব্যাপার জ্লাটকো, তুমি কি চকলেট পছন্দ করো না?
এ সময় জ্লাটকো চেঁচিয়ে ওঠে:
– দেখ জেবা, এদিকে দেখ।
জেবা তার কথায় তাকিয়ে দেখে বড় পিঁপড়ার দল কয়েকটি ছোট পিঁপড়াকে মেরে ফেলেছে। জ্লাটকোর চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। ছোট পিঁপড়াগুলোর মৃত্যুতে তার মন বিষণ্ন ও ব্যথাতুর। ছোট ভাইয়ের অবস্থা দেখে জেবার খুব কষ্ট হয়। সে তাকে নিজের কাছে টেনে নেয়। তারপর পরম মমতায় তার চোখের পানি নিজের হাত দিয়ে মুছে দেয়। ডাক্তারের কাছ থেকে চকলেটগুলো চেয়ে এনে জ্লাটকোর হাতে দেয় সে। বলে,
– নে খা, খুব সুন্দর স্বাদ চকলেটগুলোর।
একটি চকলেটের মোড়ক খুলে অর্ধেকটা ভেঙে জ্লাটকোর মুখের মধ্যে পুরে দেয় সে। ডাক্তার তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। জ্লাটকোর বিষাদভরা মুখ দেখে জেবার কাছে ঘটনা জানতে চাইলেন তিনি। কটি পিঁপড়ার জন্য জ্লাটকোর দুঃখ ও ব্যথার অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলে। তার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। জেবাকে তিনি আগেই ভালবেসেছিলেন। এখন জ্লাটকোর জন্য বুকের ভেতর এক ঘভীর স্নেহের ফল্গুধারার প্রবহমানতা যেন টের পেলেন তিনি। দু'জকে দু'হাতে ধরে নিজের কাছে টেনে আনেন ডাক্তার নিবিড় স্নেহে। এ দু'টি শিশুকে প্রকৃতই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবেসে ফেলেছেন। কাছে বসিয়ে দু'জনের মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। এক সময় জ্লাটকোর দিকে চাইলেন তিনি। দেখলেন সেও চেয়ে আছে তার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই ফিক করে হেসে ফেলে জ্লাটকো। তাকে হাসতে দেখে হেসে ফেলে জেবাও এবং দু'জনকে হাসতে দেখে ডাক্তার নিজেও হেসে ফেলেন। তার মনে হয়, জীবনের একটি চমৎকার সময়ের দেখা পেয়েছেন তিনি। অপরূপ আনন্দময় একটি অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে।
হঠাৎ আকাশে একটি জঙ্গি বিমানের গর্জন শোনা যায়। মুহূর্তে অজানা শঙ্কায় ছেয়ে যায় সবার মন। তবে অন্য সময়ের মতো দৌড়ে গিয়ে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেয়ার তাগিদ অনুভব



www.pathagar.org

করলেন ডাক্তার রেজাকোভিচ। তার যেন মনে হয় কাঠের তৈরি এ লজটি যথেষ্ট নিরাপদ। জঙ্গি বিমানটি কোথাও বোমা ফেলে।

এক, দুই, তিন। একের পর এক প্রচ- বিস্ফোরণের আওয়াজ ও কম্পন অনুভব করলেন তিনি। শিশু দু'টি বোধ হয় ভয় পাচ্ছে। ওদের দ'হাতে শক্ত করে ধরে আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করেন তিনি। এ সময় তার মনে পড়ে যায়, পকেটে আরেকটি চকলেট এখনো রয়ে গেছে। সেটা বের করে এনে মোড়ক খুলতে শুরু করেন। তখনি দ্বিতীয় দফা বোমা বিস্ফোরণ শুরু হলো। মুখে একটু হাসি টেনে এনে জেবা ও জ্লাটকোকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করেন। চকলেটের মোড়কটি খোলা হয়ে গেছে। গায়ে মুদ্রিত লেখাগুলো তিনি পাঠ করার চেষ্টা করেন– যুক্তরাষ্ট্রের সৌজন্য উপহার। হাসি পায় তার। উঠে রেডিওর খোঁজে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ান। রেডিওটা ওখানেই রয়েছে।

রেডিওর নব ঘোরাতে ঘোরাতে এক স্থানে থামে। একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। থমকে গিয়ে শুনতে থাকেন তিনি।

আমাদের নৈতিক মনোবল যাতে চাঙ্গা হয় সে জন্য বিশ জন মুসলমানকে হত্যা করেছি এবং সাতজন মহিলা ও দুই জন বালিকাকে ধর্ষণ করেছি। তারপর তাদেরও হত্যা করেছি। আমাদের নেতারা বলেছেন, আমরা যত বেশি হত্যা ও ধর্ষণ করতে পারব যুদ্ধে তত বেশি ভাল করতে পারব। আমাদের ধর্ষণ শিবিরে বহু মহিলা ও বালিকা মারা গেছে। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই তাদের শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছে। ডাক্তারের বুঝতে বাকি থাকে না যে সারাজেভো বেতার থেকে ধৃত কোনো সার্ব সৈন্যের স্বীকারোক্তি প্রচার করা হচ্ছে। কি হীন চরিত্র এই সার্বগুলোর! ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে ডাক্তারের মন। এদিকে ধৃত সার্ব সৈন্যের স্বীকারোক্তির মাঝে বাধা দিয়ে ঘোষক বলে ওঠেন, ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ অনুষ্ঠানের মধ্যে আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে সার্ব জঙ্গি বিমানগুলো স্রেব্রেনিসায় জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে আবার বোমা বর্ষণ করেছে। ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পেলেই তা আপনাদের জানানো হবে। এখন আমরা আবার মুল অনুষ্ঠান ফিরে যাচ্ছি। আপনারা বসনিয়ার মুসলমান সেনাবাহিনীর হাতে ধৃত সার্ব সৈন্য ও যুদ্ধবন্দী স্টলিনভ হেরাকের অকর্মের স্বীকারোক্তি শুনছেন।'

জ্লাটকো তখনো চেয়ে আছে পিঁপড়াগুলোর দিকে। ছোট কালো পিঁপড়ার দল বড় পিঁপড়ার দলের হামলায় সমূলে বিনাশ হয়েছে। জ্লাটকো দেখতে পেল তার চোখের সামনেই বড় পিঁপড়ার দল শেষ ছোট পিঁপড়াটিকে হত্যা করল।

ঈদসংখ্যা : জানুয়ারি, ২০০০



www.pathagar.org

# চান্দুর গল্প

মসউদ-উশ-শহীদ

www.pathagar.org

তিনটি দুধেল গাই। একটি কালো। একটি সাদা-কালোয় মিশানো। একটি লাল কপালে চাঁদের মতো সাদা রঙ। আদীবের খুব পছন্দ লাল গাইটি। আদীব গাইটির নাম দিয়েছে চান্দা গাই। আদর করে ডাকে চান্দু। চান্দু বললেই গাইটি ফিরে তাকায় আদীবের দিকে।

চান্দুর তিনটি বাচ্চা। দুটো বড় হয়ে গেছে। ওরা চান্দুর সাথেই একই গোয়ালে থাকে। তবে চান্দুর ধারে পাশেও আসে না। চান্দুও ওদের আদর করে না। আদীব ভাবে গরুদের বেশ সুবিধা একটু বড় হলেই কেমন যেন স্বাধীন স্বাধীন ভাব জন্মে। নিজে নিজেই ঘোরাফেরা করে। মাঠে চড়ে। ঘাস খায় আপন মনে। একা একা বসে জাবর কাটে। জাবর কাটতে কাটতে মাঝে মধ্যে আকাশের দিকে তাকায়। মশা মাছি বসলে লেজ নেড়ে তাড়ায়। কান নেড়েও মশামাছি তাড়ায় মাঝে মধ্যে। গরুর এসব বিচিত্র স্বভাব আদীবের খুব ভালো লাগে। চান্দুর কাছে গেলেই চান্দু গলাটা উঁচু করে দেয় আদীবের দিকে। আদীব গলার নিচে হাত বুলিয়ে দেয়। চান্দুর গলার নিচটা খুব নরম। ওখানে হাত বুলাতে আদীবের খুব ভালো লাগে। আদীব যখন চান্দুর গলায় হাত বুলায় তখন চান্দু তার মাথাটা আদীবের কাঁদে আলতু করে রাখে। কখনো কখনো চান্দুও জিভ দিয়ে আদীবের মাথার চুল চেটে দেয়। তখন আদীবের খুব কাতুকুতু লাগে।

চান্দুর শিং দুটো বেশ সুন্দর ও ধারালো, চোখা। অনেকটা ষাঁড়ের মতো। এই শিং দুটো দেখে প্রথমে আদীব খুব ভয় পেয়েছিলো। একবার এক ভিখিরীকে ওই শিং দিয়ে গুঁতিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলো। তখন চান্দুর দ্বিতীয় বাচ্চাটি খুবই ছোট ছিলো। সে তার মায়ের কাছে নেচে নেচে বেড়াচ্ছিলো। বুড়ো ভিখিরীটি সেই বাচ্চাটির পাশ দিয়ে যেতেই চান্দু আচমকা দৌড়ে গিয়ে বুড়োকে গুঁতিয়ে ফেলে দেয়। চান্দুর এই কা- দেখে আদীব খুব ভয় পেয়েছিলো। বহুদিন সে চান্দুর ধারে কাছেও যায়নি। একদিন আব্বুকে চান্দুর কাছে পেয়ে আদীবও আস্তে আস্তে কাছে গেলো। আদীবকে দেখে চান্দু যেন খুশি হলো। মাথাটা একটু নিচু করে আদীবের দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। আদীব ভয়ে ভয়ে গলার নিচে হাত লাগালো। চান্দু মাথাটা আরো লম্বা করে বাড়িয়ে দিলো আদীবের দিকে। এবার আদীবের ভয় কেটে গেলো। হঠাৎ সে চান্দুর গলা জড়িয়ে ধরলো। আদীবের কা- দেখে সৈয়দ সাহেব হা হা করে হেসে ফেললেন। আব্বুকে এভাবে হাসেতে দেখে আদীব অবাক হয়ে গেলো। চান্দুকে ছেড়ে দিয়ে আব্বুকে বললো; আপনি এভাবে হাসলেন কেন?

– কেন? তোমার কা- দেখেই তো হাসলাম।

– আমার কা- কি আবার?

– চান্দুকে যে জড়িয়ে ধরলে?

– ওকে আমার খুব ভালো লাগে।

– আমরাও তো চান্দুকে খুব পছন্দ করি।



www.pathagar.org

চান্দু যেন পিতা পুত্রের কথা বুঝতে পারলো। সে দুপা এগিয়ে এসে আদীবের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। সৈয়দ সাহেব চান্দুর মাথায় হাত রাখলেন। চান্দু তার মাথাটা একটু কাত করে নিচু করে দিলো। চান্দুকে আদীবের আম্মাও খুব পছন্দ করে। কাজের ছেলে আবদুলও বলে চান্দু খুব ভালো গরু।

আবদুল প্রতিদিন গরুগুলোকে গোয়াল থেকে বের করে খালের ধারে নিয়ে যায়। তারপর এক একটা গরুর গা ধুইয়ে দেয়। কখনো কখনো পাহাড়ের ধারে দীঘির জলে সাঁতার কাটায়।

সৈয়দ সাহেবের সব গরু দেশী। বিদেশী গরু বেশি দুধ দিলেও সেগুলোর সেবা যত্নের দরকার বেশি। একটু এদিক ওদিক হলেই বিদেশী গরুগুলা অসুখ হয়ে পড়ে।

আদীব একবার বায়না ধরেছিলো একটা অস্ট্রেলিয়ান গরু কিনতে। সেই বায়নার পর ওর আববু এই চান্দুকে কিনে আনেন। চান্দুকে আনার পর থেকে আদীবদের অবস্থাও ভালো হয়ে যায়।

শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে ফৌজদার হাটে আদীবদের বাড়ি। আদীবদের শহরেও একটা বাড়ি আছে। সেটা ভাড়া দিতে হয়েছে। শুধুমাত্র গরু পোষার জন্যই আদীবের আব্বা এই গ্রামের দিকে আরেকটা বাড়ি করেছেন। শহরেই তার সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য। শহর ঘেঁষা গ্রাম তাঁর খুব পছন্দ।

আদীবেরও ওরকম শহরতলি খুব পছন্দ। সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ সেরে আদীব ওর আব্বুর সাথে সমুদ্রের দিকে চলে যায়। বিকেলেও মাঝে মধ্যে সে বন্ধুদের সাথে সমুদ্রের পাড়ে যায়। তাদের সাথে বসে বসে সূর্যাস্ত দেখে। সমুদ্রের ঢেউ দেখে আদীব খুব অবাক হয়ে যায়। কোত্থেকে আসে এত ঢেউ! আর কোত্থেকেই বা এত বাতাস ছুটে আসে সমুদ্রের দিক থেকে।

শীতের দিন সমুদ্র মোটামুটি শান্ত থাকে। তখন সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ থাকে। শীতের পর থেকে সমুদ্র একটু একটু উত্তাল হতে থাকে তখন ঢেউ বড় হয়। দূর থেকে গর্জন ভেসে আসে।

আদীবদের বাড়ি আগে একদম সমুদ্র পাড়ে ছিলো। সেটা ছিলো ভাটিয়ারীতে। '৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর আদীবের আব্বু ফৌজদারহাটে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নতুন বাড়ি করেন। এখানে এসেই তিনি গরু পোষা শুরু করলেন। এই গরু পোষারও একটি কাহিনী আছে। আদীবের আব্বুর চিরদিনের অভ্যেস হচ্ছে ঘুমোনোর সময় গরম দুধ খাওয়া। তিনি শোবার সময় সবাইকে গরম দুধ খাওয়ান। আদীবের আম্মুর এটা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তিনি বলেন, এটা একটা বদঅভ্যাস।

সেই দুধ খাওয়া নিয়েই এই কাহিনী। কাট্টলীর এক গোয়ালা তাদের দুধ দিয়ে যেতো। একদিন আদীবের আব্বু শহর থেকে ফেরার পথে দেখেন সেই গোয়ালা খাল থেকে পানি নিয়ে দুধে ঢালছে। তারপরের দিনই তিনি দুধওয়ালা একটা গাই কিনে নিয়ে



www.pathagar.org

আসেন। এভাবেই আদীবদের তিনটি দুধওয়ালা গরু হয় গেলো। সেই গরুর জন্য তৈরি হলো গোয়াল ঘর। গরু দেখাশোনা করার জন্য আনা হলো আব্দুলকে। এখন আদীবরা খাঁটি দুধ খাচ্ছে। আর দুধ বিক্রি করে আব্দুলের খরচও পুষিয়ে দেয়া হচ্ছে। চান্দুর শেষ বাচ্চাটিও বড় হয়ে গেছে। আরো দু'টি গরু আদীবের বড় ফুফি ও ছোট ফুফিকে দিয়ে দিয়েছেন আদীবের আব্বু।

এভাবে বেশ আনন্দেই কাটছিলো আদীবের। কিন্তু একদিন সেই আনন্দে নেমে এলো একটা শোকের ছায়া। আদীবের আব্বু বললেন, এবার চান্দুকে কুরবানি দেবো।

কথাটা শুনে গোটা রাত আদীব ঘুমোতে পারলো না। তার প্রিয় চান্দুকে কুরবানি দেয়া হবে। সকালে নাস্তার টেবিলে বসে আম্মুকে ধরলো আদীব। বললো, আম্মু চান্দুকে কুরবানি দেবেন না। চান্দু আমার খুব প্রিয়। আম্মু হেসে বললেন, ওটা আমরও প্রিয়। আব্বুও আম্মুর সাথে যোগ দিলেন। বললেন : চান্দু আমারও প্রিয়। কিন্তু আল্লাহ্ তো সেই প্রিয় জন্তুটিকেই কুরবানি দিতে বলেছেন।

একটু থেমে আব্বু বললেন, তুমি কি হজরত ইবরাহিম (আ)-এর কুরবানির কথা জানো?

আদীব বললো, জানি।

তাহলে দেখো তিনি আল্লাহর হুকুমে নিজের প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর নামে কুরবানি দিতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর সেই ইচ্ছাকে কবুল করলেন এবং তাঁর সন্তান হজরত ইসমাইলের পরিবর্তে একটি দুম্বা দিয়ে বললেন, এটাকে আমার নামে কুরবানি করো। আজো যে প্রতি বছর আমরা কুরবানি করি সেটা সেই কুরবানিরই স্মৃতিকে স্মরণ করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমাদের সকলের উচিত প্রিয় এবং মোটা তাজা গরু বা অন্য পশু কুরবানি করা।

সেই হিসেবে আমাদের চান্দু সবার প্রিয় গরু। আবার চান্দু সবচেয়ে মোটাতাজা। চান্দুকে কুরবানি দিলে আমাদের মনে কষ্ট থাকলেও আল্লাহ্ এত খুব খুশি হবেন। আব্বুর কথা শুনে আদীবের মনটা আবার ভালো হয়ে গেলো। মনে মনে বললো আল্লাহর জন্য চান্দুকে কেন নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবো না।

এ কথা মনে আসতেই আদীবের মুখটা উজ্জ্বল আনন্দে ভরে উঠলো। আব্বুকে বললো, আব্বু, ঠিক আছে চান্দুকে কুরবানি দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আদীবের কথা শুনে সৈয়দ সাহেব সাদরে আদীবের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, ঈদের পর তোমার জন্য আরেকটা চান্দু কিনে আনবো। আদীব সানন্দে মাথা নেড়ে সায় দিলো। তারপর চান্দুকে আরেকটু দেখার জন্য দৌড়ে ছুটে গেলো গোয়াল ঘরের দিকে।

মার্চ, ১৯৯৯



www.pathagar.org

# লোহার ভূত

সরকার মাসুদ

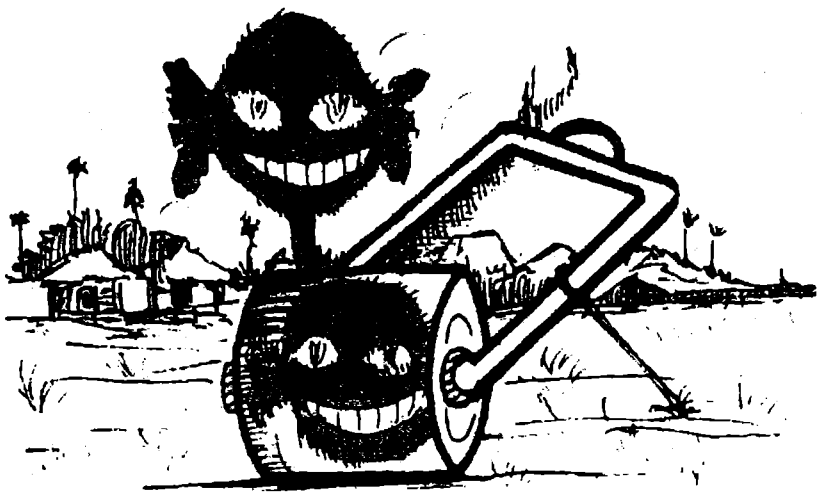

www.pathagar.org

আনিসদের বাসা থেকে বেরিয়েই রিফাত ভেবেছিল আজ নির্ঘাত আম্মা বকবে। বাসায় ফেরার কথা সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে। দশ পনের মিনিট দেরি হলে কিছু হয় না। কিন্তু এখনই ছ'টা চল্লিশ। বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাতটা বাজবে। আম্মা নিশ্চিত আজ বকবে। শুধু বকা নয়, কানও মলে দেবে। এটা সেপ্টেম্বর মাস। সন্ধ্যা হয় সোয়া ছ'টায়। সাড়ে ছ'টায় অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক। আকাশে যদি চাঁদ না থাকে কিংবা যে কোনো কারণে একটা তারাও না ফোটে তাহলে সন্ধ্যারাতে চেনা রাস্তায়ও মানুষকে ঠাওর করে করে চলতে হয়। রিফাতকেও এখন তাই করতে হচ্ছে। আকাশে চাঁদ নেই। অল্প দু'চরটা তারা চোখে পড়ে। একটু আগেও আলো ছিল। রাস্তার দুই ধারের সোডিয়াম বাল্বের আলোয় সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। রিফাতের সাদা শার্ট হলুদ আলোয় হলুদ হয়ে গিয়েছিল। সে গল্প পড়তে ভালোবাসে। অল্পদিন আগে ইত্তেফাকের ছোটদের পাতায় হলুদ বাড়ি নামে একটা গল্প পড়েছে সে। সেই ভাড়িটার প্রায় সবকিছুই হলুদ। বাড়ির রঙ হলুদ। দরজা জানালার পর্দা হলুদ। ভেতরের আসবাবপত্র হলুদ। বিছানার চাদর, দেয়ালঘড়ি, সিলিংফ্যান, টেবিল ল্যাম্প সব হলুদ। ২-৩ টি লোক থাকে সেই বাড়িতে। তাদের পোশাক পরিচ্ছদও হলুদ। হলুদ সোডিয়াম বাতির নিচ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, একটু আগে রিফাতের ঐ গল্পটার কথা মনে হয়। নিজেকে তার ঐ হলুদ বাড়ির একজন মনে হয়। আপন মনে সে একটু হাসে। তারপর মনে মনে উচ্চারণ করে হলুদ বাড়ি। রিফাতের চার পাশে কোনো আলো নেই। যেই সে বড় রাস্তা, মানে পাকা রাস্তা ছেড়ে সরু মেঠোপথ ধরেছিল তখনই আলোটা কমে আসছিল। মাঠের ভেতর ঢুকে পড়ার পর আলো একেবারেই থাকলো না। এখন সামনে পেছনে মাঠের অলিখিত রাস্তা। ডানে বামে মাঠ। খেলার মাঠ। খেলার মাঠের সবুজ ঘাস এখন অন্ধকার। অন্ধকারে ভারি হয়ে উঠছে নিকট ও দূরের যাবতীয় ঘাসপাতা, পল্লব। জেলা স্কুলের এই মাঠ দু'ভাগে ভাগ করা। মাঝখানে পিচের রাস্তা। স্কুলের গেট থেকে রাস্তাটা সোজা স্কুল ভবনের সামনে চলে গেছে। ফলে রাস্তার দুপাশে দুটো মাঠ। দুই জোড়া গোলপোস্ট আছে। মাঠের এক কোণে আছে ব্যায়াম করার লোহার রড সমেত নানা রকম ব্যবস্থা। স্কুল আওয়ারে অনেক ছেলে এগুলোতে ঝোলে। জেলা স্কুলের আদি ও সবচেয়ে টেকসই দালান হচ্ছে সেই ভবনটি যা মেইন রোড লাগোয়া স্কুলের গেট থেকেই পরিষ্কার দেখা যায়। এ আদি উঁচু ভবনের সামনে, দুই পাশে বিশাল বিশাল দু'টি গাছ। ডান দিকের গাছটা বট। বাম দিকেরটা অশ্বত্থ। গরমের দিনে এসব গাছের নিচে খেলাধুলার ক্লাস বসে আর শুধু ক্লাস কেন, এমনিতেও প্রচুর ছাত্র ঐ বটের নিচে গোল আড্ডা বসায়, ছুটাছুটি করে, চানাচুর খায়। সারাদিন অজস্র পাখি বটগাছে বসে। বর্ষাকালে বটের ফল হয়। ছোট ছোট লাল ফল। সারা গাছতলা জুড়ে পড়ে থাকে ঐ ফল। গরমের সময় কুলপিবরফসহ নানা রকম আইসক্রিমের দোকান বসে বটতলায়। বট ও অশ্বত্থ গাছ দুটোকে এখন মাটি ফুঁড়ে ওঠা অন্ধকারের বিরাট স্তূপ মনে হচ্ছে। মাঠের মাঝখানের লিঙ্ক রোডে কমপক্ষে দুটো বাতি জ্বলে। আজ একটাও জ্বলছে না। বোধ হয় বাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে। ছেলেরা পাটকেল মেরে ভেঙে ফেলতেও পারে। রিফাত ভাবে, আমাদের স্কুলে মোটামুটি ভালো ছাত্র সবাই। তবে চুরি করার মতো পাজি ছেলেও আছে। চুরি? ছি! ছি!

চুরি করবে কেন? ছাত্র কেন চুরি করবে? সে খেয়াল করে দ্যাখে, স্কুলের মেইন বিল্ডিংয়ের সামনে, দুই কোনায় দুটো ব্লাব টিমটিম করে জ্বলছে। আলো, এত কম, যেন চারপাশের



www.pathagar.org

অন্ধকার ঐ আলোটুকুও গ্রাস করার জন্য উদ্যত হয়ে আছে। দৃষ্টিসীমার ভেতর আর কোনো বাল্ব চোখে পড়ে না। অশ্বত্থ গাছটার ঝাকড়া মাথার দিকে তাকিয়ে রিফাতের ভয় ভয় লাগে। মনে পড়ে বিজু একদিন ধর্মশিক্ষা ক্লাসে কানে কানে বলেছিল, জানিস! ঐ গাছটায় জিন আছে। হুজুর তখন ইনসান ও জিনের পার্থক্য পড়াচ্ছিলেন।

রিফাত ক্লাস সেভেনে পড়ে। বয়স বারোয় পড়েনি এখনা। বাবা-মা, মামা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়া একলা দূরে কোথাও সে যায়নি। শুধু এক মাইল দূরের আনিসদের বাসায় গেছে কয়েকবার। প্রত্যেকবার সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসেছে। আনিস ক্লাসের ফার্স্ট বয়। রিফাতের রোল দুই। সবাই বলে আনিস ও রিফাত দু'জনেই বৃত্তি পাবে।

ওরা ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছিল। অবশ্য এইটের বৃত্তি নিয়ে রিফাতের একটু ভয় আছে। অঙ্কে ও কাঁচা। সে জন্য গুড্ডু স্যারের কাছে এখন থেকে অঙ্ক শিখছে। আব্দুর রশিদ অঙ্কে স্কলার। তার পঞ্চাশ বছরের বয়স্ক মাথায় একটাও চুল নেই। শরীরটাও গাট্টাগোট্টা ধরনের। ছেলেরা নাম দিয়েছে গুড্ডু স্যার। রিফাত আজ আনিসের কাছে গিয়েছিল অঙ্কের ব্যাপারেই। গুড্ডু স্যার দশটা অংক কষতে দিয়েছেন। তার মধ্যে চারটা দিয়েছেন বানিয়ে। অনুশীলনীর বাইরের এ চারটা অংক বুঝতে গিয়েছিল সে। অঙ্ক করা শেষে আধঘন্টার মতো আড্ডা হলো। খালাম্মা (আনিসের মা) আবার নাস্তা না খেয়ে আসতে দেবেন না। এসব করতেই দেরি হয়ে গেল। নইলে সে ঠিকই ছ'টার আগে বাসায় ফিরতে পারতো। তার হঠাৎ মনে হয় কেউ পেছনে পেছনে আসছে। ফিরে দ্যাখে কেউ নেই। পায়ের শব্দের মতো মনে হলো যেন! নাহ্, মনের ভুল! স্কুলের গেটে দারোয়ান মফিজ মিয়াকে এক ঝলক দেখা গেল লাইটের আলোয়। স্কুলে নাইট গার্ড দু'জন। তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওরা হয়তো পেছন দিকে আছে নতুনবা এখনো ডিউটিতে এসে পৌঁছায়নি। বিজু কানের কাছে মুখ রেখে আবার বললো, জানিস! ঐ গাছটায় জিন আছে! কিন্তু এখানে বিজু কোথায়? সে এখন ওদের জুম্মাপাড়ার বাসায় স্টাডি টেবিলে। রিফাতের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সত্যিই জিন আছে নাকি ঐ গাছে? আজ যদি আমাকে জিনে পায় তখন? বেশ একটু বাতাস উঠেছে। অশ্বত্থের পাতা এমনিতেই পাতলা। সামান্য বাতাসে সর সর সর সর করে আওয়াজ হতে থাকে। অশ্বত্থপাতার ঐ একটানা আওয়াজ, অন্ধকার ও মনে জিন সব মিলিয়ে রিফাতের অবস্থা ভীত বিহ্বল। সে আরো বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করে। মাঠটা অনেক বড়। প্রায় অর্ধেকটা পার হয়ে এসেছে সে। আর ৬-৭ মিনিট হাঁটলে সে স্কুলের মেইন বিল্ডিং বামে রেখে সিএন্ডবি অফিসের পেছনের দেয়াল বরাবর পৌঁছে যেতে পারে। ওখানে দেয়ালের একটা অংশ ভেঙে মানুষ যাওয়ার উপযোগী করা হয়েছে। প্রধানত ছাত্ররাই স্কুল আওয়ারে, ঐ শর্টকাট পথ ব্যবহার করে। রিফাতও পথ সংক্ষেপ করার জন্য মাঠের ভেতরের এই রাস্তা ধরেছে। দেয়ালের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে সে সোজা রাধাবল্লভের রাস্তায় উঠবে।

ওখান থেকে বাসা মিনিট দশকের পথ।

বাসার কথা মনে হওয়ায় রিফাতের মনে পড়লো তার বাবার কথা। বাবা অফিসের কাজে রাজশাহী গেছেন আজ তিনদিন। আজকালের মধ্যেই ফেরার কথা। আব্বা যদি ফিরে এসে থাকেন। আমাকে বাসায় না পেয়ে ফায়ার হয়ে যাবেন। সন্ধ্যার পর ছোট ছেলেদের বাইরে থাকা আব্বা একদম পছন্দ করেন না। আর সায়মাটা যা পাজি। বানিয়ে বানিয়ে এটা সেটা বলবে। আমার পেছনে লেগে ও যে কি আনন্দ পায়! সায়মা রিফাতের বোন। চার বছরের



www.pathagar.org

ছোট। ওদের আর কোনো ভাইবোন নেই। রিফাত মনে মনে প্রার্থনা করে, আম্মা বকে বকুক, কান যদি মলেও দেয় দিক; আব্বা যেন না এসে থাকে। আব্বা কাল আসুক। দেয়াল বরাবর ঐ শর্টকাট রাস্তা ধরার জন্য মস্তুষ মাঠের ভেতর দিয়ে দিনের বেলাতেও হাঁটে, বিশেষ করে স্কুল যখন বন্ধ থাকে। সে জন্য হাঁটা পথের ঘাস মরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে। আবছা আঁধারে ঐ পথ সিঁথির মতো দেখায়। অশ্বত্থগাছের একটানা সর সর আছেই। মাথার ওপর দিয়ে একটা রাত পাখি ধীরগতিতে ওড়ে গেল। আরেকটা বড় আকারের পাখি গিয়ে পড়লো আশ্বত্থগাছের মাথায়। জিনের কথা মনে পড়ায় রিফাত হঠাৎ যেরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিল এখন ঠিক সেরকম ভীত অবস্থা নেই মনের। আবার জিনের প্রসঙ্গ পুরোপুরি ভুলে গিয়ে সে সাহসী ও উদাসীন হয়ে উঠেছে তাও নয়। একটু জোরে পা চালাতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়, কয়েক দম এগিয়েই রিফাত থমকে দাঁড়ালো। কী ওটা! হায় আল্লাহ ওটা কী! ১৫-২০ হাত দুরে ঘাসের ওপর গোল হয়ে পড়ে আছে। গোলাকার ঘন অন্ধকার। জটপাকানো অন্ধকারের দলা যেন। কিন্তু জিনিসটা কী? কোনো জন্তু? মাঠের মাঝখানে এটা এলো কোত্থেকে? ভূতটুত নয়তো? রিফাত চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে নিরীক্ষণ করছে ঐ কালো গোল অস্তিত্বকে। নিরীক্ষণ করতে করতে সে ৩-৪ কদম এগোয়। স্থির দাঁড়িয়ে পড়ে আবার। নাহ ওটার কোনো রকম নড়চড়া লক্ষ্য করা যায় না। জন্তু হলে সামান্য হলেও নড়াচড়া করতো। নিঃশ্বাস নেবার শব্দও শোনা যাচ্ছে না। ওটা কি গরু? কিন্তু গরু এখানে আসবে কেন, এখন? হ্যাঁ আসতে পারে। ঘোষপাড়া থেকে অনেক সময় গরু আসে। ঘোষ হয়তো গরু ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। নাহ ওটা গরু নয়। গরুর দাঁড়িয়ে বা বসে থাকার ভঙ্গি ওরকম হতে পারে না। তাহলে কী? ওটা কি সত্যিই ভূত বা অন্য কোনো অশরীরী কিছু? ওঁৎ পেতে বসে আছে? ভূতরা মানুষের মনের কথা জানতে পারে। আমি এপথ দিয়ে আসবো জেনেই কি ও এভাবে ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। আরেকটু এগোলেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? রিফাত আরো কাছে গিয়ে ব্যাপারটা নিরীক্ষণ করতে চাইলো। সে দু'পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে আসে। এবার সত্যিই সে ভয় পেয়েছে। গা শিরশির করছে তার। কপাল ও নাক ঘেমে গেছে। হঠাৎ রিফাতের মনে হয় ওটা সামান্য এগিয়ে এসেছে। আচ্ছা চিৎকার করে মফিজ ভাইকে ডাকলে কেমন হয়? দারোয়ান গেটের কাছেই আছে। ডাক শুনে নিশ্চয়ই টর্চ হাতে ছুটে আসবে। কিন্তু যদি...। অস্বস্তিবোধক মৃদু চাপ শব্দ উঠে আসে তার ঠোঁট থেকে। চিৎকার করার সাথে সাথে ওটা যদি আমার ওপর এসে পড়ে! দৌড় দেবো? এক দৌড়ে মাঠ ঘুরে দেয়ালের ভাঙা জায়গাটায় গিয়ে উঠবো নাকি? শুনেছি ভূত প্রেতরা কারো ওপর নজর করলে তার রক্ষা নেই। দৌড়ালেও তার পিছু সে ছাড়বে না। তাকে ধরবেই। এখন উপায়? আল্লাহ! একি বিপদে পড়লাম আমি।

এই অবস্থায় মিনিট দুয়েক কেটেছে বোধ হয়। রিফাত ভয়ে ঠা-া হয়ে আসছে। কোনোমতেই মনে সাহস আনতে পারছে না। থ্রি-ফোরে পড়ার সময় বাবা নানারকম রূপকথার বই কিনে দিতেন। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সব গল্পে ঠাসা সেসব বই। ভূতের গল্পও ছিল তার মধ্যে। ভূতরা নানা আকার নিতে পারে। আলোর শিখা ও অন্ধকারের জটলা দু'রকমই হতে পারে সে। আর তারা নাকি বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী। এসব কথা মনে হয় রিফাতের। না-না দৌড়ানো বোকামি হবে। যদি ওটা ভূতই হয়ে থাকে তাহলে সে আমাকে ছাড়বে না। ও আল্লাহ! কেন আমি এ পথ দিয়ে এলাম। আবার মনে মনে বলে, দেরি হলো



www.pathagar.org

পথ সংক্ষেপ করার জন্যই তো এদিক দিয়ে এসেছি। না হলে কাচারির মোড় ঘুরেই বাসায় যেতাম। এখন উপায় কী? উত্তেজনায়, অজানা আশঙ্কায় রিফাতের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। আবুল মামার কথা মনে পড়লো। মামা একদিন বলেছিলেন, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই মামা। তবে মাওলানা সাহেবরা বলেন, জিন আছে। জিন আলোর তৈরি। আলোর তৈরি জিন অন্ধকারে রূপ নিতে পারে কি না সে বিষয়ে মামা অবশ্য সেদিন কিছুই বলেননি। মামা বরং বলেছিলেন, কুসংস্কারের কুপ্রভাব বিষয়ে। বলেছিলেন যে কোনো পরিস্থিতিতে সাহস রাখতে হয় বুঝলে মামা? সাহসী না হলে জীবনে উন্নতি করা যায় না। রিফাত নিজেকে এখন বলে, মামা বলেছে ভূত নেই। তাহলে মানুষেরা এত ভূতের গল্প করে কেন? আমার সামনের ঐ জিনিসটা ভূতের মতো বসে আছে কেন? সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে, কিন্তু এটা যে ভূতই তারই বা প্রমাণ কি? ভূত না হয়ে অন্য কিছুও তো হতে পারে? অন্য কোনো জন্তু-নিরীহ বা হিংস্র অন্য কিছু! কিন্তু রিফাত নিজেকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়। মামা যাই বলুক ভূতের ভয় এখন তার মগজের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়েছে। সে ঘামছে। জামার নিচের গেঞ্জি ভেজা ভেজা। ভয়ে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। উত্তেজনায় ঘামতে ঘামতে মাথার ভেতর আবুল মামার গলা শুনতে পেলো সে, খুব বেশি ভয় পেয়েছিস, রিফাত? বোকা ছেলে! তুই তো এত ভীতু ছিলে না কখনো? বুকে সাহস রাখ সাহস রাখ। সাহস ছাড়া জীবনে কিছু করা যায় না বুঝলি? এবার রিফাত মনে মনে বলে ধুর! যা হবার হবে : সে মুহূর্তে মন্ত্র তাড়িতের মতো পায়ের স্যান্ডেল তার হাতে উঠে আসে। সে আর কোনো কিছু চিন্তা না করে এক ভোঁ দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে সোজা ঐ ভাঙা দেয়াল বরাবর চলে যায়। এক ঝলক পেছন ফিরে দ্যাখে, তারপর দ্রুত ফোকর দিয়ে গা গলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় রাধাবল্লভের রাস্তার বাঁকে।

ভয় পেলে নাকি মানুষের জ্বর আসে। না সে রাতে রিফাতের জ্বর আসেনি। তার কারণ তার মনে শুধু ভয় ছিল না, যুক্তিও ছিল। তাই ভয় সে সামলে উঠতে পেরেছিল। পরদিন সে যথারীতি স্কুলে গেল। ক্লাস করলো, বন্ধুবান্ধবের সাথে হাসি মশকরা করলো। গত সন্ধ্যার ঘটনাটা সে কেবল আনিসকে বললো এবং অন্য কাউকে বলতে নিষেধ করলো। অনেক পরে একদিন বন্ধুদের আড্ডায় ভূতের গল্প উঠলো। রিফাত দীর্ঘক্ষণ চুপ থেকে বললো, তোদের অনেক গল্প শুনলাম। এবার আমার গল্প শোন। লোহার ভূত দেখেছিস তোরা? বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে লোহার ভূত! তারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। একজন বলে, লোহার ভূত আবার কেমন? রিফাত বলে হ্যাঁ- লোহার ভূত। আমাদের দুই নম্বর মাঠের কোনায় একটা হাতলঅলা রোলার পড়ে আছে, দেখেছিস? সবাই বলে, ওটা তো রোলার মেশিন। ওটা দিয়ে মাঠ সমান করে। রিফাত বলে, হ্যাঁ, ওটাই লোহার ভূত! ঐ রোলার মেশিনটাই ভূত হয়ে আমাকে একদিন তাড়া করছিল সন্ধ্যার পর, বুঝলি? একদম সত্যি গল্প। এক ফোঁটা মিথ্যা বলছি না। ঐ রোলার মেশিনটার মধ্যে ভূত থাকে। সন্ধ্যার পর ওটার কাছে যাবি না। সাবধান! ...

ঈদসংখ্যা : জানুয়ারি ২০০০



www.pathagar.org

# ভূতের মত অদ্ভুত

সাজজাদ হোসাইন খান

www.pathagar.org

এ এক আজব জগৎ। একেবারে আলাদা। অন্যরকম। কোনো অঙ্ক মেলে না সেখানে। বড় বড় মাথা কেবল চক্কর খায়। ঝিম ঝিম করে শিরা, ধমনী। যুক্তি-ফুক্তির বালাই নেই। বিজ্ঞান- ফিজ্ঞান সব অজ্ঞান সে জগতে। কী অবাক ব্যাপার। কতো অজানা অচেনা জগতে মানুষ এখন হাঁটাহাঁটি করে, শূন্য থেকে মহাশূন্যে যায়, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘোরাঘুরি করে, ধূমকেতুর পেছন পেছন গিয়ে তার বাড়িঘরের খবর নিয়ে আসে চুপি চুপি, ঘরে বসেই দেখে ফেলে তারাদের গোপন হাঁটা-চলা, সাগরের তলা খুঁড়ে নিয়ে আসে মণি-মুক্তা, আরো কতো মজার মজার খবর। কিন্তু এখানে এসেই সব ফেল। বাহাদুরি খতম। টেলিস্কোপের কাচ এখানে ঝাপসা হয়ে আসে। রকেটের কলকব্জা যায় বিগড়ে। বিজ্ঞানীদের চোখ ওঠে কপালে। উল্টেপাল্টে যায় সূত্র ফুত্র। ফুটো বেলুনের মতো চুপসে আসে সাহসের মন।

হয়তো প্রশ্ন করা যায়, এই যে আজব জগৎ, কোথায় এর হাল সাকিন? কতো নদী কতো পাহাড় ডিঙাতে হয় সে জগতের হদিস নিতে? না! তেমন কিছু না। একটুকুও তকলিফ করতে হয় না সে জগতের সিংহদরজা পার হতে। আসলে এ পৃথিবীর সোলসেই বসে আছে আর এক পৃথিবী। আমাদের চারদিকেই চলছে সে পৃথিবীর কায়কারবার। আলামত। সেসব আলামত কেউ দেখে, কেউ দেখে না। আর যখনই কেউ ঢুকে যায় সে আজব পৃথিবীর সীমানায়, তখনই ঘটে বিপদ। মাথা চক্কর দেয়। কানের লতি বেয়ে নেমে আসে ভয়। আবার পায়ের বুড়া আঙুল বেয়ে তা উঠে আসে মগজে।

অনেক সময় জানটাই যাবার জোগাড় হয়। যায়ও হঠাৎ হঠাৎ এমনই এক রহস্যমাখা কাহিনী। গা ছম ছম করা কাহিনী। জ্ঞানের ঘরবাড়ি দুমড়ে মুচড়ে ফেলা এমন কাহিনী। যে কাহিনীর কোনো হিসেবে মেলাতে পারেনি। আজতক কেউ। মন কবুল করতে চায় না অনেকের। তাই বলে মিথ্যা নয় এতটুকু।

সময় উনিশশ চৌদ্দ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলছে পৃথিবীর গতরে। মানুষ নামের জন্তু জান্তব উল্লাসে নাচা নাচিতে ব্যস্ত। আকাশে পানিতে আর পথে প্রান্তরে অসহায় আদম সন্তানের হা-হুতাশ। কান্না জার্মান বাহিনীর তখন পাগলা মহিষের মতো হালত। বিশেষ করে নৌযুদ্ধে তাদের যেন বাধ মানে না এমন গতি। অসংখ্য ডুবোজাহাজ তাদের হাতে। সবগুলো পানি এলাকায়ই যেনো তাদের দখলে; এমন একটা অবস্থা। যদিও শেষমেশ হার হয়েছিল জার্মানদেরই। আর জিত হয়েছিল মিত্রবাহিনীর। সে অন্য ইতিহাস।

জার্মানদের একটি ডুবোজাহাজ ইউবি-৬৫। এ ইউবি-৬৫কে নিয়েই আজব গল্পের ডালপালা শাখা-প্রশাখা বাড়বাড়ন্ত।

জন্মের মুহূর্ত থেকেই শুরু। ডুবোজাহাজটির ওপর নজর পড়ে গেল আজব জগতের বাসিন্দাদের। বোধ হয় পছন্দ হয়েছিল, তাই এর ওপরই সওয়ার হয়ে গেলো তারা। ডুবোজাহাজের চড়ে সাগরের তলা দেখার গোপন বাসনাও হয়তো তাদের মনে জেগেছিল। তাই আর যায় কোথায়! একের পর এক ঘুরে ফিরে চলতে লাগলো আজব সব কায়কারবার। আমরা পৃথিবীর মানুষজনেরা যাকে বলি ভুতুড়ে আলামত। তখন তৈরি হচ্ছিল ইউবি-৬৫। বিশাল কারখানা। শত শত শ্রমিক। কারিগর। লোহার সাথে



www.pathagar.org

লোহা লাগছে জোড়া। আরো কতো কলকব্জা! বড় বড় পাত। ঠিকঠাকভাবেই চলছিল কাজ। কিন্তু অঘটনটা ঘটে গেল একদিন। ধপাস করে পড়লো বিরাট এক লোহার পাত ফ্রেম থেকে, শিকল ছিঁড়ে। পড়বি তো পড়, একেবারে শ্রমিকদের মাথায়। এতে মারা পড়লো বেশ কিছু শ্রমিক। বিষয়টি নিয়ে তেমন মাথা ঘামালো না কেউ। দুর্ঘটনা বলেই ভাবলো সবাই।

তারপর। নতুনভাবে আবার ইউবি-৬৫ তৈরির কাজ আঞ্জাম শুরু। ভালোয় ভালোয় শেষও হলো। আর কোনো উৎপাত নেই। ডুবোজাহাজটি বেরিয়ে এলো কারখানা থেকে। শরীর গতরে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। দেখতে শুনতেও কেমন ঝকমকে। জার্মানদের ফখর যেনো আর মনের ডিব্বায় আটকে থাকতে চায় না।

এবার ইউবি-৬৫কে পানিতে নামানোর পালা। কলকব্জা ঠিকঠাক আছে কিনা খুঁটে খুঁটে দেখা হলো। বলা তো যায় না পানির তলার কারবার। পরীক্ষার পুরা নম্বর পেয়েই পাস করলো ইউবি-৬৫। কোথাও কোনো গড়বড় নেই। সাগরে আজ নামে, কাল নামে, এমনি একটা ভাব। ঠিক তখনই আবার নাখোশ। ইঞ্জিনঘর বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে ভরতি হয়ে গেলো। এ গ্যাসের দাপাদাপিতে মরল তিনজন জার্মান নৌসেনা। কোনো আলামত নেই, গ্যাস এলো কী করে! দারুণ ভুতুড়ে কান্ড আর কি! বড় বড় মাথায় যেনো ঝিম ধারার পালা। ঝিম ধরেই থাকলো। কোনো হদিস মিললো না। রহস্য হয়েই ঘুরলো গ্যাসের কালো ধোঁয়া।

যাক। কোনোরকমে গ্যাস ট্যাস সাফসুতর করা হলো। ইউবি-৬৫ এখন সাগরে নামার পালা। নামলোও। রাজহাঁসের মত সাঁতার কেটে কেটে পানিতে ভাসলো ডুব দেবার আগে।

পানিতে ডুব দেবার আগের ঘটনা। ক্যাপেটন একজন সাহসী নৌসেনাকে পাঠালেন জাহাজের উপরটা ভালোভাবে দেখে নেবার জন্য। কোনো খুঁতটুত আছে কি না। বলা তো যায় না, কোথা দিয়ে কী হয়ে যায়। এর আগের ঘটনাগুলো সবার মনের অন্ধকার ঘরটায় ভয়ের হালকা বাতাস বইয়ে দিচ্ছিল।

নৌসেনাটি তরতর করে জাহাজের ডেকে ওঠে গেলো। এদিকে সেদিকে ভালোভাবে দেখছিল সে। ক্যাপ্টেনও দাঁড়ালো দূরে। কিন্তু একি! কয়েক মিনিট পর নৌসেনাটি হাওয়া।

চোখের সামনে থেকে ক্যাপ্টেনের চোখ ঘষে নিলো। না, কোথাও নেই। গেলো কোথায় এত বড় মানুষটা? নিমেষে ব্যাপারটা ঘটে গেলো। একটা আস্ত মানুষই উধাও করে দিলো তারা। কোনো বিদ্যাবুদ্ধিই এর কারণ আবিষ্কার করতে পারলো না। আর পারবেই বা কেন? এ বিদ্যা তো আর সবার ঘাটে নেই যে, হুট করে বিষয়টা ধরে নেবে! উদ্ধার করে আনবে হাওয়া হয়ে যাওয়া মানুষটা!

এরপর থেকেই ভয় বাসা বাঁধলো ডুবোজাহাজের লোকজনদের মনে। মনের ভয় মনে পুষে রেখেই ক্যাপ্টেন ইউবি-৬৫ নিয়ে ডুব দিলেন। কারণ এসব চিন্তা-ভাবনা করার সময় কই? সামনে শত্রু খাড়া। অবশ্য এ ছিলো ইউবি-৬৫ কে পরখ করে দেখা। কোনো যুদ্ধযাত্রা নয়। এই তো সুযোগ। সাগরের তলায় গিয়ে হাজির এক ডুবে। কোনোভাবেই বাগে আনা গেল না তাকে। ক্যাপ্টেন আর নৌসেনাদের সব কেরামতি



www.pathagar.org

কারা যেনো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলো। তাদের ইচ্ছা ছিলো ডুবোজাহাজটির চলবে পানির তিরিশ ফুট তলা দিয়ে। কিন্তু সব সাধ্য-সাধনা বিফলে গেলো। ইউবি-৬৫ সাগরের তলায় গিয়ে তবেই থামলো। কোনো খুঁত নেই। তবে এমন কান্ড ঘটলো! এতে কে না ভয় পায়। মানুষের সাহসের থলেটিই বা আর কত বড়! সেনারাও ভয় পেয়ে গেলো। ক্যাপ্টেনও। শরীরে ভয়ের হালকা জ্বর।

কী আর করা! পানির তলায় বসে থাকলে তো চলবে না। ঘরে ফিরতে হবে। একটানা বার ঘন্টা খাটাখাটির পর ডুবোজাহাজটি নড়তে চড়তে রাজি হলো। পানির ওপরে উঠে এলো ইউবি-৬৫।

এবার আর এক খেলা। সাগরের তলা থেকে ওঠে এসে ক্যাপ্টেন ইউবি-৬৫ কে নিয়ে হাজির হলো কারখানায়। কারণ কিছু মেরামতির দরকার। বার ঘন্টা তক কতো কেরামতিই চলছে এর পেটে পিঠে আর হাড্ডি গোশতে। তাই দেখা প্রয়োজন, কোথায় বসে আছে লালচোখা জীবাণু চুপচাপ। সেখানে টুকটাক মেরামতিও হলো বেশ সুস্থ ইউবি-৬৫ ।

এখন যুদ্ধযাত্রার আয়োজন। পানি কেটে কেটে বাড়তে হবে আগে। টর্পেডো নিশানা করতে হবে দুশমন জাহাজের পেট বরাবর। তাই গোলাবারুদ উঠানো হলো। সাজানো হচ্ছিল টার্পেডো দিয়ে ইউবি-৬৫ কে। ঠিক এমনি সময় বিতিকিচ্ছি কান্ডটা ঘটলো। একটি তরতাজা টর্পেডো ফেটে গেলো আচমকা। কেঁপে উঠলো জাহাজ। পানি। আর সেনাদের হৃদয়ের গাছ-গাছালি। এতে করে জানও গেলো পাঁচজন সেনার। সাথে একজন নৌ অফিসারের হৃৎপিন্ডও এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো টর্পেডোর স্প্রিন্টার। ফ্রেডারিক যার নাম। কিছু ভাঙচুরও হলোও হলো ইউবি-৬৫ এর।

আবার মেরামতের দরকার হয়ে পড়লো। করাও হলো। মেরামতের কাজ তখনো শেষ হয়নি। সে সময় অবাক করা ব্যাপারের সূচনা। ফ্রেডারিককে দেখা গেলো ইউবি-৬৫র ডেকে হাঁটাহাঁটি করছে। যেনো মেরামতির কাছে তদারকি করছে এমনি একটা ভাব তার চেহারায়। ক'দিন আগেই যে ফ্রেডারিক টর্পেডোর আগুনে পুড়ে মরলো, সে কী করে এলো এখানে? দু'জন অফিসার ফ্রেডারিককে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছিল। তারা দু'জনই ইউবি-৬৫'র অফিসার। মরা মানুষ কখনো জিন্দা হয়েছে এমন অবাক করা কথা তারা কারো কাছে শোনেনি। তাছাড়া গোলার আঘাতে যার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত সব খুলে খুলে গেলো ক'দিন আগেই, তার এমন জলজ্যান্ত হাজিরায় দু'জন অফিসারই ভয়ে কাঠ। যোদ্ধার সাহস তখন চুপসে এলো। বাতাসহীন বলের মতো। কী করা! পালাতে হবে এ আজব এলাকা থেকে। জান নিয়ে। যুক্তি করলো দু'জনই। করলোও তাই। তারা আর ইউবি-৬৫ তে পা রাখলো না। গোপনে সরে পড়লো। কিন্তু বিধি বাম। জান নিয়ে আর ঘরে ফেরা হলো না। হারিয়ে গেলো তারা। চোখের আড়াল হলো। কতো অনুসন্ধান হলো। খোঁজাখুঁজি হলো। কিন্তু ফল এলো শূন্য।

কয়েকদিন পর। ডুবোজাহাজটি নামানো হলো সাগরে। ডুব দিলো। এবার পুরোপুরি যোদ্ধার পোশাক আশাক। কোনো উৎপাত নেই। মাছের সাথে পাল্লা দিয়ে আগে বাড়ছে। আর ইতিউতি নজর। কখন কার কলিজা এফোঁড় ওফোঁড় করা যায়। অবশ্য সবার নয়। দুশমনের। সহি সালামতেই কাটলো পানির তলার সময়গুলো। তারপর



www.pathagar.org

ভেসে উঠলো একেবারে ইউরোপের সমুদ্র উপকূল ঘেঁষে। একদিন। যেনো এক ঢাউস রাজহাঁস কিছুটা সময় জিরিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চুতে ঘষে সাফ করছে নরম পালক। মাথায় ঠোঁটে পানির সাদা সাদা কণা। এমন যখন মুহূর্তগুলো, তখনই ফ্রেডারিক এসে হাজির। জাহাজের ডেকের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। সামনে মেলে ধরা নজর। ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে তার গায়ে, শরীরে। কিন্তু ফ্রেডারিকের কোনো নড়চড় নেই। তাজ্জব ব্যাপার। পোশাক ভিজছে না তার। জাহাজের দু'জন অফিসার দেখলো গা শির শির করা এ কান্ড। বুকে অনেক সাহস জড়ো করে একজন অফিসার ডাক দিয়ে বসলো ফ্রেডারিককে। কিন্তু ডাক শুনেই ফ্রেডারিক হাওয়া। এমন কায়কারবারে কার না ভয় হয়? আবারো অথৈ সাগরের ব্যাপার। এ খবর কান থেকে কানে চলে গেলো জাহাজের সবার। এতে ভীষণ একটা ভয় কারো দৈত্যের মতো সবার মনে দরজায় এসে খাড়া হয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন চাইলো ডুব দিয়ে একেবারে গভীর পানিতে চলে যাবে। বাঁচা যাবে মরা ফ্রেডারিকের হাত থেকেও। কিন্তু জাহাজের আর সব নৌ সেনা বাদ সাধলো কারণ ভয়। ভয়, কী জানি ফ্রেডারিক আবার পানির তলায় নিয়ে গিয়ে সবাইকে ডুবিয়ে মারে কিনা। তাই গভীর পানিতে যাওয়া হলো না। আর ইউবি-৬৫র। ডুবসাঁতারে এসে হাজির হলো তারা জার্মানিতে। জাহাজের লোকেরা ভয়ে ভয়ে রাত কাটায়। দিন কাটায়। আবার কোনো ভুতুড়ে আলামতের খপ্পরে পড়তে হয় কে জানে। যেভাবে পেছনে লেগেছে তারা! হলোও তাই।

ইউবি-৬৫ থেকে নেমে ক্যাপ্টেন যাচ্ছিলেন বাড়ি। কিন্তু পৌঁছার বহু আগেই সব শেষ। কারা যেনো তাকে কেটে কুটে পথেই রেখে গেলো। এ খুনের কোন হদিস মিললো না। কতো গোয়েন্দা ফোয়েন্দা ঘুরলো। তাদের সব বিদ্যা পানি হাবুডুবু খেলো। পরপর আরো দু'জন ক্যাপটেন এ ডুবোজাহাজের হাল ধরেছিলো। কিন্তু তাদের নসি মন্দ। মারা পড়লো একদিন। তাও দুর্ঘটনায়। যে দুর্ঘটনার কোনো হালসাকিন কেউ পায়নি। তাদের দু'জনেরও নাকি ফ্রেডারিকের সাথে মুলাকাত হয়েছিল।

আর একদিনের কথা। সীমানা পাহারায় ব্যস্ত ইউবি-৬৫। সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়েই আসছিলো সে। আর নজর রাখছিলো দুশমনের চলাচলের ওপর। এমন সময়ই ঘটল অঘটন। ফ্রেডারিক এসে হাজির আবার। আগের মতোই কী সুন্দর হাঁটছে জাহাজের ছাদে! হাবভাব এমন, যেনো এইমাত্র জাহাজের ভেতর থেকে উঠে এলো। একজন গোলন্দাজের নজরে পড়লো এ দৃশ্য। তখনই সে কামান দাগলো ফ্রেডারিককে নিশানা করে। কিন্তু হায় কপাল। ফ্রেডারিক বুক টান টান করে হাঁটলো। তার চলাচলে তেমন কোনই অসুবিধা হলো না। বরং গোলাগুলোই নষ্ট হলো। ধোঁয়া হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলো। আর অন্য দিকে বেচারা সৈনিকটিরই চোখ বড় বড় হয়ে গেলো ব্যাপার দেখে। সে নিজেই পানিতে ঝাঁপ দিলো দিশেহারা হয়ে। সাগরের ঢেউ তাকে মুহূর্তে টেনে নিলো তলায়। ফ্রেডারিক কিন্তু ততক্ষণে উধাও। এর পরপরই ঘটলো আরেক বিপদ। হঠাৎ করেই ডুবোজাহাজের তলা ফুটো হয়ে পড়লো। বিনা কারণে। পানি ঢুকছে শোঁ শোঁ করে। ক্রু, স্টাফ ও অফিসারেরা তখন ভয়ে জড়োসড়ো। এক বিপদ না যেতেই আর এক বিপদ এসে হাজির। কী করা যায় ভাবছিল তারা। সবাই মিলে। এমন সময় আবার ফ্রেডারিকের হাজিরা। নৌ সেনাদের প্রায় গা ঘেঁষেই সে এসে দাঁড়ালো। ঠোঁটে



www.pathagar.org

মুচকি হাসি ঝুলছে। যেনো বলতে চাইছে, আমাকে গোলা মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে, তাই না? জাহাজ ফুটো করে দিলাম। এখন বোঝো!

মরা ফ্রেডারিককে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারাতো একেবারে হতবাক। মাথার চুল খাড়া হবার জোগাড়। বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেলো কারো কারো। আবার কারো কমে এলো। মুখের শব্দ মুখেই ঘুরপাক খেলো। বাইরে আসার আর সাহস পেলো না। কয়েকজন সংজ্ঞা হারালো সাথে সাথে। আর দু'জনের মগজে দেখা দিলো গড়বড়। তারা দু'জনেই নাচতে নাচতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগরে। এই ফাঁকে কিন্তু ফ্রেডারিক হাওয়া।

উপায় নেই। তাই কোনো মতে অন্যান্যরা ডুবোজাহাজটি তীরে এনে ভেড়ালো। আবার মেরামত। জার্মান সরকার পড়লো বিপাকে। এসব ভুতুড়ে ব্যাপার স্যাপারেরও কোনো কূলকিনারা করতে পারছে না। তাই বলে ইউবি-৬৫ কে বসিয়ে রাখা কিন্তু মুশকিল। যুদ্ধ তখন সপ্তমে। তার ওপর আবার পুরানো নৌসেনারা ইউবি-৬৫ তে আর যেতে চাচ্ছে না। ভুতুড়ে ভয়। জানের ভয়।

এখন নতুন বুদ্ধি। যারা ডুবোজাহাজের ভুতুড়ে কান্ডের খবর রাখে না, তাদেরকে আনা হলো। সব নতুন। ক্যাপ্টেন কর্মচারী গোলাবারুদ সব। নতুন নাবিক, নতুন ক্যাপটেন নিয়ে ইউবি-৬৫ র আবার যুদ্ধযাত্রা। সাগরে নামানো হলো। ডুব দিলেপ ইউবি-৬৫। যেনো ডুব দিলো টুপ করে। কিন্তু কে জানতো এ ডুবই তার শেষ ডুব। এর পর সাগরের তল চষে ফেলেও ইউবি-৬৫র আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না। এতোগুলো মানুষ আর আস্ত একটা ডুবোজাহাজ নিয়েই যেনো পালিয়ে গেল ইউবি-৬৫। অজানা জগতের বাসিন্দারা একেবারে চোখের আড়াল হয়ে গেলো।

এরপর বেশ কিছুদিন চলে গেছে। হারিয়ে যাওয়া ডুবোজাহাজের আশায় ইতি টেনেছে জার্মানরা। বিপক্ষ দলের মনের ভেতরেও খুশি টুকটুক করে হাঁটে। যাক বাবা, বাঁচা গেলো। এমনি যখন সময়, তখন আবার ইউবি-৬৫। সাথে ফ্রেডারিক। একজন মার্কিন নৌ অফিসারের দূরবীনের কাচে এসে আটকে গেলো একদিন আগে হারিয়ে যাওয়া সেই জার্মান ডুবোজাহাজ। অফিসার চোখ ঘষে নিয়ে দূরবীন চোখে লাগলো আবার। না, ভুল দেখেছে না। ইউবি-৬৫ই সেটি। কিন্তু জনমানুষের সাড়া নেই। তবে ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেডারিক একা। বুকে ভাঁজ করা হাত। নজর সামনে মেলে ধরা। ঢেউয়ে ভেসে ভেসে সে নজর তীরে গিয়ে উঠছে। মার্কিন অফিসারটি ভাবলেন, কামান দাগার হুকুম দেবেন। বলা তো যায় না। কখন কী বিপদ ঘাড়ে এসে সওয়ার হয়! মনের কথা মনেই থাকলো। আদেশের আগেই বিকট আওয়াজ। খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সাগরে ইউবি-৬৫'র শরীর গতর কলকব্জা। হয়তো সাথে ফ্রেডারিকও। তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলো সব। তখন সময় উনিশশ উনিশ সালের উনিশে জুলাই।

জুলাই, ১৯৯৬



www.pathagar.org

# অচেনা অশ্বারোহী

মূল : জাকের থানভী

তরজমা : মতিউর রহমান মল্লিক

www.pathagar.org

শত বছর আগের কথা। পশ্চিমের ছোট্ট এক গ্রাম। আহমদ নামের একটি ছেলের বাস সেই গ্রামে। গ্রামটি এমন একটি পথের পাশে, যে পথ দিয়ে ব্যবসায়ীদের যাতায়াত চলে নিত্যদিন। আহমদের পিতা সরাইখানায় চাকরি করে, যেখানে ঐ ব্যবসায়ীরা কখনও এসে অবস্থান নেয়। আর ব্যবসায়ীদের আগমন হলেই আহমদের আব্বার উপার্জন ও ব্যস্ততা দুই-ই বেড়ে যায়। সাধারণত দু'তিন দিন বাদে কোনো ব্যবসায়ী কাফেলা আসে। রাতে অবস্থান করে সকালে আবার রওয়ানা হয়। কখনও এমন হয় যে অনেকদিন পর্যন্ত কোনো কাফেলা আসে না। আহমদের আব্বার অস্থিরতা তখন বেড়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে এমনই ঘন ঘন আসে যে, আহমদের পিতার একটানা কয়েকদিন পর্যনন্ত ঘরেও ফেরা হয না। অবশ্য আহমদদের পরিবার এই অনিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কখনও আহমদ গ্রামের ঐ পথে ঘোরাফেরা করে কাফেলার যাতায়াত দেখে। ঘোড়া ও মোষের গাড়ি অথবা কখনো দীর্ঘ উটের সারি দেখে সে খুবই খুশি হয়ে ওঠে। এগুলো তার ভারি প্রিয়। যখন আবার সে অশ্বারোহী সরকারি সৈন্যদের অতিক্রম করতে দেখে তখন ভাবে, যদি সে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যেত, তাহলে এদের মত বিদ্যুৎ গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সুদূরে হারিয়ে যেতো। কিন্তু সৈন্যদল এক সময় দিগন্তে বিলীন হয়ে গেলে সে শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

একদিন আহমদ যথারীতি কাফেলার অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় দূরে, যেখানে এক অশ্বারোহী উড়ন্ত ধূলি পেছনে ফেলে এদিকেই ছুটে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহী আহমদদের ঠিক সামনে এসে থামে এবং সালাম দেয়। সালামের উত্তর দিয়ে আহমদ তাঁর মুখোমুখি হয়। অশ্বারোহী প্রশ্ন করে তাকে,

– কি নাম তোমার?

– আহমদ। আপনি কোত্থেকে আসছেন? কোথায় যাচ্ছেন?

আহমদের প্রশ্ন শুনে অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে জবাব দিল:

– আমার গভর্নরের একটি জরুরি বার্তা নিয়ে দামেস্কে যাচ্ছি। খুব শিগগিরই সেখানে পৌঁছাতে হবে, তা তুমি কি কর?

– জি না, তেমন কিছু করি না।

– আচ্ছা, তুমি ঘোড় সওয়ারীও কর না? অশ্বারোহীর প্রশ্ন।

– না, আমার আব্বা অত্যন্ত গরিব লোক। ঘোড়া কিনে দেবার সামর্থ্য তার কোথায়– যদিও ঘোড়ায় চড়ার ইচ্ছা আমার প্রবল এবং পুরোনো। কিন্তু ইচ্ছে তো আর সব নয়, পূরণ করার সাধ্য নেই যে!

আহমদের কণ্ঠ কেমন বিষণ্ন।

– কোন চিন্তা করো না। দামেস্ক থেকে ফিরতি পথে তোমার জন্য ঘোড়া নিয়ে আসবো, কেমন!

– সত্যি! আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় আহমদ।



www.pathagar.org

– হ্যাঁ, হাঁ সত্যি। অশ্বারোহী জবাব দেয়। এবার আমাকে দ্রুত সরাইখানার পথটা দেখিয়ে দাওতো। আর হ্যাঁ শোন, ঠিক আজ থেকে বিশ দিন পর তুমি এখানেই আসবে। আসবে কিন্তু। এ কথা বলেই অশ্বারোহী আমহদের দেখানো পথ ধরে চলতে শুরু করে।

সন্ধ্যায় আহমদের আব্বা যখন ঘরে ফিরল, তাকে খুব আনন্দিত মনে হল।

আহমদের মা জিজ্ঞেস করে,

– বিশেষ কিছু পেয়েছ নাকি, এত খুশি খুশি লাগছে যে?

আহমদের আব্বা হেসে জবাব দিলেন:

– আজ সরাইখানায় এক অশ্বারোহী জোয়ান এসেছিল, দামেস্ক যাবে বলে জানিয়েছে, আমার খেদমতে খুশি হয়ে আমাকে সে দশ দশটি স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দিয়েছে।

– দশটি স্বর্ণ মুদ্রা! আহমদের মায়ের কণ্ঠে একই সাথে অবিশ্বাস ও বিস্ময়।

– হ্যাঁ গো, দশটি স্বর্ণমুদ্রা। এবার একটু জোর দিয়েই বলল আহমদের আব্বা।

– অনেক দিন পর্যন্ত নতুন কাপড় পরি না। প্রায়গুলোই পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গেছে। প্রথমেই কিন্তু কাপড় বানাতে হবে।

– আহমদের মা প্রস্তাব দিল।

– হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। আমরাতো অনেকদিন ভাল খাবারও খাই না। আহমদের আব্বা বলল।

কিছুক্ষণ পর সেখানে আহমদ উপস্থিত হলে আব্বা তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

– আহমদ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

– ঐ তো ঐ রাস্তায় গিয়েছিলাম, কাফেলা এসেছে কিনা দেখতে।

– কিন্তু কোনো কাফেলাতো আজ আসেনি। আহমদের আব্বা বলল।

– ঠিক বলেছেন আব্বাজান। কিন্তু একজন অশ্বারোহী অবশ্য এসেছিলেন। তিনি আমাকে একটি ঘোড়া এনে দেবেন বলে ওয়াদা করে গেছেন।

– অশ্বারোহী কে? – আহমদের আব্বা জিজ্ঞেস করলেন।

– নামতো জানা হয়নি, তবে তিনি গভর্নরের বার্তা নিয়ে দামেস্ক যাচ্ছেন।

অবশেষে আহমদ ঘটনাটি বিস্তারিত বলল।

– হ্যাঁ এই সেই অশ্বারোহী যে আমাকে দশ দশটি স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দিয়েছে।

– আহমদের আব্বা বলল।

তিনি খুব ভাল মানুষ।

– হ্যাঁ, আহমদ। সব মুসলমানই ভাল হয়ে থাকে। দেখবে ফেরার পথে সে সত্যিই তোমার জন্য ঘোড়া নিয়ে আসবে। কারণ মুসলমান ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূরণ করে।

– আব্বাজান, তাকে আমার খুব ভাল লেগেছে এবং আমি তাকে কখনও ভুলবো না। তিনি যদি আর নাও আসেন, তবুও আমি মনে রাখবো। – আহমদ বলল।



www.pathagar.org

– তুমি নিশ্চিত থাক বেটা, সে আসবেই। দৃঢ়তার সাথে বলল আহমদের পিতা।
সেদিনের পর থেকে প্রতিদিন আহমদ বড় রাস্তার পাশে গিয়ে বসে অশ্বারোহী যুবকের জন্য অপেক্ষা করতো। ঠিক বিশ দিন পরই ঐ অশ্বারোহী আহমদের সাথে সেই নির্ধারিত স্থানেই দেখা করল।
– আসসালামু আলাইকুম, আহমদ। এই হলো আমার দোসত জাকি। জাকি, এই হলো আহমদ, যার জন্য ঘোড়া নিয়ে এসেছি।
জাকি ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম আহমদের হাতে দিয়ে বলল,
– এবার এটা নাও দেখি। সামলাও। তুমি যদি একে যতন করো তাহলে দেখো, তোমাকেও সে যত্ন করবে। আহমদ ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে ধরলো।
– জাকি, তুমি আমার ঘোড়ায় এসো। অশারোহী অনুরোধে জাকি তার সাথেই বসলো। অশ্বারোহী এবার আহমদের দিকে ফিরলো।
– চলি ভাই, আমার খুব জরুরি কাজ আছে। শীঘ্রই গভর্নরের সাথে দেখা করতে হবে। অনুমতি দাও। বেঁচে থাকলে, আল্লাহ্ চাহেন তো আবার দেখা হবে। আহমদ, খুবই দুঃখিত হল একথা শুনে, ঠিক যতটা খুশি হয়েছিল ঘোড়াটি পেয়ে। অশ্বারোহীকে বিদায় জানাতে আহমদের দুচোখ বেয়ে অশ্রুর বৃষ্টি ঝরতে লাগলো। তাকে কাঁদতে দেখে অশ্বারোহী সান্ত্বনার সুরে বলল,
– পুরুষ মানুষ কাঁদে না। তোমাকে একদিন জেনারেল হতে হবে আহমদ। একথা বলেই অশ্বারোহী ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো এবং অতি শীঘ্র দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল। যেখানে আকাশ মাটিতে মিশেছে সেই পর্যন্ত আর দেখা হল না। আহমদের ঝপসা হয়ে এলে যেন দুচোখ।
আহমদ ঘোড়া নিয়ে বাড়ি এলো। আব্বা আম্মাকে অশ্বারোহীর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা বলল। তাঁরা খুব খুশি হলেন। বললেন,
– এখন থেকে কিন্তু এর প্রতি যত্ন নেবে।
প্রতিদিন খুব সকালে ঘোড়াটি নিয়ে আহমদ বেরিয়ে পড়ে। ঘোড়াটি ছুটিয়ে অনেক দূর চলে যায়, ঠিক যেমনটা কিছুদিন আগেও সে শুধু ভাবতো। তারপর এক সময় ক্লান্তিতে ঘোড়া নিজে থেকে থেমে গেলে, আহমদ কোনো গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দেয়। ধীরে ধীরে সে এভাবে ক্রমাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তীর নিক্ষেপ ও অশ্বারোহণের যাবতীয় কৌশল আয়ত্ত করে। যার কারণে গ্রামের লোকেরা আহমদকে খুব সমীহ করতে শুরু করে।
এটা সেই যুগের ঘটনা যখন খ্রিষ্টানরা পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করার জন্য সীমান্তে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল। এ খবর পেয়ে মুসলিম সামরিক বাহিনী তাদের দমন করার জন্য আহমদদেরই গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। খ্রিস্টানদের আচরণে আহমদ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিল।
রণাঙ্গনে আহমদের শৌর্য বীর্য ও বীরত্ব তাকে এমন স্থানে পৌছে দিল যে শত্রুরাও তার



www.pathagar.org

প্রশংসা করতে লাগলো। সে যখনই কোনো একদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো, সে দিকের শত্রু ব্যূহ ভেঙে তছনছ করে দিতো। শত শত দীনের দুশমনকে খতম করতো নিমেষেই।

বীরত্ব শৌর্য বীর্যের ফলে পুরো সেনাবাহিনী আহমদের নাম পর্যন্ত অত্যন্ত সম্মানের সাথে উচ্চারণ করতো। যুদ্ধের দশম দিনে মুসলমানেরা প্রচন্ড আক্রমণের মুখোমুখি হলো। সেনাপতি ইউসুফ শাদীদ আহত হলেন। এ খবর আহমদের কানে পৌছা মাত্র বিদ্যুৎগতিতে সে সেদিকে ছুটলো। আহমদ দেখতে পেল, মাটিতে পড়ে আছেন সেনাপতি এবং তার চারপাশে ক'জন মুসলমান মুজাহিদ পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতির তখন অন্তিম অবস্থা।

আহমদ দ্রুত সেনাপতির মাথা নিজের কোলের ওপর সযত্নে রাখলো। মাথার পাগড়ি, যেটা তাঁর মুখমন্ডলের বেশির ভাগ স্থান দখল করেছিল, আলতোভাবে খুলে ফেললো। সেনাপতির চোখ প্রায় বন্ধ ছিল। তবুও আহমদকে চিনতে তার দেরি হল না। আহমদও বিস্ময়ে দেখতে লাগলো। সেই অশ্বারোহীকে যে শৈশবে তাকে একটি ঘোড়া উপহার দিয়েছিল।

সেনাপতির ঠোঁট নড়ে উঠল হঠাৎ। সকলে অধীর। কিছু বলবেন তিনি। বেশ কিছু সময়। নিয়ে সেনাপতি ধীরে ধীরে শুধু এটুকু বলতে পারলেন,

– আমি নিশ্চিত, আমার ডাক এসেছে। তোমরা এখানে যারা আছো, মনোযোগ দিয়ে শোন আমার পরে তোমরা আহমদের নেতৃত্ব মেনে নেবে, তার নির্দেশে চলবে।

আহমদ আকস্মিক এই মহান দায়িত্বের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলতে লাগলো,

– না, মহামান্য সেনাপতি– আমি সামান্য একজন সৈনিক মাত্র আমি এর উপযুক্ত নই।

আহমদ ঝুঁকে পড়ে সেনাপতিকে আবারও এ কথা বলতে গেল, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে সে কথা আর প্রকাশই পেল না। ততক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেনাপতি।

শৈশবের সেই অচেনা অশ্বারোহী।

যুদ্ধ-বিজয়ের পরে সেনাবাহিনী যখন দামেস্কে পৌছল তখন সেখানকার খলিফা আহমদের বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে অবগত হলেন এবং আনন্দিত হয়ে আহমদকে মুসলিম জাহানের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন।

জুন, ১৯৮৮



www.pathagar.org

# বাঘ বাহাদুর

আবদুল হাই শিকদার

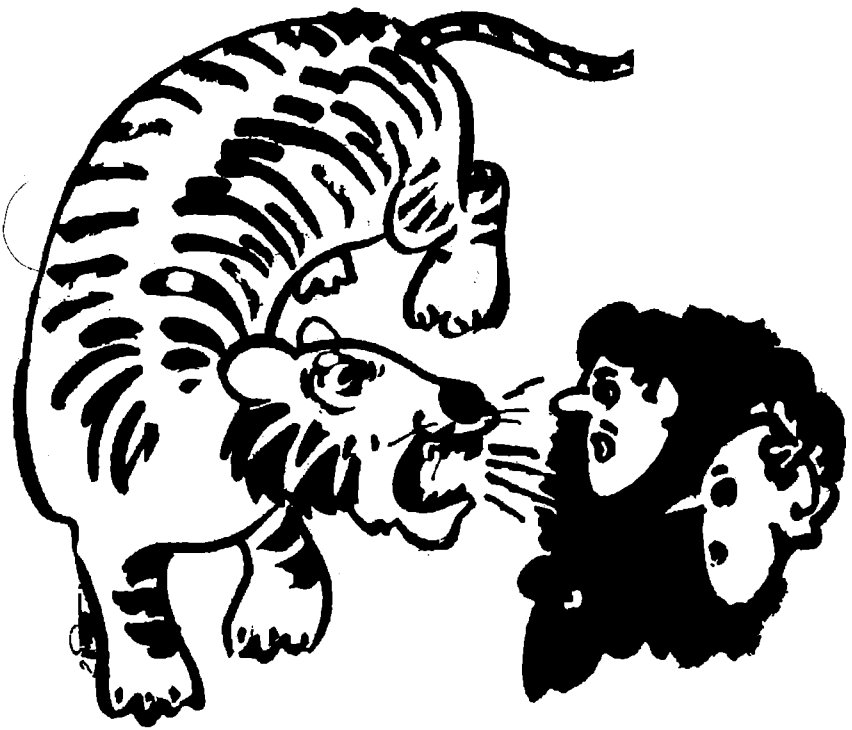

www.pathagar.org

এক.

মেঘের মত গম্ভীর, পাথরের মতো শক্ত আর বরফের মতো ঠান্ডা গলায় বাঘ বললো, 'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু কাগজটা জালটাল নয় তো?'

মুহূর্তে সফদর মামার চেহারা সাদা। একটা হে হে মার্কা হাসি দিয়ে বললেন, কি যে বল বাঘ! বাঘ বললো, এভাবে কথা বললে খুবই খারাপ লাগে। আমি রয়েল বেঙ্গল গ্রুপের বাঘ। নাম হুঙ্কার আলী। বাপ ওঙ্কার মিয়া। সাকিন সুন্দরবন। জীবনে হরিণ মেরেছি ১৭৫টি। শিয়াল, বানর, খরগোস এগুলো তো গোনার মধ্যে ধরি না।

৩৬টি বাঘ-লড়াইয়ে আমি হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। আমার সাথে এভাবে কথা বলা ঠিক না।'

সফদর মামা বললো, এইরে কি বলতে কি বলে ফেলেছি। তা বাঘ ভাই... বাঘ গলা খাকারি দিয়ে মামাকে দিলো থামিয়ে।

বললো, 'দ্যাখো, আমি হলফ করে বলতে পারি মানুষ আর বাঘ কখনও ভাই হতে পারে না। তা ছাড়া আমি তো ভোটে দাঁড়াচ্ছি না। কেন আমাকে খামখা ভাই ডাকা।'

সফদর মামার সকল কর্মের দোসর আমাদের মহল্লার মহা ইঁচড়ে পাকা ফিচকেল ফটাশ করে বলে বসলো, 'আসল ব্যাপার হইলো কি মিস্টার বাঘ...' ফিচকেল কথা শেষ করার আগেই গররর...র করে উঠলো বাঘ, 'কি আমার সাথে ইয়ার্কি! মি. বাঘ আবার কি? আমি কি মি. বিন, আমি জোকার? না কি? গররর.. র. র।'

সফদর মামা আর ফিচকেলের দুই হাঁটু তখন ঠক ঠক করে একটার সাথে আরেকটা বাড়ি খাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে দু'জনে পড়ে যায় আর কি!

তবুও কদ্দুর সাহস সঞ্চয় করে মামা বললো, মানে বলছিলাম কি স্যার...'

– খামোশ! গর্জন করে উঠলো বাঘ, 'আমি কি মাস্টারি করি। অ্যা! ছাত্র পড়াই?'

মামা আর ফিচকেল তো আর নেই, গেছিরে...!'

হঠাৎ কথা থামিয়ে বাঘ বললো, 'কি ব্যাপার, তোমাদের প্যান্ট ভিজে গেল কি করে? ওমা প্যান্টের নিচ দিয়ে পানি পড়ছে কেন?'

কাঁপতে কাঁপতে মামা বললো, 'না, মানে ওই ফিচকেল একটু ভীতু তো। তাই ইয়ে মানে, হিসু করে দিয়েছে।'

থতমত খেয়ে ফিচকেল বললো, 'মামুও একই কাম করেছে বাঘ বাহাদুর।'

বন কাঁপিয়ে হা হা হা করে হেসে উঠলো বাঘ।

আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো ফিচকেল। কাৎ হয়ে পড়লো মামার ওপর। মামা পড়লেন গাছের ওপর। গাছসহ গড়িয়ে পড়লেন মাটিতে। অতঃপর বেহুঁশ।

দুই.

লেজ দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বাঘ বললো, বেশ বিপদেই পড়ে গিয়েছিলাম। বনে



www.pathagar.org

তো আর তোমাদের ঢাকার মতো হাসপাতাল নেই। আছে 'গাছচাতাল'। তাও আবার বনের প্রাণীদের জন্য। কি আর করা। অগত্যা সেখানেই আনলাম। সফদর মামা আর ফিচকেলের হুঁশ ফিরেছে। চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে দ্যাখে, ইয়া বড় কালো ভালুক থমথমে মুখে, কানে স্টেথিসকোপ লাগিয়ে গন্ডারের বুক পরীক্ষা করছে। আর নানা রকম ওষুধপত্র নিয়ে হরিণ, শিয়াল আর গাধাগুলো আসা-যাওয়া করছে।

বেশ কিছু প্রাণী শয্যাশায়ী। এর মধ্যে হাতির খুব সর্দি। চিতাবাঘ ভুগছে হাইপারটেনশনে। খরগোসের ভেঙেছে ঠ্যাং। কাকাতুয়ার হয়েছে স্বরভঙ্গ। কাঠবিড়ালীটার খুব জ্বর। তবুও সে পিট পিট করে এদিকে সেদিক তাকিয়ে দেখছে।

বাঘ বললো, 'তা বাপুরা চল বাইরে। তোমাদের কারবার দেখে বনে সব পশুপাখি এসেছে দেখতে। তারা বাইরে অপেক্ষা করছে।

ফিচকেল বললো, 'সব পশুপাখি দেখতে এসেছে শুনে মামুর খুব পিস্টিজে লাগছে।'

বাঘ বললো, 'তা পিস্টিজ আবার কি জিনিস?'

ফিচকেল বললো, 'এই ইজ্জত একটু সম্মান আর কি!'

বাঘ হাসেত হাসতে বললো, 'তোমরা মানুষ বড় আজব চিজ। বড় ঠুনকো। তাবৎ প্রাণীর বাচ্চারা মায়ের পেট থেকে নেমেই একা একাই লাফালাফি করে বেড়ায়। আর তোমাদের গুলোকে নাকি দীর্ঘদিন ধরে ধরে খাওয়াতে হয়। হাগু মুছে দাও। মুখ মুছে দাও। কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াও। এতোটাই অপরিণত মগজ নিয়ে তোমাদের জন্ম। শোন, এই বনে এর আগে আর কোনো মানুষ তো বেহুঁশ হয়নি। তা ছাড়া বনের গাছচাতালে কারো চিকিৎসাও হয়নি। এটা আমাদের জন্য একটা 'বন রেকর্ড'। কত বড় গর্বের একটা ব্যাপার। অন্য বনের প্রাণীরা এখন আমাদের বনে আসবে বেড়াতে। এই আনন্দে সবাই এসেছে। চল, চল, ওখানে গিয়েই তোমাদের কথা শোনা যাবে।'

তিন.

বাঘের সঙ্গে গাছচাতালের বাইরে এসে সফদর মামা আর ফিচকেল তো অবাক।

ওরে বাবা পুরো বন যে ভেঙে পড়েছে। হাতি, গন্ডার, বাঘ, হরিণ, বাইসন, চিতা, বানর, শিয়াল, সজারু, গুইশাপ, অজগর, বেজি, বনরুই, গাধা, দোয়েল, কোয়েল, কাকাতুয়া, টিয়া, ঘুঘু, ঈগল, বাজ, চিল, চড়ুই, ময়ূর, শূকর আরও যে কত পশুপাখি! ওদের দু'জনকে দেখে সবাই একসঙ্গে হইচই করে উঠলো। 'মানুষ, মানুষ ওই যে মানুষ।'

ছোট বাবু খরগোস তার মাকে বললো, আম্মু, মানুষেরা কি খায়?'

মা বললো, 'আর কি খায় তা তো জানি না, শসা, গাজর খায় বলে শুনেছি।

পাশে থেকে বুড়ো হরিণ বললো, খালি গজার নয়। ওরা যা পায় তাই খায়। আমাদের হরিণদের তো পেলেই মারে।



www.pathagar.org

এরই মধ্যে সিংহ এলো হেলে দুলে। সবার বড় সিংহ বললো, 'ঘটনা কি বাঘ?'
বাঘ বললো, সে কথাই তো বলছি। এ হলো সফদর। ও হলো ফইচকা। এসেছে ঢাকা থেকে। বাঘ শিকারে।
ফিচকেল তোতলাতে তোতলাতে বললো, 'ইয়ে বলছিলাম কি, বাঘ বাহাদুর, যদি আপনে আপনার মেজাজটা গরম না করেন তাইলে বলি কি, কথাডা তো মাইনসের, তাই আমরার কথা আমরারা কইতে না পারলে পিস্টিজে লাগে।'
বাঘ বললো, 'সেই ভালো।'
এর মধ্যে সফদর মামা বললো, 'ফিচকেলরে তুই চুপ যা। আমিই না হয় বলি।'
ফিচকেল বললো, মামা এহনও আপনের কাঁপন যায় নাই। তা ছাড়া কথা কওনের টাইমে আপনি যে হারে উল্টা পাল্টা কন, কথা যেমনে জড়ায়া ফেলান, তার চাইতে আমিই কই?'
মামা বললো, 'ঠিক আছে তুই-ই ক।'
ফিচকেল গলাটলা ঝেড়ে কেশে পরিষ্কার করে বললো, 'মহামান্য সিংহ, জ্ঞানী হাতি, চামড়া পুরু গন্ডার, ভারবাহী গাধা, মুরগিচোরো শিয়াল, সুন্দরী ময়ূর এবং পরম শ্রদ্ধেয় বাঘ বাহাদুর আসসালামু আলাইকুম।
হঠাৎ ঝট করে উঠে দাঁড়ালো শিয়াল।
বললো, 'বন বিধানের ১৬৪-খ অনুচ্ছেদের ১১ নম্বর ধারা মোতাবেক বিনা কারণে কারো নামের আগে খারাপ শব্দ বিশেষ করে মুরগিচোরার মতো খারাপ শব্দ ব্যবহার করা শোভন নয়।'
গাধা বললো, আমিও খুরাবজেকশন জানাচ্ছি। আমাকে ভারবাহী বলা হয়েছে, এটা রীতিমতো বনবিধান লংঘন।'
দেখতে দেখতে শোরগোল আরম্ভ হয়ে গেল। কত রকম যে আওয়াজ। বানরদের কিচির মিচির আর লম্ফ ঝম্ফ সবার ওপর দিয়ে।
সিংহ ঠাস করে থাবা মারলো মাটিতে। অমনি সব চুপ।
বললো, 'ওরা বনের কেউ না। ওরা হলো মানুষ। বনের আইন কানুন জানে না। বলুক না বললেই তো সব হয় না।'
ফিচকেল আবার শুরু করার আগেই মামা কয়েকবার ঢোক গিলে বললেন, 'পরম পশুগণ...'
এবার ধমকে উঠলো ভালুক।
বললো, 'পশু শব্দটি খুব আপত্তিকর। কিন্তু মানুষ তা অহরহ ব্যবহার করে। এটা ঠিক না। রীতিমতো আপত্তিকর। সব সময় পশুর বদলে প্রাণী শব্দটি ব্যবহার করবে।'
মামা ঘাড় কাৎ করে বললো, জি আচ্ছা। হে পরম মহোদয়গণ, ফিচকেল ও আমি মানুষ। আপনাদের মতো জ্ঞান বুদ্ধি নাই। ওর কথায় কেউ কিছু মনে কইরেন না।



www.pathagar.org

আবার শুরু করে ফিচকেল, 'হে বনবাসী বনজ্ঞানীগণ, আমাগো এই মামুর মনে বহুত দুঃখ। একটা খানদানি ঘরের পোলা। এম এ ফেলাট। বাপ মা কেউ নাই। হেই কারণে বয়সকাল শ্যাষ হইয়া যাইতাছে। কেউ বিয়া দেয় না। এক বুলা আপা আর লিসা খালা ছাড়া কেউ আমার লগে ঘনিষ্ঠভাবে কথা কয় না। সেই বুলা আপাও মামুরে উঠতে বসতে জলহস্তি কয়। মামু নাকি খালি খায় দায় আর হাই তোলে।

এর মধ্যে গুইসাপ পয়েন্ট অর্ডারে দাঁড়িয়ে বললো, 'সবই তো বুঝলাম কিন্তু কেউ কাউকে জলহস্তি বললে দুঃখ লাগার কি আছে?'

ফিচকেল বললো, আহারে ভাইরে, আমরা তো মানুষ। হারাম হালাল খাই, তাই বুদ্ধিসুদ্ধি কম। আমার কথাগুলো আগে হোনেন। তয় কইছলাম, মামায় থাকে আমাগো শান্তিনগরের পুরান বাড়িতে। হারাদিন কম্পিউটার নিয়া টিপাটিপি অইল তার কাম আর খালি সিগারেট খায়। মাঝে মধ্যে লিসা খালা আসেন। আইসাই গালাগালি। মামুরে কয় তুই চিরকাল গাধাই থাকবি নাকি? মহা গাধা কোথাকার। খালুজান টেলিফোন করলেই কয়, ওই রামছাগলডা কই, ওকে দাও।'

এতো কিছুতেও আমাগো মামুর কিছু অয় নাই। মামু সব সহ্য করেছে। কাউরে কিছু কয় নাই। মনের দুঃখ মনেই রাইখা দিচ্ছে। কিন্তু মাসখানিক আগে ঘটলো এক ঘটনা। আর ভাইঙ্গা খান খান হইল মামুর ইজ্জত।

অইলো কি, পথের কুত্তা একটা আইতেছিলো দৌড় দিয়া। মামু ভাবছে হেরে কামুড় দিবো। দিছে দৌড়। টুইক্যা পড়ছে অন্য একজনের বাসায়। সেই বাসার মেয়েরা তো হেসে কুটি কুটি। মামু তো গেছে তরাসে। তারা তবুও মামুকে একটুও খাতির যত্ন করে নাই। সহানুভূতি জানায় নাই। উল্টো কইছে কি, মামুয় নাকি একটা আস্ত কাপুরুষ। বিষয়ডার এখানেই শেষ হয় নাই। এক এক করে গোটা মহল্লায় জানাজানি। পথে নামলে দল বাইন্ধা সকলে কয় কাপুরুষ। মামুর তো পিস্টিজ পাংচার। মামু ঘর থাইকা বাইর হইতে পারে না। টিটকারী। ইয়ারকি। রাগে দুঃখে মামু দরোজায় খিল দিল। সারাদিন পরে খিল খুইলা আমারে ডাক দিয়া কয় ক দেখি কি করা যায়?

কইলাম, মামু চলেন আমরা বনে চইলা যাই।

মামু কইলেন, বনে ক্যান?

কইলাম, 'থাকবার জন্য। শহর আর ভাল্লাগে না। যে শহরে সক্কলে আপনার মতো একজন মানুষরে কয় কাপুরুষ, হেই জায়গায় থাকন যায় না আর।'

ঝট কইরা মামু কইলেন, 'ফিচকেলরে, একটা ভেরি গুড আইডিয়া মাথায় এসেছে। চল সুন্দরবনে যাই। বাঘ শিকার করে এনে সবাইকে বুঝিয়ে দেব, আমি কাপুরুষ না বীরপুরুষ।'

কইলাম, 'মামু আপনের লগে তুলনা করবার কোনো লোকই আমি কোথাও দেহি না।'

– ওফ সুন্দরবন! বাঘ শিকার! যা একখান কারবার অইব!



www.pathagar.org

চার.

ফিচকেলের জন্য কাঠবিড়ালীরা ইতোমধ্যে গাছ থেকে পেয়ারা ছিঁড়ে এনেছে। বানররা এনেছে ডাব। ফিচকেল আর সফদর মামা কি করবে ঠাহর করতে পারে না।

সিংহ বললো, 'ঠিক আছে তোমরা ডাবের পানিটুকু খাও। তবে পেয়ারায় কামড় দিও না। তাতে সভার সৌন্দর্য নষ্ট হবে। অন্যদেরও কামড়াকামড়ির কথা মনে হবে। তখন সমস্যা হবে।

ফিচকেল আবার শুরু করে 'আমাগো মামু তো জামদানি শাড়ির মতো খানদানি বংশের লোক। যেই কথা সেই কাজ। শুরু হইল আমাদের গোপন ও পূর্ণ প্রস্তুতি। দুই সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হইলো। মামুর ইচ্ছা ছিলো তিন সদস্যের করবো। কিন্তু জব্বর আলী কিছুতেই রাজি অয় না। জব্বর অইলো মামুর নিজস্ব লোক। খাঁটি লোক। তয় আমার মতো নয়। ওই হালায় খালি ভাত রান্ধে, আর ঘুমায়।

জব্বর আলী কয়, 'আমি মরলে এইহানেই মরমু। সুন্দরবনে আমি যাব না।'

কি আর করা!-

মামু চাইলেন মর্টার কিনবেন। ফিলিপাইন নামে এক আছে দেশ। হেই দেশে আছে মামুর এক ভাই। হেই নাকি মামুরে মর্টার পাঠাইব। তারপর কইলেন চল মেশিনগান কিনি। ঘুরতে ঘুরতে তো অবস্থা খারাপ। এক বন্দুকের দোকানদার তো মামুরে কয়, 'পাগল নাকি।'

মর্টার, মেশিনগান কোনটাই পাওয়া গেল না। তারপর খুঁজলাম একে-৪৭ রাইফেল। আমাগো মাস্তানরা ব্যবহার করে। তাও পাওয়া গেলো না। শ্যাষে জুটলো একটা দোনলা বন্দুক। তাতেই আমরা মহাখুশি।

তারপরের ৭ দিন মামু কম্পিউটার নিয়া খুটুর খাটুর করলেন। কইলেন পরিকল্পনা করতাছেন। কর্মসূচি বানাইলেন। বললেন, বুঝলি, কোনো যুদ্ধে যাওয়ার আগে যদি সঠিক পরিকল্পনা করে যাওয়া না যায় তাহলে নির্ঘাত পরাজয় হবে। তো পরিকল্পনাটাই হলো আসল। ওটা হতে হবে নির্ভুল সঠিক।'

বাজার থেকে ব্যাগ ভরে ব্রেড, বাটার, টোস্ট, বিস্কুট, জেলি, জেম, সিটামল, ফ্লাজিল, ডেটল, ছুরি, কাঁচি ব্যান্ডিজ, ড্রাইফুড, পানির বোতল, ব্রিফকেস, সুটকেস, গামবুট, ওভার কোট, হ্যাট, সানগ্লাস, হ্যান্ড গ্লাভস, ফ্লাস্কভর্তি চা নিয়ে আমরা সুন্দরবনের উদ্দেশে রাতের কোচে ঢাকা ছাড়লাম। নাইট কোচ তো। ঘুমের দুলুনি আইছে কি আসে নাই। যশোরের কাছে ডাকাত পড়লো গাড়িতে। চড় থাপ্পড় লাথি গুঁতা ইত্যাদির কথা আর কি বলবো! আমাগো সক্কল কিছু লুট কইরা নিলো ডাকাইতরা।

মামুর আর আমার তো মাথায় হাত। অনেক ভেবে চিন্তে মামু বললেন, এতোদূর এসেছি যখন তখন আর ফিরে যাব না। যাবোই সুন্দরবন। মামা তো বাংলা সিনেমার হিরুগো চেনে। তাই মামার কাথায় অনেক বুদ্ধি আর সাহস। আমি কইলাম বনরক্ষী



www.pathagar.org

গো ঘোষটুষ দিয়ে বন্দুক এক আধটা পাওয়া যাইবই। মামু কইলেন, 'কুচ পরোয়া নেই। চল।'

পাঁচ.

সুন্দরবন! আহা সুন্দরবন! মামু কবিতা কইতে লাগলেন, ওগো সুন্দরবন। তুমি সুন্দরবন। চোখ বন্ধ করে গোলপাতায় হাত বুলান আর হাঁটেন। কেওড়া বনের চোখা চোখা শ্বাসমুলের লগে খাইলেন উসটা। পইড়া যাইতে যাইতে বাঁচলেন এ যাত্রা।

কইলাম মামু, 'এখন চোখ খোলেন। আগে বনরক্ষীগো খুঁইজা বার করি। তারপর দেহন যাইবো।' এই বনরক্ষীগো খোঁজাখুঁজি করণের সময়ই পড়লাম আমাগো এই বাঘ ভাই থুককু– বাঘ বাহাদুরের সামনে।

বাঘ বাহাদুর গলা খাকারি দিলেন।

ফিচকেল বললো, স্যার, থুককু...'

বাঘ বাহাদুর বললো, 'হ্যাঁ, দেখি এরা দু'জনই সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে বনে। দেখেই আমার মনে হলো এদের তো মতলব অন্যরকম।'

ফিচকেল বললো জি, ইন গম গম গলায় বললেন, এই তোমরা কারা? কি চাও? মামু বাঘ দেইখাই ফিট। আমি কইলাম, 'মামু অহন ফিট হওন যাইবো না। তাইলেই সর্বনাশ–

আমি বাহাদুরকে দেইখাই বুঝছি, ওনার দিলে বহুত দয়া। সাহস কইরা কইলাম বাঘ শিকারে এসেছি।'

বাঘ বাহাদুর বললো, বাঘ শিকারে এসেছো তো বন্দুক কই?'

আমি কইলাম, 'কি কমু দুঃখের কথা। বন্দুক তো ডাকাইতে লইয়া গেছে।'

বাঘ বাহাদুর বললেন 'গুলি আছে?'

কইলাম, 'হায়রে তাও নাই।'

এবার বাঘ বাহাদুরের মেজাজ গরম হইয়া গেল। কইলেন, 'বন্দুক নাই, গুলি নাই। তাইলে বাঘ শিকারে আইছো কেন? এটা ফাজলামো পেয়েছো?'

কইলাম 'হুজুর মনের দুঃখে বনে আইছি। আমাগো মামুর মনে অনেক দুঃখ, বহুৎ কষ্ট।'

তাকিয়ে দেখি গ্লিসারিন ছাড়াই ভয়ের চোটে মামুর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। কাঁপতে কাঁপতে মামুর মাথা খুইলা গেল। বুদ্ধি বাইর অইয়া গেলো।

পকেট থেকে হাতড়ে হাতড়ে কাগজের মতো কিছু একটা বার করে কইলেন এই যে মামার বন্দুকের লাইসেন্স আছে। এইডা ডাকাতে নিতে পারে নাই।'

বাঘ বাহাদুর তখন আমাদের মহল্লার হারুন ডাক্তারের মতো সরু চোখে তাকাইলেন। তারপর হেড মাস্টার সাহেবের মতো গলায় বললেন, 'দেখি লাইসেন্সটা।'



www.pathagar.org

উনি লাইসেন্সটা সামনে ডান থাবার মধ্যে নিয়া নাইড়া চাইড়া দেখতে লাগলেন। আমরা কইলাম, 'না এইডা দুই নম্বর না। একেবারে খাঁটি লাইসেন্স। তারপরের ঘটনা তো আপনারা জানেন।'

ছয়.

লম্বা বর্ণনা দিয়ে ফিচকেল থামে। সামনে ডানে বায়ে তাকিয়ে দেখে নানা প্রজাতির মাথা শত প্রাণী, পাখি। দেখে সফদর মামা ভয়ে জড়সড়।

এবার গুঞ্জন ওঠে প্রাণিকুলে।

কেউ বললো, 'বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা গল্প বলছে।'

কেউ বললো, 'এদেরকে এখনই বন থেকে বের করে দোয়া হোক।'

কেউ বললো, 'মানুষ মাঝে মধ্যেই অনেক জ্বালাতন করে আমাদের। এদের সাবাড় করে ফেলো।'

কেউ বললো, 'আহা ঘটনাটি সত্যও তো হতে পারে।'

হাতি তার লম্ব শুঁড় উঁচিয়ে বললো, 'এই তোমরা থামতো সবাই। এখানে সিংহ আছে। বাঘরাও আছে। অন্যান্য ক্ষমতাবান প্রাণীরাও আছে। তাদের সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে সিংহের কথা আমরা সব সময় মেনে এসেছি।'

সিংহ এবার ধীরোদাত্ত ভঙ্গিতে তার লেজটা এপাশে ওপাশ করলো। তারপর প্রশান্ত তেজময় কণ্ঠে বললো, শোন সবাই। মানুষ এখনও সে রকম ভালো হতে পারেনি। সে জন্য মিথ্যা কথাটথা বলে। প্রকৃতির আইন কানুনের প্রতিও এরা আর সে রকম শ্রদ্ধাশীল নয়। এরা এমনি এমনি নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। বোমাবাজি করে। গোলাগুলি করে। আমাদের বনগুলোকে এরা কেটে কুটে সাবাড় করে দিয়েছে। সুযোগ পেলে কারণে অকারণে এরা আমাদের খুন করে নিজেদের বীরত্ব জাহির করে। এরা ভয়ানক লোভী প্রাণী। তামাম জাহানে এরা বহু রকম অকল্যাণ ডেকে এনেছে। সে হিসেবে মানুষ সর্বদাই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

কথা হলো, মানুষের কোনো ভালো-মন্দ জ্ঞান নেই। যদি কখনও পথ ভুলে আমরা কোনো লোকালয়ে ঢুকে পড়ি, ওমনি মানুষ নিষ্ঠুরভাবে আমাদের পিটিয়ে গুলি করে হত্যা করে। শীতকালে যে পাখিগুলো আসে এখানে আশ্রয়ের জন্য, অই অসহায় পাখিগুলোকেও এরা গুলি করে মারে, তাদের গোশত রান্না করে খায়। আর নিজেদের মহিমা প্রচারের জন্য আমাদের চামড়াগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে অন্যকে দেখায়। এরা এতটা বর্বর যে চিড়িয়াখানা নামক এক আজব স্থানে আমাদের আটকে রেখে পয়সা কামায়। যা রীতিমতো শিষ্টাচারবর্জিত আচরণ। ওরা তো প্রকৃতিকে ধ্বংস করে দিতে উদগ্রীব। কিন্তু আমরা প্রকৃতির সন্তান। আমরা তো ওদের মতো করতে পারি না। আমরা প্রকৃতির রীতিনীতি মনে চলি।



www.pathagar.org

এখন কথা হলো, এই যে সফদর, তার দুঃখের কথা শুনলাম। তাকে মানুষ জলহস্তি বলছে।

গাধা বলেছ।

রাম ছাগল বলেছে। এসব কথা বলা হয়েছে। এর ভেতরে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, মানুষ আমাদেরকে কতটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। কতোটা অসম্মানের চোখে দেখে। কতোটা ছোট ভাবে তারা আমাদের।

মানুষ তো খারাপ। কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হলো, সফদর মানুষ হলেও হয়তো খারাপ নয়। খারাপ নয় বলেই তাকে জলহস্তি, গাধা আর রাম ছাগলের মতো অদ্ভুত ভালো প্রাণীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর মানে দাঁড়ায়, ওই সব প্রাণীর গুণাবলি কিছুটা হলেও সফদর মিয়ার মধ্যে আছে। তাহলে এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে সফদর মিয়া আমাদের বন্য প্রাণীদের ভাই। অতি আপনজন। কি বল সবাই?

সব প্রাণী সমস্বরে বললো, 'ঠিক, ঠিক।'

সিংহ একটু নড়েচড়ে বসলো। মাথাটা একটু এদিকে ওদিক ঘুরিয়ে বললো, 'জলহস্তি, গাধা ও রামছাগলের মতো প্রাণীর গুণাবলি সম্বলিত মহৎ একজনকে কিনা বলা হয়েছে কাপুরুষ। তা-ও আবার বলেছে মেয়েরা। কি দুঃখের কথা। কি লজ্জার কথা। কি অপমানের কথা। এটা রীতিমতো আপত্তিকর।

ভালুক তার কালো লোমশ গা ঝাড়া দিয়ে বললো 'আমি সিংহের কথার সাথে একমত।'

হাতি বললো, 'এ জন্যই আমি বলেছিলাম সবার আগে সিংহের কথা শোনো।'

সিংহ এবার বেশ খুশি খুশি মনে বললো 'এই রকম অবস্থায় এই দু'টি মানুষ আমাদের মেহমান। মেহমানদের সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। তাদেরকে 'কাপুরুষ' অপবাদ থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব আমাদের। মানুষকে দেখিয়ে দিতে হবে, বনের প্রাণীরা কখনও কাপুরুষ হয় না। তারা তাদের বন্ধুদের ভালোবাসে। কখনও কোনো অবস্থায় ত্যাগ করে না। কি বল সবাই?'

সকল প্রাণী আবার সমস্বরে বললো, 'ঠিক, ঠিক।'

সিংহ বললো, 'কিন্তু বিষয়টি হলো বাঘদের নিয়ে। বাঘরা হলো বনের খুবই বনেদি শানদার প্রাণী। তাছাড়া কি কারণে যেন বাঘ শিকারকে মানুষ খুব বিরাট কিছু মনে করে। সে জন্য এই সমস্যার ব্যাপারে এখন বাঘদের কথাই শোনা দরকার।'

## সাত

বনের সব বাঘ এসেছে দলবেঁধে। তারা এবার উশখুশ করে ওঠে। তাদের নেতা বাঘ বাহাদুর এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন সিংহের ভাষণ। সিংহের কথা থামার পরও তার সাড়াশব্দ নেই। পত্র পতন নীরবতা চারদিকে। সবাই তাকিয়ে আছে বাঘ বাহাদুরের দিকে। বনের সব প্রাণী তাকাতে থাকে এ ওর দিকে।



www.pathagar.org

এবার রাখুক খুক করে দু'টি কাশি দিলেন বাঘ বাহাদুর। তারপর সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের কেউ কিছু বলবে?'

সব বাঘ বললো, 'আমাদের আলাদা করে কিছু বলার নেই। তুমি যা বলবে সেটাই হবে আমাদের কথা।'

বাঘ বাহাদুর বললেন 'খুব আনন্দিত হলাম তোমাদের কথায়।'

তারপর দরাজ গলায় ভাষণ দিতে শুরু করলেন, 'হিংস যা বলেছে আমি তার সাথে একমত। বিষয়টা এখন শুধু সফদর কিংবা ফইচকার ব্যাপার না। বনের মর্যাদার প্রশ্ন। আমরা বাঘেরা অবশ্যই বনের মর্যাদার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।'

সিংহ বললো, 'মারহাবা' 'মারহাবা'।

সবাই সমস্বরে বললো, 'মারহাবা, মারহাবা।'

বাঘ বললো, 'অতীতেও আমরা বাঘেরা অনেক আত্মত্যাগ করেছি। আমার দাদা ছিলেন এখানে খানে খান দুরমুজ আলী খানখানান। তার কাছে একবার এক ইংরেজ সায়েব এসে বললো, 'ব্রাদার, দিস ইজ কোয়েশ্চেন অব মাই প্রেসটিজ। তাড়াহুড়ার জন্য গুলি আনতে ভুলে গেছি। আছে খালি বন্দুক। এখন খালি বন্দুক দিয়ে কিভাবে বাঘ মারি। এদিকে বাঘ না মারতে পারলে আমার যে জাতকুল সব যায়।'

সব শুনে আমার মহামহিম দাদা দয়াপরবশ হয়ে খালি বন্দুক দিয়ে বাঘ মারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমার মরহুম আব্বাজানের আমলে ঘটলো আরেক ঘটনা। সুদূর পেশোয়ার থেকে বনে এসেছেন এক পাঠান খান সায়েব। বনে এসেই হাপুশ হুপুশ কান্না। 'ভাইরে আসবার পথে হারিণঘাটার পানিতে বন্দুক গেছে তলিয়ে। আছে খালি গুলি। মুঝে এক বাঘ দে দেও। ইয়ে মেরা ইজ্জা কা সওয়াল।'

আমার আব্বাজান ছিলো খুব রাগী। বললেন, 'তোমরা যারা বাঘ শিকারে আস, তখন সবকিছু ঠিকঠাক মতো নিয়ে আসো না কেন? কি আর করা। ঠিক আছে।' তারপর গুলি দেখিয়ে এক বাঘ মেরে দিলেন।

মানুষের জন্য কতো আত্মত্যাগ আমাদের। কিন্তু আফসোস কি বাত। মানুষ আমাদের এসব আত্মত্যাগের কোনো মূল্য দেয়নি। উল্টো, তারা এইসব মেহমানদারি ও আত্মত্যাগকে মনে করেছে আমাদের বোকামি। সেভাবেই তারা কতো যে গল্প ফেঁদেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

তারপরও মানুষ আমাদের কাছে হাত পেতেছে। এই হাত খালি রেখে ফিরিয়ে দেই কি করে। এর সাথে এবার যুক্ত হয়েছে বনের সকল প্রাণীর সম্ভ্রমের প্রসঙ্গ। ইজ্জতের প্রসঙ্গ। বনের মর্যাদার জন্য, আমি ঘোষণা করছি এই মহতী সভায়, শুধু লাইসেন্স দেখেই বাঘ মারার ব্যবস্থা আমরা করে দেব।'

সব প্রাণী স্লোগান দিয়ে উঠলো, 'মারহাবা, মারহাবা।'



www.pathagar.org

আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ বাঘ বাহাদুর সুউচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'বাঘরা চল, শুধুমাত্র লাইসেন্স দেখে প্রাণ দিতে চাও কে?'
এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো সাতাশিটা বাঘ, 'বনের জন্য যতো কষ্টই হোক আমরা প্রাণ দেবো।'
আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো শ্লোগানে, 'মারহাবা, মারহাবা।'
দেখে ফিচকেল বললো, 'ওরে বাবা এতো বাঘ! মামুর দরকার তো একটা বাঘ।'
সবাই বললো, তাহলে?'
ফিচকেল বললো, 'তাহলে লটারি করি।'
'লটারি! লটারি! লটারি!' তা লটারি আবার কি জিনিস?' প্রাণীরা কৌতূহল চেপে রাখে পারে না।
ফিচকেল বললো, লটারি হইলো অনেক কাগজের টুকরা। সবটার মধ্যে সবার নাম। যার নাম উঠবে তারেই মরতে হইবে।'
তারপর লটারি হলো। বনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো লটারি। শুধু বাঘেরা অংশ নিলো। তারপর বড় বড়, শক্তিধর, সুন্দর সুন্দর বাঘদের পরাজিত করে, লটারিতে নাম উঠলো মছলিখোর ল্যাংড়া বাঘের।
ল্যাংড়া বাঘের সৌভাগ্যে হর্ষধ্বনি করে উঠলো পুরো বন। প্রাণীরা থাবার সাথে থাবা, পাখার সাথে পাখা জড়িয়ে, তালি দিয়ে ধন্যবাদ জানালো ল্যাংড়া বাঘকে।

আট.

বনের লতাপাতা আর ফুল দিয়ে সাজানো হলো ল্যাংড়া বাঘকে।
সবাই বললো, 'তোমার কি খারাপ লাগছে?'
ল্যাংড়া বাঘ বললো, 'মোটেই না। বনের সম্মানের জন্য, মেহমানদারির জন্য মরছি। এতো আমার পরম সৌভাগ্য।'
সিংহ আর বাঘ বাহাদুর ল্যাংড়া বাঘকে মাঝখানে নিয়ে মঞ্চে দাঁড়ালেন। সফদর মামা তার পকেট থেকে দোমড়ানো মোচড়ানো লাইসেন্সটি ভাঁজ খুলে মেলে ধরলেন ল্যাংড়া বাঘের চোখের সামেন।
ল্যাংড়া বাঘ বললো, 'বিদায় বন্ধুগণ বিদায়।'
তার মরে গেলো। আর আর্তনাদ করে উঠলো সারা বন। সবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। কেউ গলা ছেড়ে, কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।
সিংহ আর বাঘ বাহাদুর বলতে লাগলেন, 'তোমার এ আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না বন্ধু।'
আমরা তোমাকে কখনও ভুলবো না
'এনে ছিলে সাথে করে বাঘের জীবন



www.pathagar.org

বনের জন্য তাই করে গেলে দান।'

নয়.

বিদায়ের সময় হরিণঘাটা নদীর দুই তীরে ভেঙে পড়লো সমস্ত বন। সব বন্য প্রাণী ও পাখি এসেছে শেষ বিদায় জানাতে।

ল্যাংড়া বাঘের আপন বলতে ছিলো এক বুড়ি দাদী। সেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসেছে। হঠাৎ সফদর মামা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দাদী, বাঘের দাদীকে মানুষেরা কি বলে জানি না। আমি দাদীই বলবো। আপনার ল্যাংড়ার কোনো অসমাদর হবে না কখনও আমার হাতে। আর বনে এসে যা দেখলাম, তাতে আমার হৃদয় গলে গেছে। আমি মিথ্যা অহমিকা বাদ দিয়ে বনকে ভালোবাসতে শিখেছি। আমার জন্য দোয়া করবেন।'

বহু কষ্টে চোখের পানি সংবরণ করে সফদর মামা মুখ ফেরালেন বন থেকে। আর ফিচকেলের দুই চোখও তখন ভরে গেছে পানিতে।

ডিসেম্বর ২০০১



www.pathagar.org

# অয়নের ঈদ

সোলায়মান আহসান

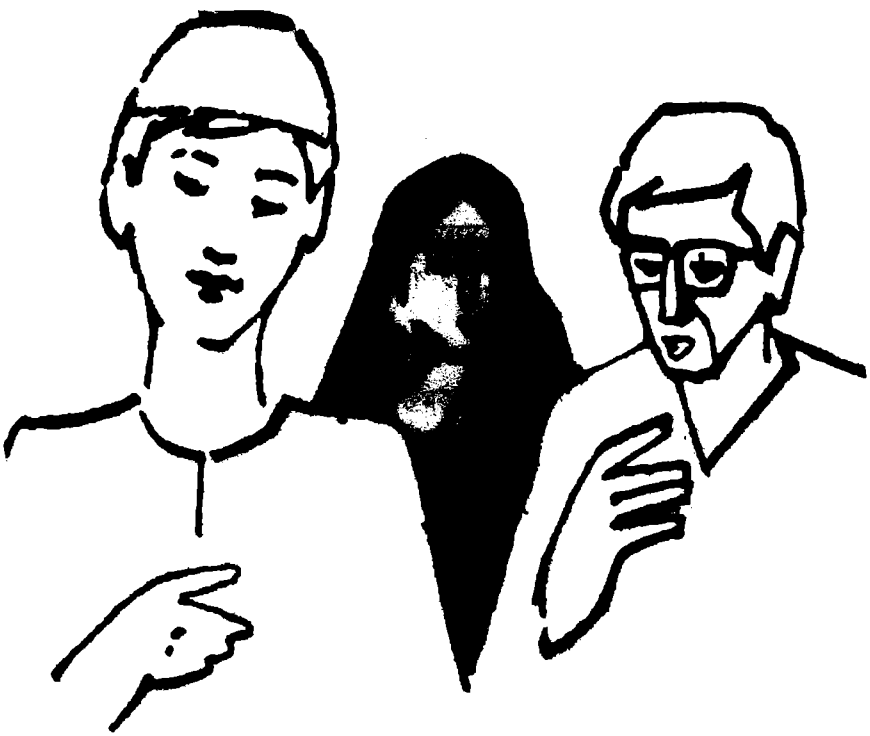

www.pathagar.org

অয়নকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঈদের নামাজ থেকেই অয়নকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভোরে গরম পানি দিয়ে গোসল সেরে সাদা পাঞ্জাবি পাজামা লাগিয়ে আতর মেখে অয়ন তার বন্ধুদের সঙ্গে ঈদগায় নামাজ পড়তে গিয়েছিল। নামাজে যাবার আগে এক বাটি সেমাই ছাড়া তেমন কিছুই খায়নি। আম্মুকে বলেছিল, ঈদগা থেকে এসে বন্ধুদের নিয়ে খাবে। সেই ঈদগার নামাজ শেষ হয়েছে কখন, অয়নের ফেরার কোনো লক্ষণ নেই।

অয়নদের বাসার সবাই চিন্তিত। আজ ঈদের দিন। খুশির দিন।

কিন্তু এ বাড়িতে নিমিষেই আনন্দ খুশির ফুলঝুরি নিভে গেছে। অয়নের আব্বা ফজল সাহেব বলেছেন অয়নের বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজ নিতে। বড় ভাইয়া মিলনও এদিক ওদিক খোঁজ করতে বেরিয়েছে। আর অয়নের আম্মু রান্নাবান্না রেখে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন। পাশের বাসার দু'জন মহিলা এসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কেমন এক বিষাদে ছেয়ে গেছে এ বাসার পরিবেশ। আশপাশের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে যাকেই পাচ্ছে অয়নের আম্মু জিজ্ঞেস করছেন এই তোমরা অয়নকে দেখেছ? কেউ বলছে নামাজের আগে দেখেছে। কেউবা বলেছে নামাজের পর দলবেঁধে যেতে দেখেছে। এসব কথার কোনো মূল্য নেই।

অয়নের আব্বু এ-বাসা ও-বাসায় খোঁজ নিয়ে অবশেষে একটা রিকশা নিয়ে বের হয়েছেন। কাজীপাড়া থেকে রিকশা মনিপুর ১০ নম্বর গোলচক্কর গেল। সেখান থেকে মিরপুর ২ নম্বর। থানার পাশে এসে ভাবেন, একটা জিডি করবেন কি না। আবার ভাবেন আরেকটু খুঁজে দেখা দরকার। মিরপুর ১ নম্বর পর্যন্ত যান। এখানে এসে মনে পড়ে চিড়িয়াখানার কথা। গত কয়েকদিন ধরে অয়ন চিড়িয়াখানার কথা বলছিল। ফররুখ আহমদের ছড়ার বই চিড়িয়াখানা কোথা থেকে এনে বেশ মন দিয়ে পড়ছিল। হয়তো দলবেঁধে সেখানে গেছে। অয়নের আব্বু রিকশাওয়ালাকে বলে, চিড়িয়াখানায় যাব। আপনার মাথামুথা খারাপ হয়েছে নি সাব, একবার কন ডান দিকে, আরেক বার কন বাম দিকে যাও, এখন কইতেছেন চিড়িয়াখানা যাইবেন– রিকশাওয়ালা বলে। আমার ছেলে অয়নকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই খুঁজছি। ফজল সাহেব রিকশাওয়ালাকে বুঝিয়ে বলেন।

পাওয়া যাইতেছে না, মাইক লইয়া বাইর হইয়া পড়েন, এমতে খুঁজলে পাইবেন নাকি? ফজল সাহেব রিকশাওয়ালার কথার আর জবাব দেয় না। এমনিতে উদ্বেগ তার ভাল লাগছে না, তার মধ্যে রিকশাওয়ালার সঙ্গে অহেতুক প্যাঁচাল পাড়তে ইচ্ছে হয় না। তাই চুপ মেরে যান। রিকশাওয়ালাও চুপ মারে। বেশ কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ থাকে।

আচ্ছা কন দেহি আপনার পোলা দেখতে কেমুন, চিনবার পারি কি না? রিকশাওয়ালা আবার মুখ খোলে।

দেখতে আমারই মতো, তবে রঙটা ফর্সা, চুল কোঁকড়ানো, চোখের মণি একটু পিঙ্গল। তুমি থাক কোথায়?



www.pathagar.org

সাব, মনে হইতেছে আপনার পোলারে চিনি, আমি এই মনিপুরি, মিরপুর দশ-এগারো বারোর মধ্যেই গাড়ি চালাই কিনা।

ফজল সাহেবের মনে অনেক কথা উদয় হচ্ছে। তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ ছেলেটা ভিন্ন মেজাজের হয়েছে। নামাজ রোজায় ভীষণ সিরিয়াস। পয়সা কড়ি যা পায় গরিব ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেয়। কতদিন নিজের একটু পুরনো হয়া জামা গরিব ছেলেদের দিয়ে দিয়েছে। এবার ঈদেও সে বেশ কয়েকটা জামা দিয়েছে। বাসার অনতিদূরে এক রিকশাওয়ালার ছেলেকে একটা নতুন জামা উপহার দিয়েছে। তাকে দিয়েই জোর করে কিনিয়েছে। কখন কি যে করে ছেলেটা বুঝার উপায় নেই। স্কুলের বন্ধুরা তাকে দয়ালু মুহসীন বলে ডাকে। মাস্টাররা তাকে খুব স্নেহ করেন। বলেন, ফজল সাহেব আপনার ছেলের দিলে অনেক রহমত, এমন ছেলেই দেশের বড় কিছু হওয়া দরকার, তবেই দেশের মানুষের দুঃখ ঘুচবে। সেই ছেলে এই ঈদের দিনে যাবে কেথায়!

দেখতে দেখতে রিকশায় চিড়িয়াখানায় এসে পৌছল। ফজল সাহেব ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। আশঙ্কা ছিল যেভাবে রিকশাকে এদিক সেদিক নিয়ে গেছেন ভাড়া ধার্য ছাড়া, মোটা রকম অঙ্কের সেলামি আজ তাকে দিতে হবে। কিন্তু না, রিকশাওয়ালা তা করলো না। বললো, আজ আপনার বিপদ যা দেবেন তাই-ই নিমু।

ফজল সাহেব একটা টিকেট কেটে চিড়িয়াখানায় ঢোকেন। বহুদিন পর এখানে এলেন। মিরপুর থাকেন অথচ এ সুন্দর জায়গায় তার আসাই হয় না। মনে পড়ে প্রায় বছর দুয়েক আগে অয়ন আর ঝুনঝুনিকে নিয়ে তিনি এসেছিলেন। আজ অবশ্য যে কারণে মানুষ চিড়িয়াখানায় আসে সে কারণে তিনি আসেননি। তবে এখানে এসে বেশ ভালই লাগছে।

ঈদের দিন চিড়িয়াখানায় ভিড় কম না। ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়াও কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীও কম নয়। এই দিনে চিড়িয়াখানায় এতো মানুষের আগমন ঘটে তা জানা ছিল না ফজল সাহেবের। ফজল সাহেব ছোট ছেলেমেয়েদের জটলা দেখলেই এগিয়ে যান। নজর তার চিড়িয়াখানার পশু-পাখির দিকে নয়, আগত ছেলেমেয়েদের দিকে। ফজল সাহেবের এ বিপরীত আচরণ লক্ষ্য করে কেউ সন্দেহ মিশ্রিত চোখে তাকায়। প্রথম প্রথম বুঝতে পারেননি, চিড়য়াখানায় তিনিও একটা দর্শনীয় বিষয়ে কখন পরিণত হয়েছেন। যখন বুঝতে পারলেন, সতর্ক হলেন। দৃষ্টিকে শুধু ছেলেমেয়েদের উপর আবর্তিত না রেখে চিড়িয়াখানাবাসী পশুদের প্রতি রাখতে শুরু করেন। হাঁটতে হাঁটতে এলেন বানরকুলের কাছে। বানরগুলোর কাছে এসে ফজল সাহেব হেসে দেন। এদের কীর্তিকলাপ দেখে মনে মনে ভাবেন, ডারউইন সাহেব নিজেই একটা আস্ত বানর না হলে এদেরকে নিজের বংশের পূর্বসূরি ভাবতে পারতেন না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাদামের ঠোঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা দুটো করে ছুড়ে মারছে, কেউবা কলা দিচ্ছে। এদের মাঝেও ফজল সাহেব তার দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। এভাবে



www.pathagar.org

গোটা চিড়িয়াখানায় ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে যান ফজল সাহেব। না, কোথাও পাওয়া গেল না। এমনকি ওর বন্ধুদের কারো সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটলো না। ফজল সাহেব হতাশ হয়ে যান। বুকের ভেতর আশঙ্কা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। পা তার ভারি হয়ে আসে। পেটে প্রচন্ড ক্ষিদে। বাসায় ফিরতেও সাহস হচ্ছে না। আল্লাহ্ জানেন অয়নের মার কি অবস্থা। আবার মনে হয় এতক্ষণে অয়ন বাসায়ও ফিরতে পারে। মনে হতে থাকে হয়তো অয়ন বাসায় ফিরেছে। একটা বেবী ট্যাক্সি নিয়ে দ্রুত বাসায় ফেরেন ফজল সাহেব। বাসার গেটে এসে বেবী ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে তার বুকে টিপ টিপ করতে থাকে। না জানি কি অবস্থা বাসায়। অয়নের মার অবস্থার কথা ভেবেই তিনি বেশি ভীত। আস্তে করে লোহার গেট খুলে ঘরে ঢোকেন। ড্রয়িং রুমে কেউ নেই। এরপর করিডোর দিয়ে সোজা বেডরুমে। অয়নের মা ড্রেসিং টেবিলে চুল আঁচড়াচ্ছেন।

– অয়ন এসেছে?

– তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

– অয়ন কোথায়?

– অয়ন আছে, কিন্তু তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে শুনি? আমরা তো তোমার নিখোঁজ সংবাদ দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

– কোথায় গিয়েছিল পাজিটা?

– আহ্ গাল দিয়ো না। আজ ঈদের দিন। তোমার ছেলেকে তুমি জান না, স্কুলে ওদের স্যাররা-বন্ধুরা মিলে ঠিক করেছিল, ঈদের দিন ছোট ছোট গরিব ছেলেমেয়েদের রান্না করে খাওয়াবে। অয়ন ঐ স্কুলে আছে। আমার কাছ থেকে কয়েকদিন আগে বিশ টাকা চাঁদাও নিয়েছিল, মনে নেই কি জন্য নিয়েছিল। মিলন স্কুলে গিয়ে দেখে এলাহিকান্ড! অন্তত কয়েকশো গরিব ছেলেমেয়ে সারিবদ্ধভাবে বসে আছে। অয়ন এবং ওর স্যার ও বন্ধুরা মিলে খাবার বিতরণ করছে।

– সত্যি চমৎকার! আল্লাহ্ অয়নকে বড় করো। ফজল সাহেবের মুখ থেকে অজান্তে এ দোয়া বেরিয়ে আসে।

মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯৩



www.pathagar.org

# অলৌকিক এক রাজার কাহিনী

আসাদ বিন হাফিজ

www.pathagar.org

রাখে আল্লাহ মারে কে!
রূপ কথার গল্প নয়।
আজগুবি কেচ্ছা নয়।
অলী মিথ্যা নয়।
একদম খাঁটি সত্য কথা।
অথচ মনে হবে, রূপকথার চাইতে সুন্দর আর বিস্ময়কর সে কাহিনী। মনে হবে মিষ্টি মধুর, মজাদার এক গল্প। যার শরীর আজগুবি কাহিনী ও চমকপ্রদ, অবিশ্বাস্য ঘটনায় ভরপুর।
এলেবেলে বাতাস বয়ে যায়। বাতাসের তালে তালে নেচে উঠে নদীর পানি। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধাক্কা খায়। ধাক্কা খেয়ে লুটিয়ে পড়ে একে অন্যের গায়ে। কূলে এসে আছড়ে পড়ে যেন সে ঢেউ। কুল কুল শব্দ হয়। শুনে মনে হয় যেন খেলতে খেলতে আনন্দে লাফিয়ে উঠে হাসছে কোনো শিশুর দল।
সেই নদীর বুকে ছিল সিন্দুকটা। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। দুলছে আর ভাসছে। দুলে দুলে এগিলে যাচ্ছে সামনের দিকে। লোকজন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সেই সিন্দুকের দিকে। তাকিয়ে দেখে-কিন্তু এগিয়ে যায় না। সাহস করে তুলে কি আছে এর ভেতর দেখার হিম্মত পায় না কেউ। কি আছে এই সিন্দুকের ভেতর? সাপ-খোপ? ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব? জিন-পরী, বাঘ-ভালুক? না, এসব কিছুই না। কেউ যদি সাহস করে তুলে আনত সে সিন্দুক, তা হলে দেখতে পেত তার ভেতর শুয়ে আছে ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে এক দুধের বাচ্চা। চাঁদের মতো যার রূপ ঝিলমিল করে ওঠে। রাজপুত্রের রূপ যাকে দেখে লজ্জা পায়।
এমন সুন্দর শিশুকে কে ভাসিয়ে দিলো নদীর বুকে? মায়া-দয়া বলতে কি তার কছুই নেই? কী অন্যায় করেছিল এ শিশু? যার জন্য এ দুধের বাচ্চাকে মায়ের বুক খালি করে ফেলে দেয়া হলো নদীতে? তার মা এখন কাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচবে? কাকে করবে আদর সোহাগ? আর এ শিশুটিই বা বাঁচবে কেমন করে? তোমাদের মনে হয়তো এমন সব ভাবনা তোলপাড় করছে। তাহলে শোনো। কেউ চুরি করে তাকে নদীতে ভাসায়নি। বরং নিরুপায় হয়ে তার মা-ই নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল।
কেন? কেন?
সে অনেক কথা। অনেক কাহিনী। সেসব না হয় না-ই শুনলে। শুধু এতটুকু জেনে রাখো যে, জন্মের পর তার ভাগ্যে দেখা দিয়েছিল চরম জীবন সংশয়। হাহাকার করে উঠল মায়ের বুক। কে যেন অদৃশ্য থেকে তাকে জানিয়ে দিলো– যদি এ শিশুকে বাঁচাতে চাও তবে সিন্দুকে ভরে তাকে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দাও।



www.pathagar.org

তারপর? তির থিত করে বয়ে যায় নদীর পানি। আর তার সাথে দুলতে দুলতে ভেসে চলে সেই সিন্দুক। এ ঘাট পেরিয়ে সে ঘাটে। কোথাও থামে না কেবল যায় আর যায়। যেতে যেতে- একেবারে পৌঁছে যায় রাজার বাড়ির ঘাটে। এ কান থেকে সে কান! সে কান থেকে ও কান। ঘুরতে ঘুরতে খবরটি পৌঁছে যায় রাজার কানে। রাজা হুকুম দিলেন– তুলে আনো সিন্দুক। ভেঙে ফেলো তালা। দেখো, কি আছে এর ভেতর।

এ ছিল এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। খবরটা তাই দেশসুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সদর ছাড়িয়ে খবর যায় অন্দরে। দাস-দাসী, ঘেটুরানী, কটুরানী, পাটরানী, ছোট রানীর কান হয়ে খবর যায় মহারানীর কানেও। মহারানী শুনে তো অবাক। রাজার ঘাটে এসে সিন্দুক ভিড়েছে, এতো খুব তাজ্জব ব্যাপার! নিশ্চয়ই শুভ কিছু হবে। নইলে উজির নয়, নাজির নয়, কোতওয়াল নয়, সেনাপতি নয়– একেবারে রাজার ঘাটে এসে ভিড়বে কেন? মহারানীর মনটা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। কী আছে এ সিন্দুকের ভেতর! দেখার আগ্রহ জানিয়ে খবর পাঠান রানী রাজার কাছে। রাজার হুকুম মত সিন্দুকটি নিয়ে আসা হলো দরবারে। খবর পেয়ে দরবারে এসে সমবেত হলেন সকলেই। এলেন সকল সভাসদরা। হাজির হলেন উজির নাজির, সবশেষে এলেন রাজা আর মহারানী।

আতঙ্কিত দরবার কক্ষে সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে সিন্দুকের ঢাকনা খুলে দেয়া হলো। দেখা গেল না, তেমন ভয়ঙ্কর কিছুই নেই এতে। যা যা তারা কল্পনা করেছিল তার কিছুই নয়। বিস্ময় ভরা চোখে তারা দেখলো একটি ফুটফুটে দুধের বাচ্চা সিন্দুকের মধ্যে শুয়ে শুয়ে হাসছে। অবাক করা তার মায়াবী চাহনি আর মিষ্টি হাসি তার মুখে। রাতের অন্ধকারকে যেমন দূর করে দেয় দিনের সুরুজ, চাঁদ যেমন জ্যোৎস্নায় ভরে দেয় পৃথিবীর মাঠ; তেমনি যেন এ শিশু বিষাদ মলিনতা দূর করে নির্মল হাসিতে ভরে তোলে দুনিয়া। আনন্দে আটখানা সকলেই। মহারানী আস্তে এগিয়ে গেলেন। কোলে তুলে নিলেন শিশুটিকে। চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন তার গন্ডদেশ। কিন্তু একজন খুশি হতে পারলেন না শিশুটিকে দেখে। আর তিনি যে সে লোক নয়- স্বয়ং রাজা। তিনি ভাবলেন, যে শিশুর কুল মর্যাদা জানা নেই, নাম ঠিকানা জানা নেই, আত্মপরিচয়হীন এ শিশুকে তো আর রাজপ্রাসাদে স্থান দেয়া যায় না। তা ছাড়া এ শিশুতো একদিন আমার ধ্বংসের কারণও হতে পারে। কিন্তু এ শিশুকে এখন কী করা যায়? রাজা ভাবলেন, সব চাইতে নিরাপদ একে হত্যা করা। কিন্তু বেঁকে বসলেন রানী। কিছুতেই তিনি এ শিশুকে হত্যা করতে দেবেন না। তাছাড়া রাজাকে বুঝালেন তিনি, এ শিশু কোনো সাধারণ শিশু নয়। নিশ্চয়ই ভাগ্যের পসরা নিয়ে এসেছে এ শিশু। এ শিশুই যে একদিন আমাদের গৌরব ও কল্যাণের কারণ হবে না সে নিশ্চয়তা কে দেবে? দ্বিধায়



www.pathagar.org

পড়লেন রাজা। শেষতক রানীরই জয় হলেন। তাকে লালন পালনের ভার নিয়ে দরবার থেকে বিদায় হলেন রানী।

কিন্তু এবার দেখা দিলো আরেক সমস্যা। শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দরকার বুকের দুধ। কে এই শিশুকে বুকের দুধ দেবে? এমন একজন মহিলার তালাশে বাইরে লোক পাঠালেন মহারানী। মহারানীর লোক সবে গেটের বাইরে পা দিয়েছে অমনি দেখে, উদাস চোখে এক কিশোরী বসে আছে গেটের বাইরে। মহারানীর লোকেরা ভাবলো আলাপ করেই দেখি না। যদি কোনো মহিলার সন্ধান পাওয় যায় এ মেয়ের কাছ থেকে।

– হ্যাঁ গো মেয়ে, তোমার নাম কি? এখানে বসে বসে কি করছো? মেয়েটির সাথে তারা ভাব জমাতে চেষ্টা করে। সে মেয়েটিও তাদের সাথে আলাপ জুড়ে দেয়।

– আপনারা বুঝি রাজবাড়িতে কাজ করেন? কী কাজ করেন আপনারা?

আমরা? আমরা হলাম মহারানীর লোক। রাজার ঘাটের সিন্দুক থেকে মহারানী যে ফুটফুটে বাচ্চা পেয়েছেন তাকে বুকের দুধ দিতে পারে এমন একজন মহিলাকে খুঁজতে যাচ্ছি আমরা।

মেয়েটির চোখ আনন্দে চিকচিক করে ওঠে। সে বলল– আপনাদের কষ্টের দরকার কি? এমন একজন মহিলা তো আমিই আপনাদের এনে দিতে পারি।

– সত্যি?

– হ্যাঁ সত্যি।

কে এই বালিকা?

নদী দিয়ে যখন সিন্দুকটা ভেসে আসছিল তখন যদি কেউ গভীরভাবে লক্ষ্য করতো তবে দেখতে পেত একটি বালিকা সেই সিন্দুকটি চোখে চোখে রেখে তীর ধরে এগিয়ে আসছে। সিন্দুকটি রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে এখানে বসে অপেক্ষা করছে। মনে তার গভীর উৎকণ্ঠা ছিল এতক্ষণ। এবার সে আশ্বস্ত হলো। তাহলে তার ভাইকে আল্লাহ্ হেফাজত করেছেন! মাকে আনার জন্য সে ছুটলো বাড়িতে।

এ শিশুটিই হলেন নবী মূসা (আ)। যার হাতে বিনাশ হয়েছিল ফেরাউনের সাধের সিংহাসন। অত্যাচারী রাজার হাত থেকে যিনি বাঁচিয়েছিলেন মজলুম মানুষকে। আর পৃথিবীকে দেখিয়েছিলেন খোদার রাজ।

আগস্ট, ১৯৮৯



www.pathagar.org

# দাদুর বিকেল

মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.org

দাদাজান এক মজার মানুষ।
বয়স সত্তরের ওপরে। চুল-দাড়ি সব পেকে একাকার। আজকাল চোখে তেমন একটা দেখেন না। কানেও শোনেন কম।
কিন্তু তারপরও তাকে দেখলে বুঝাই যাবে না যে দাদাজান নানা সমস্যায় কাতর। বয়স হয়েছে। এজন্য বার্ধক্যজনিত কিছু অসুখ-বিসুখেও আজকাল ভুগছেন। তবুও তবু তার শরীর স্বাস্থ্য এখনো অটুট। ঠিক যেন অস্ট্রেলিয়ান আপেল। তরতাজা।
দাদাজানের ভেতরটাও তারুণ্যে ভরপুর। এখনো, এই বয়সেও তিনি আমাদের সাথে চুটিয়ে গল্প করে যান। হাসির ফোয়ারা ছোটে তার চোখে মুখে।
বিকেলে আমরা খেলা করছি। আমার গলার শব্দ শোনার সাথে সাথেই ডাক পড়লো, আবদুর রহিম।... এদিকে এসো।
দাদাজানের একটা অভ্যাস, তিনি কাউকে সংক্ষিপ্ত নামে ডাকেন না। পুরো নামটি তিনি বলবেনই। যেমন বড় ভাইয়াকে ডাকেন আবদুল মালেক।
তো, দাদাজানের ডাক শুনে দূরে থাকার আর কোনো উপায় নেই। তার ডাকের আকর্ষণই আলাদা। সুতরাং সাথে সাথেই হাজির। কাছে আসতেই তিনি আগে একটু হেসে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী খেলছো দাদুভাই?
– জি, দাদাজান, গোল্লাছুট।
– ও। ওটাতো মেয়েদের খেলা। তোমরা পুরুষের মতো খেলতে জানো না?
– সেটা কেমন দাদাজান?
– এই যেমন ধরো হাডুডু, ফুটবল, কুস্তি।
– কুস্তি?
– কুস্তির কথা শুনতেই আমার তো পিলে চমকে যাবার জোগাড়। কুস্তি খেলবো? আমি? এই বয়সেই স্বাস্থ্যর যে দশা তাতে করে আমার নাম অবদুর রহীম না হয়ে চিকন আলী হলেই মানাতো বেশি। আমার শক্তির কথা আমি জানবো না?
– দাদাজান একটু কাশলেন। বুঝলাম, এটা তার উপহাসের কাশি। বললেন, কী যে হয়েছো তোমরা! ... আজকালকার ছেলেরা আর ছেলে নেই। তোমরা যেন কখনো তরুণ হতেও চাও না। জানো, আমরা যখন ছোট্ট ছিলাম, তখন ছিলাম ডানপিঠে, দুরন্ত আর সাহসী। সেই সাহসের একভাগও এখন তোমাদের মধ্যে নেই। কি, ঠিক বলেছি না দাদাভাই!
– কোথায় আর খেলা। ও পাঠ চুকে দিয়ে দাদাজানের মাথায় বিলি কাটতে কাটতে বললাম, ঠিকই বলেছেন। আমাদের আর সাহস কোথায়। থাকবেই বা কিভাবে?
– শরীর স্বাস্থ্যর যে অবস্থা! দাদাজান একগাল হেসে বললেন, তোমরা তো ভাই কঙ্কাল-মন্ত্রী। দেহে কেবল কয়েকটা হাড্ডিই যা আছে। হবে না? খাচ্ছোটা কি, দেখতে হবে তো।
– দেখবেন মানে! খাচ্ছি তো বেশ। খেয়ে যাচ্ছি।



www.pathagar.org

– হ্যাঁ খাচ্ছেই তো। খাচ্ছো যত্তসব অখাদ্য আর ভেজাল। কোনো খাঁটি জিনিস কি তোমাদের পেটে পড়ে?

দাদাজান একটা দম ছাড়লেন।

একটু সাহস করে বললাম, তো আমরা আর কিইবা করতে পারি। আমাদের যা খাওয়ান, তাইতো চোখ বন্ধ করে খেয়ে যাই।

দাদাজানের বুকটা যেন ব্যথায় ভারী হয়ে উঠলো। আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ঠিকই বলেছো। তোমাদেরকে কিছুই খাওয়াতে পারিনে। অথচ আমাকে দেখ! জীবনে কত কিছু যে খেয়েছি তার কোনো হিসাব নেই। যা খেয়েছি তার সবই টাটকা। বিশ্বাস করবে না, এই এত্তবড় জামবাটির এক এক বাটি গরু দুধ খেয়েছি। আহ! আহা! সর ওঠা, ঘন সেই দুধের স্বাদ যেন এখনো মুখে লেগে আছে। খেতে না চাইলেও মা জোর করে, চেপে ধরে খাওয়াতেন। আর এখন! এখন তোমরা কেঁদে জার জার হলেও এক চামচ গরুর দুধ তোমাদের মুখে তুলে দিতে পারিনে। কী দিন ছিল, আর আজ কোন দিনে এসে ঠেকেছি। ভাবতেই শরীরটা শিউরে ওঠে।

বুঝতে পারছি, দাদাজান অতীত স্মৃতি মন্থনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাকে একটু চমকে দেবার জন্য বললাম, তখন একদিকে ভাল ছিল, আবার অপর দিকটা খারাপও ছিল। এখন একদিকে খারাপ, অন্য দিকটা অনেক অনেক ভাল, সেটা তো স্বীকার করতেই হবে।

দাদাজান সত্যি সত্যি এবার চমকে উঠলেন। মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, তার মানেটা কি হে!

– মানে বুঝলেন না?

– না তো। একটু বুঝিয়ে বলো।

এই ধরুন, তখনকার দিনে খাদ্য খাবার টাটকা ছিল। অভাবও কম ছিল। কিন্তু মানুষ তেমন শিক্ষিত ছিল না। জ্ঞানবিজ্ঞানে ঐ সময়টা ছিল পিছিয়ে।

দাদাজানের ঠোঁটের কোণে এক ফালি বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। জিজ্ঞেস করলেন, আর এখন?

– এখন? এখন দেখুন না আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের হাতের মুঠোয়। কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ সারা বিশ্বে এখন তথ্য বিপ্লব ঘটে গেছে। বিশ্বটা এখন একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। আগে টিভি ছিল না। এখন তো টিভির নব ঘুরালেই পৃথিবীটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আহ! কী যে এগিয়ে গেছে সময়টা, বুঝতেই পারবেন না দাদাজান।

দাদাজান হেসে বললেন, তা যা বলেছো। বিজ্ঞান তোমাদের দিয়েছে অনেক। কিন্তু কেড়ে নিয়েছে শ্রমের অভ্যাস। এখন তো তোমরা এক একটা অলসের ঢেঁকি হয়ে পড়েছো।

আমার চোখে বিস্ময়। জিজ্ঞেস করলাম, তার মানে?



www.pathagar.org

দাদাজান নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, মানে? মানে তো সোজা। যেমন ধরো, আমাদের সময়ে হিসাব নিকাশ করতে হতো কাগজে কলমে লিখে। এতে শরীর এবং মেধা দুটোরই ব্যায়াম হতো। আর এখন তোমরা সেটা করো ক্যালকুলেটারের বোতাম টিপে। আমাদের সময় হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখতে হতো হাতে। তার কপি কিংবা পান্ডুলিপি তৈরি করতে হতো ঠিক সেইভাবে হাতে লিখে। ফটোস্ট্যাট মেশিন ছিল না। ছিল না কম্পিউটার। সুতরাং বুঝতেই পারছো, পরিশ্রমের মাত্রাটা ছিল কী রকম। আর এখন? মেশিনে টিপ দাও। ব্যস, হয়ে গেল। এখানে না আছে তেমন মেধার ব্যাপার, না আছে শারীরিক পরিশ্রম। আচ্ছা বলোতো, ফেরদৌসীর শাহনামার মত এত বিপুল বিশাল গ্রন্থ কি এখন কেউ হাতে লিখতে সাহস করবে? করবে না।

পরিশ্রমের কথা চিন্তা করেই হয়তোবা হার্টফেল করবে। অথচ একসময় তা হয়েছে। বিস্ময়কর নয় কি?

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বললাম, তা ঠিক। কিন্তু দাদাজান। কম সময়ে, কম পরিশ্রমে যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে অনর্থক গাধার মত খাটুনির দরকারটা কী? 'গাধার মত' শব্দটায় সম্ভবত তিনি একটু আঘাত পেলেন। আমি অবশ্য ওভাবে বলতে চাইনি। দাদাজান গম্ভীর হয়ে বললেন, বিজ্ঞান তোমাদের উপকার করেছে ঠিকই কিন্তু বন্ধ করেছে সবচেয়ে মূল্যবান একটি সম্পদের দরোজা।

– তার মানে? আমি রীতিমত অবাক।

– মানে বুঝলে না?

– না দাদাজান।

– বিজ্ঞান তোমাদের কাছ থেকে জ্ঞান নামক অমূল্য সম্পদটা কেড়ে নিয়েছে। এমনকি বন্ধ করে দিয়েছে তার জানালা দরজা।

– সেটা কিভাবে?

– খুব সহজে।

– যেমন?

– যেমন ধরো, আমাদের সময়ে আমরা বই পড়তাম। আর এখন তোমরা বই দেখ।

পড় না। পড়বে কেন? পড়তে যে কষ্ট করতে হয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বই পড়া, জ্ঞান আহরণ করা কম কষ্টের কাজ নয়। কী দরকার অত কষ্ট করার! তার চেয়ে এই ভাল কম্পিউটারের কিংবা টিভি স্ক্রিনে চোখ রেখে আরাম কেদারায় দোল খেতে খেতে বই দেখে যাও। সত্যি বলতে কি জান দাদুভাই, এতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। বই পড়ার মজাটাই আলাদা। দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে, বলো?

আবারও আমার সেই আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা। বললাম, মিটছে তো দাদাজান। দেখুন না আমরা কি পিছিয়ে আছি?

দাদাজান এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পিছিয়ে হয়তো নেই ঠিকই। কিন্তু



www.pathagar.org

বলো তো, তোমাদের মধ্যে কি ওমর খৈয়ামের মতো একজন বিজ্ঞানী জন্ম নিয়েছেন? কিংবা একজন নজরুল? বলো, বিশ্বকে চমকে দেবার মতো তেমন কোনো প্রতিভা কি সত্যিই জন্ম নিচ্ছে? সেই পুরনো, যাদেরকে তোমরা বলে ব্যাকডেটেড, তাদের বেচাবিক্রি করেই তো তোমরা চলছো। বুঝলে দাদুভাই, যতই তোমরা ঘৃণা করা কেন, মনে রাখবে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।

দাদাজান হাসলেন। তার এবারে হাসিটা বিজয়ীর হাসি। বুঝতেই পারছি তিনি জিততে চাইছেন। আমিও বিনা যুদ্ধে হার মানতে রাজি নই। কিন্তু লড়ে যাবার মত আমার সামনে তেমন কোনো রসদও আর অবশিষ্ট নেই। অনেক কষ্টে বললাম, আসলে সময়ের পার্থক্যটা অনিবার্য, দাদাজান। আমরা যেমন আপনাদেরকে ঠিক সেইভাবে বুঝতে পারিনে, আবার আপনারাও আমাদের সময়কে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন না।

দাদাজান আবারও হাসলেন! বললেন, হু বলে যাও। তারপর?

– তারপর?

আমি নিরুত্তর। কোনো কথা আর মুখে আসছিল না।

দাদাজান যেন আমার অনিবার্য পরাজয় সম্পর্কে জেনেই আমার মাথাটি তার বুকের কাছে টেনে নিলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, শোনো দাদুভাই! এটা কোনো তর্কযুদ্ধের ব্যাপার নয়। আমিও আনন্দিত যে বিজ্ঞান বহুদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেই অগ্রগতির সাথে সাথে তোমাদেরকেও এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখবে, তোমরা বড় হবার জন্য, তোমার বিস্তারের জন্য, প্রকৃত মানুষ হবার জন্য বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। তুমি যদি প্রকৃত অর্থেই একজন জ্ঞানী হতে চাও, তাহলে বিশ্বাস করবে, বইয়ের চেয়ে বড় কোনো বন্ধু তোমার নেই। থাকতে পারে না। শ্রমবিমুখ কৃষক আর পাঠবিমুখ তুমি– এই দু'জনের পতনের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। বলো, দাদুভাই, আছে কি?

আর কিইবা জবাব দেবো। দাদাজানই আমাকে উদ্ধার করলেন শেষ পর্যন্ত। হেসে বললেন, তবুও মনে করি, তোমরাই একদিন এই বিশ্বকে নতুন করে গড়বে ... নতুন আলোয় নতুন করে সাজাবে। কি, পারবে না দাদুভাই? বলেই দাদাজান আমাকে জড়িয়ে ভীষণভাবে আদর করলেন।

দাদাজানের বাহুডোরে মুখ লুকোতেই কেন জানি মনে হলো, পারবো। আমরা নিশ্চয়ই পারবো তেমনি হতে, যেমনটি দাদাজান আশা করেন। একটা সাহস, একটা আশার স্বপ্ন ও সম্ভাবনার মাস্তুলে দুলতে দুলতে আমার দু'চোখের কোনা চিক চিক করে উঠলো।

নভেম্বর, ১৯৯৮



www.pathagar.org

# অন্য রকম শফিভাই

মীযানুল করীম

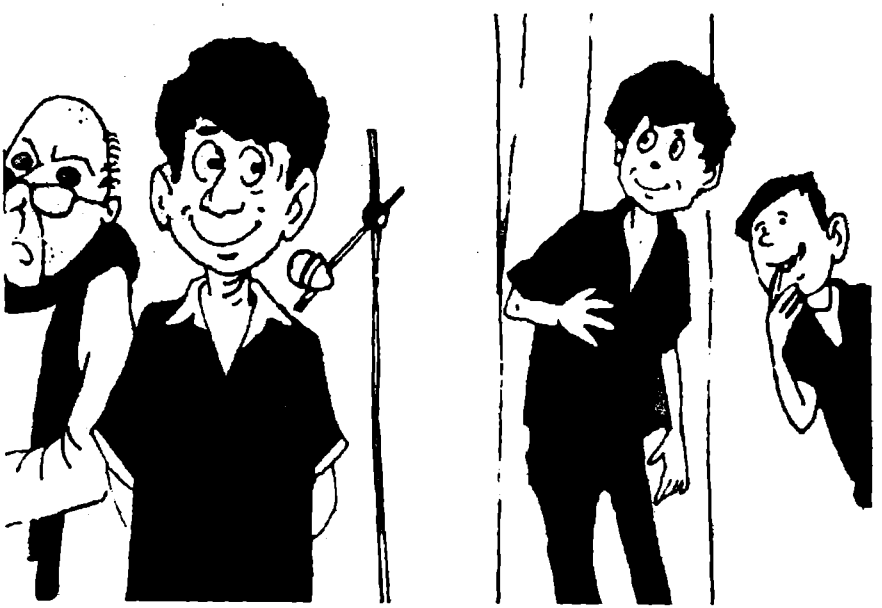

www.pathagar.org

বার্ষিক পরীক্ষা। বিষয় ইতিহাস। শফি ভাইয়ের একেবারে অপ্রিয় বিষয়। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন পাতিহাস। তার বক্তব্য ইতিহাস পড়ে সময় নষ্ট করে কী লাভ? কোন রাজার পিতার নাম কী, আর কে কার পুত্র, এসব জানার দরকার নেই। এ ছাড়া এই যে ইতিহাস বইয়ের পাতায় পাতায় অমুক তমুক রাজা বাদশাহ সম্রাট সম্রাজ্ঞীর ছবি, এগুলো কতটুকু বাস্তব? কারণ, তখনতো আধুনিক যুগের মতো ফটো তোলা যেতো না। শফিভাই যতই অপছন্দ করুন, আর তার বানানো যুক্তি তুলে ধরুন না কেন, ইতিহাস পরীক্ষা না দিয়ে উপায় নেই।

ইতিহাস বিষয়ে একটি প্রশ্ন ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। আমাদের কৃতবিদ্য শফিভাই এর উত্তর জানতেন না মোটেও। তাই বলে তিনি দমবার পাত্র নন। খসখস করে পরীক্ষার খাতায় লিখে যেতে লাগলেন। দেখে মনে হবে, অত্যন্ত মেধাবী ও পড়ুয়া ছাত্র। হল থেকে বেরুবার পর সহপাঠীরা ঘিরে ধরলো শফিউদ্দীন আহমদ চৌধুরী ওরফে শফিভাইকে। তিনি জানালেন যে সব প্রশ্নের জবাবই লিখে দিয়েছেন। এটা শুনে সবার চক্ষু চড়কগাছ! ওমা, বলে কী? যারা নাক-মুখ গুঁজে নিয়মিত পড়াশুনা করেছে, তারাও এবারের সব প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছে। এমন কাটখোট্টা প্রশ্ন আর হয় না। অথচ শফিভাই কি না ...।

তার যত বদনামই থাকুক, নকলের তিনি ধার ধারেন না। পরীক্ষায় পারলে লিখবেন, না পারলে লিখবেন না– এটাই তার নীতি। যাহোক, শফিভাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ হিসাবে লিখেছেন যাহারা এই যুদ্ধের জন্য দায়ী, তাহারা এমন এক বিরাট ও ক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটাইতে চাহিয়াছিল। ইচ্ছা না থাকিলে কেহ এমন কাজ করতে পারে না। অকারণে পৃথিবীতে একটি পাতা পর্যন্ত নড়ে না। অতএব, এতবড় ঘটনার নিশ্চয়ই কারণ আছে। আর এই বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল? শফিভাইয়ের ভাষায় তা হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত, অসংখ্য লোক আহত এবং শত শত মানুষ নিখোঁজ হইয়াছিল। প্রাণ বাঁচাতে বহুলোক গাছে উঠিয়া ছিল। অনেকে মাটির নিচে আশ্রয় নিয়াছিল। বিশ্বযুদ্ধ থামিয়া গেলেও বিশ্ব শান্ত হয় নাই। এই কারণে অনেকে আজ পর্যন্ত গাছ হইতে নামে নাই। এবং মাটির তলা হইতে ওপরে উঠিয়া আসে নাই।

স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুলে বড় মাঠে বিরাট প্যান্ডেল। গোটা স্কুলের বিল্ডিং, গাছপালা, গেট, রাস্তা– সবকিছু রঙবেরঙের পতাকা দিয়ে আর কাগজের শেকল বানিয়ে সাজানো হয়েছে। সভার কাজ শুরু হবে বিকাল চারটায়। লোকজন দুই ঘন্টা আগে থেকে আসছে। শ্রোতা দর্শকদের বেশির ভাগ হচ্ছে ছাত্ররা এবং তাদের অভিভাবক ও ভাই বন্ধুরা। দাওয়াত করে আনা গণ্যমান্য বিশিষ্ট মেহমানের সংখ্যা কম নয়।

শফিভাই নেতা মানুষ। তাই সব কাজে তাকে সামনে থাকতে হয়। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও তিনি কেউকেটা। তার গলাটা কিঞ্চিৎ হেঁড়ে। উচ্চারণও



www.pathagar.org

ত্রুটিমুক্ত নয়। বলার ভঙ্গিতে আঞ্চলিকতার টান তার মুদ্রাদোষ। তবুও তিনি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে ঘোষণার দায়িত্ব নিলেন। হেডস্যার হয়তো ভেবেছেন, ছেলেটা তো বিশ চটপটে। একটু আধটু ভুল টুল হলেও একবার দিয়েই দেখি না কাজটা।

প্যান্ডেল ভর্তি হয়ে মানুষ উপচে পড়ছে। প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক সাহেবও এসে পৌঁছেছেন। ঠিক সময়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। সিনিয়র ছাত্র কাম নেতা জনাব মোহাম্মদ শফিকে কর্মসূচি ঘোষণার জন্য হেডস্যার ইশারা করলেন। শফিভাই মাইক্রোফোনের সামনে এসে সালাম জানিয়ে সূচনা করলেন। তবে ঝেড়ে নেয়ায় গলা যেন খানিকটা বেশি হেঁড়ে হয়ে গেছে। খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, 'আজকের অনুষ্ঠান ঘোষণায় আমি মোহাম্মদ শফি।'

পুরস্কার বিতরণের আগে বক্তৃতার পালা। ঘোষণার সময়ে শফিভাই অভ্যাসবশত প্রধান কে প্রদান এবং প্রদানকে প্রধান বলতে ভুলে যাননি। এ নিয়ে ছাত্রদের কারো কারো হাসি এলেও পরে তার ধমকের কথা ভেবে সে হাসি দন্তবিকশিত হবার আগেই মিলিয়ে গেলো।

প্রধান অতিথি এবার পুরস্কার বিতরণ করবেন। প্রথমে কোন বিষয়ে কে পুরস্কার পায়, তা শোনার জন্য সবার কান খাড়া। মাইকে শফিভাইয়ের কণ্ঠে ভেসে উঠলো, এখন পুরস্কার পদার্পণ করবেন মাননীয় জেলা প্রশাসক। শুনে প্যান্ডেলভর্তি সবাই হো হো করে হেসে দিলো। খোদ ডিসি সাহেবও বাদ পড়লেন না।

প্রদানকে এ যাবৎ তিনি প্রধান উচ্চারণ করতেন। কিন্তু একেবারে 'পদার্পণ' যে বানিয়ে ফেলবেন, তা কেউ কল্পনাও করেনি।

অনুষ্ঠানের পর মেহমানেরা বিদায় নিলে হেড স্যার রেগে মেগে বললেন, 'শফি আজ তুমি আমার ইজ্জত ডুবালে। এমন একটা ফ্যাংশনে কী সাংঘাতিক ভুলই না করেছ। এমন জানলে ঘোষণার চান্সটা তোমাকে না দিয়ে আজিম সাবকে (একজন শিক্ষক) দিতাম।'

শফিভাই চেহারা স্বাভাবিক রেখে বললেন, স্যার, এটা স্লিপ অব ট্যাং। মাফ করে দেবেন।

আর আমাদরেকে তিনি বলেছিলেন, বুঝলি না, পুরস্কার প্রদান করে অর্পণ একই কথা। তবে কথা হলো কী ভুলটা হস্ত ও পদের। হস্তে অর্পণ করা হয় সেটা। বলে ফেলেছি পদে অর্পণের কথা।

একবার শফিভাই যাচ্ছিলেন ঢাকা। উনি ছিলেন একাই। ট্রেনে বেশ ভিড়। কামরায় উঠে দেখলেন, ইয়া মোটা এক লোক একাই তিনজনের জায়গা জুড়ে বসে আছে। তার বিরাট মাথা বিশাল ভুঁড়ি। মানে দশাসই দেহ। লোকটার দু'পায়ের মাঝে যতটুক ফাঁক, তাতে শফি ভাইয়ের মতো হালকা পাতলা একজন অনায়াসে বসে পড়তে পারেন।



www.pathagar.org

ভুঁড়িঅলা আরামে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। অথচ সিট না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকেই। কিন্তু কেউ তাকে একটু সংকুচিত হয়ে বসার জন্য বলছে না। হয়তো দৈত্যাকৃতি অবয়ব দেখে তারা ভয় পাচ্ছে। শফিভাই সাত পাঁচ না ভেবে সোজা তার দুপায়ের মাঝে বসে পড়লেন। হঠাৎ এমন কান্ড ঘটবে বলে কামরার কেউ ভাবেনি। কেউ কেউ এই দৃশ্য দেখে হাসতে গিয়েও পারলো না মোটা লোকটার ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে।

এদিকে শফি ভাইয়ের উপবেশনের পর বিশাল বপুর মানুষটা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলো। এর পরই ভারী গলায় বলে উঠলো, 'আরে করো কী করো কী! দেখছো না, আমি বসে আছি? না কি মাথা খারাপ হয়েছে?

শফিভাই একটুও সচকিত হলেন না। নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, আপনাকে তো ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। এরপর তার ডান দিকের পা-টা ধরে বললেন, এটা কার? ভুঁড়িঅলা মেজাজ গরম করে বললো কেন, আমার! এবার শফি ভাই বা পাশের পা-টা দেখিয়ে জানতে চাইলেন, এটা কার? লোকটা আরো তেতে বলে উঠলো, আরে মিয়া, চোখের মাথা খেয়েছো নাকি? এটা আর কার পা হবে, আমার যে দেখতে পাচ্ছ না? শফিভাই স্বাভাবিকভাবে বললেন, তো ভাই সাহেব, এটাও আপনার ওটাও আপনার। পা দুটোর কোনটাই যখন অন্যের নয়, এগুলো কাছাকাছি এনে বসুন না। তার অবিচল ভাবভঙ্গি দেখে ভুঁড়ির মালিক আর হৈচৈ বাধালো না। বোধ হয় কিছুটা লজ্জা পেয়ে শফিভাইয়ের অনুরোধে সাড়া দিলো। আর এই সুযোগে তিনি বসে বসে পুরো পথ আরামে পাড়ি দিলেন।

শফি ভাইয়ের একবার খেয়াল চাপলো, তিনি কবি হবেন। লেখা-পড়া লবডংকা। খেলার মাঠে খেলোয়াড় নয়, দর্শক হিসেবেই তার পরিচয়। গায়ক হবার সম্ভাবনা মুছে দিয়েছে বেসুরো গলাটা। নায়কও হবার মতো চেহারা নেই। ছাত্রনেতা হবার নেই খায়েশ। কারণ, তার বিশ্বাস, ওয়ার্থলেসরাই এখন রাজনীতি করে। অতএব, কাব্যখ্যাতিই ভরসা।

কবিতা দু'রকম। পঙ্‌ক্তির শেষে মিল আছে এমন কবিতাকে বলা যায় গতানুগতিক বা আবহমান কালের। আর মিলহীন কবিতাকে মনে করা হয় আধুনিক।

শফিভাই দুটোতেই সফল। একদিন তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ ও ভক্ত অনুরক্তদের ডেকে জড়ো করলেন। বললেন, আজ তোমাদর স্বরচিত কবিতা শোনাবো। তখনি সবাই হাততালি। অথচ কেউ জানে না তিনি যা লিখে এনেছেন, তার কাব্যমূল্য কতটুকু। না শুনেই করতালি। শুনলে কী অবস্থা দাঁড়ায় কে জানে।

শফিভাই শুরু করলেন আবৃত্তি : 'কী সুন্দর শরতের জোছনার রাতি, আকাশেতে উড়ে যায় একঝাঁক হাতি। এ পর্যন্ত শোনেই সবাই মাতোয়ারা। আবার তালি। সাথে সাথে হর্ষধ্বনিও। এর রেশ শেষ হতেই বেরসিক কেউ বলে ফেললো, 'শফিভাই, কবিতার



www.pathagar.org

ছন্দ ও মিল তো চমৎকার। তবে কথা হলো কী, হাতি কেমন করে ওড়ে তা যে বুঝলাম না?

অন্যরা তাকে ধমকিয়ে দিলো, শফিভাই কি মিথ্যুক যে বানোয়াট বুলি আওড়াবেন?' স্বয়ং কবি শফিউদ্দীন চৌধুরী শুধু বললেন, কবিতার জগৎটাই আলাদা। সেখানে কল্পনার পাখায় ভর করে হাতি কেন তিমিও উড়তে পারে।

আর আধুনিক কবিতা? এ ব্যাপারে শফি সাহেবের ফর্মুলা? মনের মাধুরী কিংবা কল্পনার পরশের দরকার নেই। একটা কাগজে কিছু কথা লিখুন। তারপর পৃষ্ঠার দু'পাশে এক ইঞ্চি করে, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ভাঁজ বরাবর ছিঁড়ে ফেলুন। মাঝে যা থাকবে, সেটাই আধুনিক কবিতা।

একবার এক অচেনা লোক খুঁজছিলেন জনৈক ব্যক্তির বাড়ি। পথে শফিভাইকে দেখে বললেন, বাবা, আকবর চৌধুরীর বাড়ি কোনটা বলতে পারো? শফিভাই জবাব দিলেন, পারব না মানে? এই যে বিল্ডিং দেখছেন- বাড়িটা তার ডেপোজিটে। বলেই তিনি আগের মতো হন হন করে হাঁটতে লাগলেন।

এদিকে ঐ লোক দাঁড়িয়ে ভাবছেন, ডিপোজিট আবার কী? ডিপোজিট মানে জমা করা। কিন্তু কোনো বাড়ি বা ভবনের অবস্থানের সাথে এর সম্পর্ক কিসের?

শফি ভাইয়ের কতগুলো অদ্ভুত থিওরি আছে, যেমন তিনি মনে করেন যে পিতা-পুত্রের নামে মিল থাকবেই, থাকতে হবে। বাবা যদি হন খোরশেদ আলম, তাহলে ছেলে নির্ঘাৎ মোরশেদ আলম। একবার এই ফরমুলা প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি বিপদে পড়েছিলেন। তবুও শিক্ষা হয়নি। তার আরেকটা অদ্ভুত বক্তব্য হলো কোনো বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে অবস্থিত বুঝাতে অপোজিট কথাটা সবাই ব্যবহার করে থাকে। তাহলে পেছনে অবস্থিত বুঝাতে চাইলে কেন ডেপোজিট বলা যাবে না।

শফি ভাইয়ের 'নো চিন্তা ড্রু ফূর্তি' স্বভাব। এটা আর কত দিন। এইচএসসি পাস করতে না করতেই পারিবারিক কারণে তাকে চাকরির ধান্ধায় নামতে হয়েছে। কিন্তু কর্মপ্রার্থী অন্যান্য বেকারের মতো হতাশা ও বিপদ তাকে ছুঁতে পারে না। রসিকতা তার অস্থিমজ্জায়।

একবার চট্টগ্রামের একটি বড় ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মখালির খোঁজ পেয়ে শফি ভাই দরখাস্ত ঠুকলেন। যে পদের জন্য তারা লোক চেয়েছিল, তার যোগ্যতা অন্তত গ্র্যাজুয়েশন। নিশ্চয়ই পদটির জন্য মাস্টার ডিগ্রিধারী, অর্থাৎ ওভার কোয়ালিফাইড বহু প্রার্থীও আবেদন জানাবে। কিন্তু শফি ভাইয়ের কুছ পরোয়া নেই। তিনি মাত্র ইন্টারমিডিয়েটের চৌকাঠ ডিঙিয়েছেন। তা-ও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তবুও ঐ চাকরির জন্য দরখাস্ত জমা দিলেন। অন্যরা যেখানে এই চাকরির আশা করতে পারে, সেখানে শফিভাইয়ের মতো ডিসকোয়ালিফাইড প্রার্থীর জন্য এটা দুরাশাই শুধু নয়, আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র।



www.pathagar.org

ইংরেজ কবি শেকসপিয়ার বলেছিলেন, 'মাঝে মাঝে বাস্তব ঘটনা কল্পনাকে মানায়।' এক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। শফিভাইয়ের নামে এসেছে ইন্টারভিউ কার্ড। তিনি নিজেও এটা ভাবতে পারেননি। হয়তো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবেছে, ছেলেটা নির্ঘাৎ অসাধারণ মেধাবী ও জ্ঞানী। না হয় সে এইচএসসি পাস করে কেন জেনেশুনে ডিগ্রি পাস করা লোকের পদের জন্য দরখাস্ত পাঠাবে?

যা হোক নির্দিষ্ট দিনে ইন্টারভিউ দিতে গেলেন জনাব শফিউদ্দীন। বড় একটা রুমে বোর্ড বসেছে। গোলটেবিলের চারপাশে কয়েজন রাশভারী ব্যক্তি। সবার সামনে কাগজ কলম। প্রার্থীদের জবাবের ভিত্তিতে মার্ক দেয়ার জন্য। রুমটায় ঢুকতেই তাদের গলা শুকিয়ে কাঠ। কেউ কেউ পানি চেয়ে নিয়ে খাচ্ছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। কারণ, গলা ভেজাতে ভেজাতে মুখস্থ করা সব কিছু ভুলে গেছে।

এবার শফি ভাইয়ের পালা। তিনি বীরদর্পে টান টান ভঙ্গিতে হেঁটে ঢুকলেন। দরজায় পৌঁছেই লম্বা সালাম। এরপর সহজ সাবলীল কায়দায় এগিয়ে খালি চেয়ারটায় বসে পড়লেন, মনে হচ্ছিল, যে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি প্রস্তুত এবং চাকরিটা তার জন্যই নির্ধারিত।

তবে এইচএসসির বিদ্যা (তা-ও নড়বড়ে) দিয়ে ডিগ্রি লেভেলের প্রশ্নের জবাব আর কতক্ষণই বা দেয়া যায়? ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান শফিভাইয়ের শিক্ষাগত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তার চালচলন ও ভাবভঙ্গিতে মুগ্ধ। তিনি সহানুভূতির সুরে বললেন, 'মি. শফি, আপনাকে এবার যে প্রশ্নটা করবো, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জবাব যদি দিতে পারেন, আশা করতে পারেন যে আপনি সাকসেসফুল।'

প্রশ্নটা শুনে শফি ভাইয়ের আক্কেলগুড়ুম। জীবনেও এ বিষয়ে কিছু শোনেনি। অবশ্য তিনি নিজের দুর্বলতা ফাঁস করতে রাজি নন। একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্নকর্তাকে বিনয়ের সাথে বললেন, 'স্যার, বেআদবি মাফ করবেন। আপনাকে একটা কথা ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই।' তিনি অবাক কণ্ঠে বললেন, 'ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে কিসের আবার পার্সোনাল কথা?' শফিভাই কপালে উদ্বেগের ছাপ ফুটিয়ে বললেন, 'স্যার খুব জরুরি। তবে কথাটা কেবল আপনাকে বলা উচিত। অন্যরা শুনলে সমস্যা হতে পারে।'

'স্যার' অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি দিলেন। শফিভাই ওঠে গিয়ে তার কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'স্যার, যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন এটা অত্যন্ত সিক্রেট ব্যাপার। এর সাথে আমাদের দেশ ও জাতির স্বার্থ জড়িত। এমন একটা বিষয়ে সবার সামনে আমার জবাব দেয়া কিছুতেই ঠিক হবে না।'

এ পর্যন্ত বলেই শফিভাই হন হন করে প্রস্থান করলেন। আর ইন্টারভিউ বোর্ডের মাননীয় প্রধানের চোখে মুখে বিস্ময়! তার মুখে কথা সরছে না।

ঈদসংখ্যা : জানুয়ারি, ২০০০



www.pathagar.org

# টোকনের ঈদ

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী

www.pathagar.org

টোকনরা থাকে কল্যাণপুর বস্তিতে। ওর আব্বা নেই। মারা গেছে সড়ক দুর্ঘটনায়। সেই থেকে টোকনটা খুব মনমরা হয়ে থাকে। স্কুলে যেতে পারে না। ভালো জামা জুতো নেই তো ওর।

টোকনের মা রহিমন নেহালদের বাসায় কাজ করে। একা একা বস্তির বাসায় থাকতে ওর ভালো লাগে না। তাই টোকন মার সাথে নেহালদের বাসায় যায়। রাতে ফিরে আসে বস্তিতে। সকালে আবার ওর মা কাজে গেলে টোকনও যায় সেখানে।

টোকনের ইচ্ছে হয় নেহালটার সাথে খেলতে। কিন্তু ওর মা ওকে খেলতে দেয় না। যদি বেগম সাহেব বকা দেয়! নেহালের আব্বা বিদেশে থাকে। ওর জন্য কত্ত কি পাঠায়। টোকন খালি দেখে। ইচ্ছে করে একটা খেলনা ছুঁয়ে দেখতে। কিন্তু নেহালের মা যদি মারে ওকে কিংবা ওর মাকে কাজ করতে না দেয়। এই ভয়ে ইচ্ছের কথা প্রকাশ করে না টোকন।

নেহালেরও খুব ইচ্ছে টোকনকে নিয়ে খেলতে। কিন্তু টোকনটা যে কী, একবারও ওর সাথে মেশে না। অবশ্য টোকনের ছেঁড়া প্যান্ট, উদোম গা দেখে নেহালের বেশ খারাপ লাগে। ভাবে টোকনটা যদি সুন্দর জামা কাপড় পরে ওর সাথে খেলতো, তবে কতই না ভালো লাগতো নেহালের। আর মাত্র কয়েক দিন পর ঈদ। বিদেশ থেকে নেহালের আব্বা এসেছেন। সাথে আরও অনেক কিছু খেলনা গাড়ি, উড়োজাহাজ, রঙবেরঙের জামা কাপড়, কার্টুনওয়ালা জুতো ইত্যাদি।

আব্বার ওপর নেহালের খুব রাগ হয়। আব্বাটা যে কী না, টোকনদের কিছুই দিতে চায় না। ঘরভরা জামা জুতো, খেলনা। এর মধ্যে থেকে দু-একটা টোকনকে দিলে কী কমে যেতো? ওর মনে প্রশ্ন জাগে, অবশ্য নেহালের আব্বা বলেছেন, রহিমন বুয়াকে জাকাতের একখানা শাড়ি নাকি দেবেন। কিন্তু নেহাল জানে না জাকাত কী জিনিস। টোকনের মা সকালে কাজে আসার সময় একটা ব্যাগ নিয়ে আসে সাথে। অতিরিক্ত শাক-পাতা, সকালের রুটি বেচে গেলে বেগম সাহেব সেগুলো রহিমনকে দিয়ে দেন। রহিমন খুশি হয়ে সেগুলো বস্তিতে নিয়ে যায়। বেতন যা পায় তা দিয়ে বস্তির ঘরভাড়াই চলে না।

নেহালের অনেকগুলো জামা কাপড় আর জুতো। বিদেশ থেকে তো ওর আব্বা জামা কাপড় এনেছেন, এরপর ঢাকা থেকেও ঈদের কেনাকাটা করা হয়েছে। নেহালের খুব ইচ্ছে করছে টোকনকে একজোড়া জামা, প্যান্ট দিয়ে দিতে। কিন্তু মা-বাবার ভয়ে ও কিছু করতে পারছে না। ও কেবল ভাবছে, আব্বা ইচ্ছে করলে টোকনকে ভালো কাপড়চোপড় দিতে পারে। কিন্তু দিচ্ছে না কেন? আজকে যদি চাঁদ ওঠে, তাহলে কালই ঈদ হবে। টোকনের মা দু-একটা শাড়ি পেলেও টোকন কিছু পায়নি। তাই আজ বিকেলের মধ্যেই টোকনকে কিছু দেবার ওর ভীষণ ইচ্ছে। কিন্তু কিভাবে দেয়া যায়? মা বাবা যদি বকেন! তবু চেষ্টা অব্যাহত রাখে নেহাল।

নেহালের এতো জামা কাপড়, খেলনা অথচ ওর বয়সী টোকনের গায়ে দেবার মতো কোনো জামা কাপড় নেই, প্যান্ট নেই। কিভাবে কাল টোকন ঈদের নামাজ পড়তে যাবে? এই ভাবনা নেহালকে পেয়ে বসে। অনেকক্ষণ ধরে নেহাল একা একা ভাবে। শেষ পর্যন্ত একটা বুদ্ধি নেহাল বের করে ফেলে। সেটা হলো প্রত্যেক দিন কাজে আসার সময় একটা যে ব্যাগ নিয়ে আসে টোকনের মা, ওটার মধ্যে কাউকে না জানিয়ে নেহালের নকশা করা একটা পাঞ্জাবি, টুপি এবং একজোড়া নতুন জুতো রেখে দেয় একটা পলিব্যাগে পুরে। এরপর খেলায় মেতে যায় পাশের বাসায় রূপুকে নিয়ে।

এরই মধ্যে আকাশে ঈদের চাঁদ দেখা যায়। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে।



www.pathagar.org

নেহাল লুপুরা দৌড়ে ছাদ থেকে নেমে অন্যদের খবরটা দিতে যায়।
কিন্তু একি! বুয়া রহিমন টোকনকে ভীষণ মারধর করছে। নেহালের মা-ও রহিমনকে খুব বাজে ভাষায় বকছে। বুয়া টোকনকে মারছে আর বকছে, তুই আমারে চোর বানাইলি। তোর বাপে একসিডেন্টে মইরা যাওনের পর মাইনসের বাসায় কাম করি হাঁচাই, তাই বইল্যা আমি কিন্তুক চোর না। আমার বংশের কেউ চোর আছিল, এইডা আমার জানা নাই। তুই ক্যান এ কামডা করলি। কিয়ের লাইগ্যা তুই ওগো নতুন জামাকাপড় ব্যাগে ঢুকাইলি! টোকনের চুল শক্ত করে ধরে ওকে চড় থাপ্পড় মারছে আর বলছে, গোলামের পোলা গোলাম, ক্যান, ক্যান তুই এই কামডা করলি ... তোর বাপে মরছে, তোরেও আইজ মাইরা ফালামু ...।'
টোকন জোরে জোরে চিৎকার করে বলছে, মা মাগো খোদার কসম, আমি কারো জামা জুতা ব্যাগে ভইরা রাখি নাই মা। তুমি আমারে আর মাইরো না।
টোকনের কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। না রহিমন বুয়া, না বেগম সাহেবা। নেহালের ভীষণ খারাপ লাগছে। ব্যাপারটা দেখে প্রথমে ভড়কে গেলেও এবার সাহস করে বলেই ফেলে, দেখো বুয়া। টোকন কোনো চুরি করেনি। আমি নিজেই কিছুক্ষণ আগে কাউকে না জানিয়ে আমার নকশা করা পাঞ্জাবি, টুপি, জুতা এ ব্যাগে রাখছি। যাতে টোকন কাল ওগুলো পরে ঈদের মাঠে যায়। আমার তো অনেকগুলো জামা আর পাঞ্জাবি আছে, তাই একটা পাঞ্জাবি, টুপি ও জুতো আমি টোকনকে দিয়েছি। ও নিজে ওগুলো ব্যাগে রাখেনি। এ ব্যাপারে টোকন কিছু জানেও না।
নেহালের মা ছেলের কথা শুনে অবাক হয় এবং টোকনকে রহিমনের কাছ থেকে ছুটিয়ে দেয়। টোকনের মা নেহালকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আপনে এইডা কী করলেন ছোট সাহেব?'
নেহাল বলে ওঠে, টোকনকে আমার খেলনা, জামা, জুতা আগেও দিতে চাইছিলাম। কিন্তু আব্বা-আম্মার ভয়ে আমি পারিনি। কাল খুশির ঈদ কিনা তাই ওগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে টোকনকে আমি দিয়েছি।
রহিমন ওগুলো বেগম সাহেবকে ফেরত দিতে দিতে বললো– 'আম্মাজান আমারে মাফ কইরা দেন। এমুন ভুল আর হইবো না।'
ভুল কি রে পাগল, আমাদের নেহাল তো সকলের চোখ খুলে দিয়েছে। ভুল এতোদিন আমরাই করে আসছিলাম। নেহাল সেটা শুধরে দিলো। ওগুলো আর ফেরত দিতে হবে না। কালকে খুব সকালে চলে এসো। টোকনকেও নিয়ে এসো। ও কাল নেহালের সাথেই মাঠে নামাজ পড়তে যাবে।'
সত্যি সত্যি ঈদের দিন টোকন নেহালের দেয়া পাঞ্জাবি টুপি আর জুতো পরে ওদের সাথেই নামাজ পড়তে গেলো। অন্যদের মতো টোকন, নেহাল ও লুপুর দাদুর সাথে গলাগলি করলো। নেহালের আব্বারও ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগলো না। মনে মনে ভাবলেন ঈদের পর টোকনকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়ার কথা।
টোকনকে স্কুলে দেয়ার কথাটা নেহাল আগেই শুনেছিল। তাই থামতে না পেরে বিকেলে টোকনকে ব্যাপারটা বলেই দিলো, 'তোর কিন্তু স্কুলে যেতে হবে।'
টোকন অবাক হয়ে বলে, 'কিন্তু স্কুলে ভর্তি হওনের জন্য যে মেলা ট্যাহা লাগবো ...।'
'দুর বোকা, ঈদটা যাক না আগে। ভর্তির টাকা দেবেন আব্বা। আর বই তো এমনিতেই পাওয়া যায়। স্কুলে ফ্রি বই ছাড়া যেগুলো কিনতে হয়, সেগুলো তো আমিই দেবো। এরপর ঈদ মোবারক বলে নেহাল খুশি মনে বাসায় গেলো।

ঈদসংখ্যা : জানুয়ারি ২০০০



www.pathagar.org

# পিতা, আপনি তা-ই করুন

আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

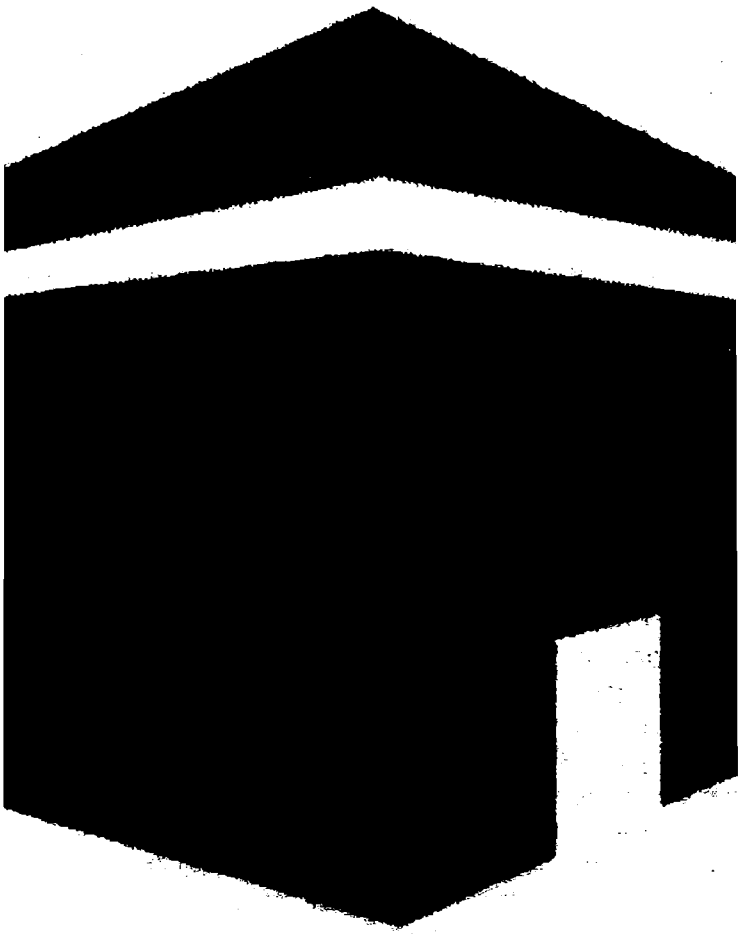

www.pathagar.org

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগের কথা। দুনিয়ার মানুষের মুক্তি ও পথের দিশা দেয়ার জন্য তখন এক নবী ছিলেন। তিনি আজর নামক এক পৌত্তলিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। আজর ছিলো নমরুদ নামক খোদাদ্রোহী শাসকের মন্ত্রী। সেই আজরের ঘরে জন্ম নিয়েও কৈশোরেই তিনি নিজ চেষ্টায় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় এক আল্লাহকে চিনতে পারেন এবং পৌত্তলিকতা বা শিরক পরিহার করেন। ইনিই আল্লাহর প্রিয় বন্ধু মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ (আ)। ইবরাহিমকে (আ) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেকগুলো পরীক্ষা করেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সব কটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর বন্ধুতে পরিণত হন। ছোটবেলা থেকে পৌত্তলিক পিতার সন্তান ইবরাহিমের মন এই দুনিয়ার স্রষ্টার সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি একবার মনে করেন সূর্যটাই বুঝি সব কিছুর স্রষ্টা।

আবার সূর্য ডুবে গেলে ভাবেন– না, এটি কি করে স্রষ্টা হবে? রাতের আকাশে চাঁদ দেখা দিলে আবার ভাবেন– এই শান্ত স্নিগ্ধ চাঁদটাই মনে হয় স্রষ্টা। কিন্তু সকালে চাঁদ হারিয়ে গেলে মনে হতে লাগলো– না, এটাও হতে পারে না। এমনিভাবেই তিনি অবশেষে সিদ্ধান্তে আসেন– সূর্য নয়, চাঁদ নয়, সমুদ্র নয়, পাহাড় নয় বরং এসব কিছুর যিনি সষ্টা, মালিক তিনি নিরাকার, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক আল্লাহ। এভাবেই তিনি প্রথম পরীক্ষায় পাস করে গেলেন। পেলেন আল্লাহর সন্ধান। একটু বড় হয়ে আসলো তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পরীক্ষা। মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে প্রচন্ড বিদ্রোহ দেখা দিলে একদিন চুপি চুপি মন্দিরে ঢুকে নিজ হাতে ছোট মূর্তিগুলোকে ভেঙে বড় মূর্তিটার কাঁধে রেখে দিলেন ভাঙার অস্ত্র। লোকেরা দেখলো, এই কাজ ইবরাহিম করেছে। তারা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো, তিনি চটজলদি জবাব দিলেন ঐ বড় মূর্তিটাকে জিজ্ঞেস করো। ও-ই সবাইকে ভেঙে নিজে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লোকেরা বললো– সে কি করে সম্ভব? পাথরের মূর্তি কী করে এ কাজ করবে? ইবরাহিম সুযোগ বুঝে বললেন– তাহলে কেন শুধু শুধু এই অক্ষম পাথরের মূর্তিকে তোমরা পূজা করে, যার নিজেকে রক্ষা করারও ক্ষমতা নেই?'

যেই তিনি এ কথা বললেন লোকেরা বুঝে নিলো আসল ঘটনা কি। নমরুদের দরবারে সবাই চলে গেলো। সুতরাং তারা আজর পুত্র ইবরাহিমকে আগুনে পুড়ে মারার সিদ্ধান্ত নিলো। বিশাল অগ্নিকুন্ড তৈরি হলো। হাজার হাজার লোক চারিদিক থেকে ঘিরে আছে অগ্নিকুন্ড। সবারই বুক দুরু দুরু করছে। ভয়ে আশঙ্কায়, শিহরিত সবার মন। অবশেষে চরকিতে ঘুরাতে ঘুরাতে ইবরাহিমকে সে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হলো। তিনি অবিচল, নিশ্চুপ। সবাই অবাক হয়ে দেখলো তিনি হাসতে হাসতে আগুনে বসে আছেন। ঘটনা কী?

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হজরত ইবরাহিমের তাওয়াক্কুল বা তাঁর ওপর ভরসা পরীক্ষা



www.pathagar.org

করলেন। ফেরেশতা গিয়ে যখন ইবরাহিমকে বললো– আপনি আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি আগুন নিভিয়ে দেবেন। আর ইবরাহিম (আ) বলছেন– আল্লাহতো সবই দেখছেন। তার কাছে চাওয়ার কি আছে! আল্লাহ তার এই মনোবলে খুশি হয়ে আগুনকে নির্দেশ দিলেন, 'হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য হিমশীতল শান্তিদায়ক হয়ে যাও। আগুন তাই হয়ে গেলো। এভাবে ইবরাহিম এখানেও পাস করে গেলেন। বুড়ো বয়সে হযরত ইবরাহিমের ঘরে বিবি হাজেরার গর্ভে জন্ম লাভ করে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ)। কিন্তু আল্লাহ নির্দেশ দিলেন শিশু ও তার মাকে এক ধু-ধু মরুপ্রান্তরে জনমানবহীন শুষ্ক এলাকায় রেখে আসতে। আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সবসময়ই নত ছিলেন ইবরাহিম। তিনি এই অসহায় মা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাইলকে (আ) বর্তমান ক্বাবা ঘরের নিকট বিরান ভূমিতে রেখে আসেন। মা ও শিশুর দায়িত্ব আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে তিনি সেদিকে আর না ফিরেই চলে আসেন নিজ এলাকায়। শিশুপুত্র যখন তৃষ্ণায় ছটফট করে কাঁদছিলো, বিবি হাজেরা তখন একটু পানির আশায় দুই পাহাড়ের মাঝে অসহায়ের মত ছুটাছুটি করছিলেন। একবার সাফায় যান তো আরেকবার মারওয়ায়। দৌড়াতে দৌড়াতে মাঝে মাঝেই তিনি ফিরে তাকান শিশুটির দিকে। আবার ছুটেন। সাতবার সাফা মারওয়া করার পর মা দেখলেন শিশুটি থেমে আছে। ছুটে গেলেন তিনি। বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায় তিনি দেখলেন শিশুর পায়ের কাছে, যেখানে এতক্ষণ সে পা আছড়াচ্ছিলো একটি পানির ধারা। আল্লাহ ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার পুরস্কার পেলেন তিনি। আর পানির এই ধারাটিই হলো জমজম।

যে শিশুর জীবনের শুরুতেই এই পরীক্ষা হলো। যে শিশুর বরকতে আল্লাহ বিরান মরুভূমিতে দিলেন অন্তঃহীন স্বচ্ছ পানির ধারা, সে শিশুর প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহের টান বেড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। শিশু ইসমাইল হলেন পিতার নিত্যসঙ্গী। এখন ইসমাইল পিতার সাথে সাথে ছুটে বেড়াতে পারেন। পিতা সবসময়ই সন্তানের উজ্জ্বল উচ্ছল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি সুন্দর হাসি খুশি সন্তান তার! এরই মাঝে একদিন হযরত ইবরাহিম স্বপ্ন দেখেন– আল্লাহ তার প্রিয় বস্তুকে কুরবান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। ইবরাহিম (আ) বেশ মূল্যবান ও প্রিয় জিনিস আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিলেন। কিন্তু না। আবারও সেই স্বপ্ন। এভাবে পরপর কয়েকবার স্বপ্ন দেখার পর ইবরাহিম বুঝতে পারলেন আল্লাহর ইচ্ছা কী। ইবরাহিমের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, সবচেয়ে আদরের ধন ইসমাইলকেই আল্লাহর নজরানা হিসেবে চান। আর কিছুই নয়। কিন্তু কি করে তিনি স্ত্রীর কাছে এ কথা বলবেন? কি করে তিনি নিজ হাতে প্রাণাধিক শিশু পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর রাস্তায় জবাই করবেন? আল্লাহ তো তাকে জবাই করার হুকুম দিয়েছেন।



www.pathagar.org

হযরত ইবরাহিম মনস্থির করলেন তিনি সন্তানের কাছে এ কথা বলবেন।
অবশেষে তিনি বললেন, প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যেন জবেহ করছি। বল দেখি কি করা যায়?
ইসমাইলও ছিলেন বাপকা বেটা। তারও ছিলো আল্লাহর প্রতি জান কুরবান করার মত হিম্মত ও সাহস। তিনি বুঝলেন পিতা নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে থেকে আদেশ পেয়েছেন। সুতরাং আর দেরি কেন। মনকে শক্ত করে শিশু পুত্র অনায়াসে পিতাকে বললেন– 'আববা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা শিগগির করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মাঝে দেখতে পাবেন, অবিচল পাবেন।' অবশেষে পিতা-পুত্র উভয়ের হৃদয়েই আল্লাহর ভালবাসা গভীর হয়ে দেখা দিলো। উভয়েই নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। পিতা-পুত্র পাশাপাশি চললেন আল্লাহর ইচ্ছা পুরা করার জন্য। ইবরাহিম (আ) চললেন শিশুপুত্র ইসমাইলকে (আ) আল্লাহর রাহে কুরবান করার জন্য। আর মানুষের চির দুশমন শয়তান তখন তাদের পিছে লেগেছে। শয়তান বারবার ইসমাইলকে এসে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে আর মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। জীবনের মায়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দা ইসমাইল মোটেও ভয় পাননি। বরং প্রতিবারই তিনি শয়তানকে ভৎসনা করেছেন এবং আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন। তাই আজও হাজীরা শয়তানের এই অসওয়াসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। মিনায় অবস্থিত দু'টি চিহ্নিত স্থানে শয়তানকে উদ্দেশ করে পাথর ছুঁড়ে মারেন। মূলত তারাও চেষ্টা করেন হযরত ইসমাইলের মতো শয়তানকে জীবনের সকল বিভাগ থেকে দূর করে দিতে।
পিতা-পুত্র অবশেষে শয়তানের সমস্ত ধোঁকাকে উপেক্ষা করে এক দিলে, এক ধ্যানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি গাহে উপস্থিত হলেন। সন্তানের জন্য পিতার হৃদয়ে ভালোবাসা থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর ভালবাসা যে তারও উপরে। পুত্রের মনেও সেই একই চিন্তা আল্লাহকে খুশি করতে হবে।
'অবশেষে যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের সোপর্দ করে দিলেন এবং ইবরাহিম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন (জবেহ করার জন্য)।' কী অপূর্ব সেই দৃশ্য! নিজ হাতে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের গলায় ছুরি চালিয়ে দিচ্ছেন বৃদ্ধ পিতা ইবরাহিম। সামান্য শঙ্কা, সামান্য আবেগ নেই। আর পুত্রও কী অনুপম। শান্তশিষ্ট হয়ে উপুড় হয়ে আছেন। অথচ একটু পরেই তার গলায় ছুরি চালানো হবে। আল্লাহ খুশি হয়ে গেলেন পিতা-পুত্রে এই আত্মত্যাগের মহিমায়। আল্লাহ তো কেবল পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন ইবরাহিম (আ) এর এই ত্যাগ ও কুরবানির মানসিকতাকে।
'তখন (যখন জবাই করতে যাচ্ছিলেন) আমরা তাকে (ইবরাহিম) সম্বোধন করে বললাম, ইবরাহিম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমরা সৎ কর্মশীলদের



www.pathagar.org

এরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। বস্তুত এ এক সুস্পষ্ট অগ্নিপরীক্ষা। আল্লাহ খুশি হয়ে গেলেন ইবরাহিম (আ) এর ওপর। তাঁরই ইচ্ছায় ইসমাইলের স্থলে চলে আসলো একটি হৃদষ্টপুষ্ট দুম্বা। ইবরাহিম অবাক হয়ে দেখলেন ইসমাইল পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তার ছুরির তলায় জবেহ হয়ে আছে একটি দুম্বা। ইবরাহিম কিছুটা ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলেন, ইবরাহিমকে আল্লাহ অভয় দিলেন– আর আমরা বিরাট কুরবানি ফিদিয়া স্বরূপ দিয়ে তাকে (ইসমাইলকে) উদ্ধার করেছি। আর আমরা ভবিষ্যতের উম্মতের মধ্যে (ইবরাহিমের) এই সুন্নত স্মরণীয় করে রাখলাম। শান্তি ইবরাহিমের ওপর। এভাবে জীবনদানকারীদেরকে আমরা এ ধরনের প্রতিদানই দিয়ে থাকি। নিশ্চিতরূপে সে আমাদের মুমিন বান্দাদের মধ্যে শামিল।' এই ছিল শুরু। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বান্ধাদের মাঝে ত্যাগ কুরবানি ও তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য ইবরাহিম ও ইসমাইল (আ) এর রেখে যাওয়া এই সুন্নতকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন। প্রতি বছর জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখ সারা বিশ্বের মুসলমান একই জযবা নিয়ে নিজেদের প্রিয় পশুটিকে কুরবান করে মূলত আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সব কিছুকে কুরবান করার প্রস্তুতি ঘোষণা করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও চান তাঁর প্রতিটি বান্দা এই ত্যাগ ও কুরবানির চেতনায় সারাটা জীবন উজ্জীবিত থাকুক। তাঁরই ভাষায় বল, (হে মুহাম্মদ) আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই, আমাকে তাঁরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং আমি সকলের আগে তাঁর অনুগত ও ফরমাবরদার।'

আজকের প্রতিটি পিতা যদি ইবরাহিমের (আ) মতো হতেন, আর প্রতিটি সন্তান যদি হতে পারতো ইসমাইলের (আ) মত তাহলেই দুনিয়ায় আবার নেমে আসতো আল্লাহর নেয়ামতের বিপুল ধারা।

মানুষ যদি কেবল পশু কুরবানির রেওয়াজ চালু না রেখে তার সাথে সাথে মনের পশুগুলোকে (সমস্ত খারাপ ইচ্ছাকে) কুরবান করে দিতে পারতো তাহলেই আবার বড় গলায় আমরা পরিচয় দিতে পারতাম– আমাদের জাতির পিতা ইবরাহিম (আ) আর আমরা হলাম মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।

যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন জারি থাকবে হজরত ইবরাহিমের (আ) এই সুন্নত। ততদিন পৃথিবী স্মরণ করবে এক স্নেহকাতর বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর আদরের সন্তানের অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানির সুমহান ইতিহাস।

মে-জুন, ১৯৯৩



www.pathagar.org

# বিনা পয়সায় আনন্দ

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

www.pathagar.org

দুনিয়াকা মজা লেলো দুনিয়া তুমারি হ্যায়।
আজ দুনিয়া তুমারি হ্যায়।
গানের মিউজিক শুনলেই নেচে ওঠে মফিজের মন। সাথে সাথে নিজেও সুর তুলে মিউজিকের তালে তালে। কিন্তু দুনিয়ার মজা লুটা কি এতই সহজ? দুনিয়ার মজা তো তারাই লুটতে পারে, যাদের আছে অঢেল টাকা। কিশোর মফিজ তবু দুনিয়ার মজা খুঁজে বেড়ায়। তবে বিনা পয়সায়। বুদ্ধি থাকলে বিনা পয়সায়ও আনন্দ মেলে। হাড়কিপটা গরিব বাবার ছেলে মফিজ। আনন্দ ফুর্তির জন্য একটা পয়সাও কোনদিন আব্বা দেয়নি তাকে।
ছোট্ট একটি প্লাসিকের বল কিনে লাথিয়ে একটু পায়ের সুখ লাভের সুযোগও দেয় না কোন দিন। তাই গাছ থেকে ঝরে পড়া কচি জাম্বুরা দিয়ে বল খেলেছে শিশুকালে। কাদামাটির গুলি বানিয়ে মার্বেল খেলেছে। পুরনো খাতার ছেঁড়া কাগজ দিয়ে ঘুড়ি বানিয়েছে। চাল অথবা নগদ টাকার বিনিময়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপুড়েদের সাপ খেলার প্রচলন থাকলেও মফিজদের বাড়িতে কোনোদিন এমন অনুষ্ঠান হয়নি। প্রতিবেশীর বাড়িতে উঁকি দিয়ে তাদের ছেলেমেয়ের তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছে।
কি সাপ দংশিল লখাইরে/সোনার অঙ্গ হইলো কালা।
সুর শুনলেই অতীতের ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে আবার দৌড়ে গিয়েছে ঐ সব বাড়িতে।
খা খা খা বক্ষিলারে খা, কিরফিনরে খা। খেলা দেইহা যে পয়সা না দেয়, তারে ধইরা খা। এসব মজাদার কথা খুবই ভাল লাগতো তার। ফুটবল খেলতে চাঁদা লাগে। ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন খেলতে ব্যাট লাগে। হাডুডু, গোল্লাছুট দাড়িয়া বাঁধা ইত্যাদি খেলার জন্য চাঁদা দিতে হয় না। কোনো সরঞ্জামও লাগে না। তাই মফিজ এসব খেলায় দক্ষতা অর্জন করেছে।
হাডুডু খেলায় ল্যাং, ক্যাচ ও বগলিতে দক্ষ খেলোয়াড়দের বেশ সুনাম। তাই মফিজ এগুলোর প্র্যাকটিস করেছে সাধ্যমতো।
ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলেই ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। একদিন এক নেড়ি কুকুরকে ল্যাং মেরে এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ফেলেছিল। খেলার সময় প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের বন্ধুরা সতর্ক করে দিত হয় বলে,
– সাবধান, মফিজের ল্যাং খাইছ না। সে চাইর ঠ্যাংও হোতায়া ফালায়। হাডুডু খেলায় দম চুরি করা কোনো দোষের নয় বলে অনেকে মনে করে। ধৃত খেলোয়াড় দুই তিনবার দম নিয়ে ছুটে আসার চেষ্টা করে। তবে বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে আপত্তি ওঠে। মফিজের প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড় প্রায় তিন মিনিট দম নিয়ে হুড়াহুড়ি করে নিজ সীমানায় ফিরে এলে সকলে তীব্র আপত্তি জানায়।
– এতক্ষণ দম থাহে না। রেফারি থাকলে অনেক আগেই আউট কইরা দিত। হেয় আউট।
আসামি খেলোয়াড় ও মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে।



www.pathagar.org

– আমারে তোরা চিনছ না। আমি পাঁচ মিনিট দম রাখবার পারি। পানির মধ্যে ডুব দিয়া দুই মিনিট থাকবার পারি। বিশ্বাস না অইলে চল আমার লগে। তীব্র হৈচৈ এর পর দুই পক্ষ সমঝোতায় আসে। কেউ আউট হবে না। কথিত খেলোয়াড় আবার ছি দেবে।

'হেই কাবাডি কাবাডি বলে দম নেয়ার সাথে সাথে মফিজ লাফ দিয়ে গলায় ক্যাচ মারে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে খেলোয়াড়। মফিজ দুই পা দিয়ে গলায় এমন চাপ দেয়, ব্যাটার জিভ বের হওয়ার উপক্রম হয়।

– কিরে, দম আছে না গেছে?

বাকি খেলোয়াড়রা উল্লাসে ফেটে পড়ে। একজন কটাক্ষ করে বলে–

– এইবার ছাড় মফিজ ভাই। নইলে আসল দম বাইর অইয়া যাইব।

– ওর দম বলে খুব লম্বা। একটু দেইহা লই, কতদূর লম্বা।

যে আনন্দ বিনা পয়সায় পাওয়া যায়, তার জন্য মানুষ কেন পয়সা খরচ করে, মফিজের বুঝে আসে না। দেশে মাঠের অভাব নেই।

সবখানেই খেলা হয়। কোন ভিড় নেই। দেখার জন্য বিধি নিষেধ নেই। তবু বেকুবরা টিকেট কেটে স্টেডিয়ামে যায়। ইটপাটকেল টিয়ার গ্যাস খায়। টিভিতে রিলে করা খেলা মাঠে গিয়ে দেখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

যাত্রা, নাটক, জারিগান, টকি সিনেমা বিনা পয়সায় দেখা যায় অনায়াসে। এসব অনুষ্ঠানে দশ মাইল সীমানার ভেতর কোথাও হচ্ছে বলে খবর পেলে মফিজ ছুটে যায় সেখানে। গ্রামে একবার সার্কাস পার্টি এসেছিল। কিন্তু টিকেট ছাড়া ঢুকার যো নেই। শহরের সিনেমা হল ও থিয়েটার মঞ্চের টিকেটের তুলনায় সার্কাসের টিকেটের দাম খুবই কম। তবু মফিজ আব্বার কাছ থেকে খসাতে পারেনি সেই অর্থ। বন্ধু বান্ধবদের মুখে শুধু সার্কাসের গল্পই শুনেছে বিনা পয়সায়।

তারের ওপর দিয়ে হাঁটা, এক চাকার সাইকেলে চরকির মত ঘোরা, রশি বেয়ে বহু ওপরে ওঠা এবং শূন্যে ঝুলা ইত্যাদি। ত্রিফলা বর্শার মতো ভয়ঙ্কর খেলার বর্ণনা শুনলেই কয়েক টাকার মজা পাওয়া যায়। জোকারদের কৌতুক খেলার চেয়েও মজা। দেখার অর্ধেক মজা শুনেই পাওয়া যায়। ঘ্রাণে যেমন অর্ধ ভোজন, শুনেই তেমন অর্ধ দর্শন।

ইদানীং হাটে বাজারে মাঝে মধ্যে মিনি সার্কাস পার্টি দেখা যায়। বিনা পয়সায় সার্কাস দেখায়ে ঔষধ বিক্রি করে। পেটে চাক্কু মারার খেলা দেখে এখন আর কেউ ভয়ে পয়সা দেয় না। স্প্রিংয়ের চাকুর কেরামতি বুঝে গেছে সবাই। তাই দাঁতের মাজন, দাউদের মলম আর কৃমির বড়ি বিক্রি করে খুদে সার্কাস পার্টি।

মফিজ ফুটপাথে সার্কাস দেখে, সাপের খেলা উপভোগ করে, আর বজলু মিয়া কমলা সুন্দরীর কবিতা শোনে। ঔষধ বেচার লেকচার শুরু হলেই কেটে পড়ে। এদের লেকচারও বেশ মজাদার। শুনে শুনে সবই মুখস্থ হয়ে গেছে মফিজের। তাই এখন



www.pathagar.org

আগের মত মজা পায় না। বরং বন্ধুদের আড্ডায় নকল করে শুনিয়ে বেশ মজা পায়। এতক্ষণ আপনারা যেই সব সাপ দেখেছেন, এগুলোরে আমি কই কেচ্ছা। আসল সাপ দেখবেন এইবার। শুধু নাম শোনছেন, কোনোদিন চোখে দেখেননি। কালনাগিনী। কালনাগিনীর লোভ দেখিয়ে মনিরাজ গাছের শিকড় আর তিন ধাতুর মাদুরি বিক্রির লেকচার যেমন মফিজের মুখস্থ, তেমনি মুখস্থ টনিক বিক্রির কৌশল।

আপনার মূল্যবান স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহার করুন পাওয়ার ভিটামিন ওরাল টনিক। যাদের জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, মাজায় কোমরে ব্যথা, গিরায় গিরায় ব্যথা। যারা বাতে অর্ধাঙ্গ হয়ে গেছেন, উঠলে বসতে পারেন না, বসলে উঠতে পারেন না, শরীর ঝিম ঝিম করে, মাথাটা চক্কর মারে, তাদের জন্য সুসংবাদ, পাওয়ার ভিটামিন অরাল টনিক।

গতর গতর খাউজানি, হায়রে মজার চুকানি। পাপড়ি, খুজলি, বিখাউজ, কাটা, পোড়া, মচকা, ভাঙা, দাউদ একজিমা, সকল প্রকার চর্মরোগের জন্য ওয়ান্ডারফুল কাজ করে ওয়ান্ডারফুল মালতি মলম।

মানুষের সৌন্দর্য মুখ, মুখের সৌন্দর্য দাঁত। দাঁত একবার হারালে আর ফিরে পাবেন না। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা জানে না বাঙালি। গায়ে মাখে ইন্টারন্যাশনাল লাক্স, জুতায় বিদেশী ক্রিম, চুলে দেয় নামীদামি স্যাম্পু। কিন্তু পবিত্র মুখের অমূল্য দাঁতে লাগায় চুলার ছাই আর বালি। এখন থেকে সাবধান হউন। অপনার মূল্যবান দাঁতের জন্য ব্যবহার করুন তুফান এন্ড কোম্পানির নিম টুথ পাউডার। অল্প নড়া দাঁতকে লোহার মত শক্ত করবে, ময়লা দাঁত মুক্তার মত ঝকঝকে করবে। আমার সামনে আপনারা যে ঝড়িবটিকা জঙ্গলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আসলেই জঙ্গল। আল্লাহপাক বলেছেন, জঙ্গল হলো মানবের জন্য মঙ্গল। এসব জঙ্গল চিনলে ঝড়ি না, চিনলে চুলা গুতানো খড়ি।

নিম এখনও তিতা লাগে, মরিচ অন্ধকারেও ঝাল লাগে। জঙ্গলের গাছের গুণ আগের মতই আছে। যদি কেউ বলেন, গাছের কোনো গুণ নাই, তাকে আমি একটা ধুতরার বিচি খাইয়ে দেব অথবা চোতরা পাতা দিয় শরীরে একটা ঘষা লাগায়া দিব। বুঝবেন গাছের গুণ কারে কয়।

জঙ্গলের গাছগাছড়া দিয়ে তৈরি কুয়াতে বাহার হালুয়া আর ওলট কমলের শরবত ব্যবসায়ীরা এখন সারা দেশে বিনা পয়সায় আনন্দ এবং অল্প পয়সায় ঔষধ বিলায়।

সিনেমার বাক্সে উঁকি দিলেই সামান্য পয়সা লাগে। দূরে দাঁড়িয়ে গান শোনা যায় বিনা পয়সায়।

– কি চমৎকার দেখা গেছে, ভারি মইজা লাইগা গেছে, কতো খেলা চলতে আছে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি অইছে।

দুনিয়াটা এখন যান্ত্রিক। মানুষগুলো খুবই ব্যস্ত। কর্মব্যস্ত মানুষগুলো কাজের শেষে একটু বিনোদন চায়। কিন্তু পয়সা খরচ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনেকের নেই। এমতাবস্থায় যদি কেউ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ঢোল তবলা হারমোনিয়াম নিয়ে সুর



www.pathagar.org

তোলে–

'মন আমার দেহ গড়ি সন্ধান করি কোনো মিস্ত্রি বানায়াছে।
মন আমার দেহ ঘড়ি। একদিন চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া/ জনম ভাইরা চলতে আছে।
... মন আমার দেহ ঘড়ি...।'

অথবা 'বরিশাল জেলার পড়ে আমতলি থানার মাজার/ কিভাবে যে ডাকাত মারে শোনেন সমাচার।'

তখন শ্রোতার অভাব হয় না। বিনা পয়সার আনন্দ উপভোগের নিরলস সাধনা মফিজকে বিনা পয়সায় খাবার এবং কম দামে ভাল জিনিস লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে। শিশুকালে সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরেই ঈদের দিনে শবেবরাতের রাতে বিনা পয়সায় ভাল খাবার পাওয়া যেত। বিয়ে বা খাতনার অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের প্রবেশাধিকার ছিল অবারিত। মাটির ওপর বিছানো লম্বা তক্তায় বসে গেলেই পাওয়া যেত ভাত, গোশত, ডাল এবং সব শেষে মিডরি। মেজমান বেশি ধনী হলে দিত দধি। এসব অনুষ্ঠানে এখন মিডরির প্রচলন নেই। দধির প্রচলনও উঠে গেছে। জর্দা ও ফিরনি এসে দখল করেছে সে জায়গা। বিয়ে, খাতনা, আকিকা, বার্থ-ডে, ম্যারিজ-ডে ইত্যাদি অনুষ্ঠান বেড়েছে অনেক। কিন্তু বিনামূল্যে খাবারের অনুষ্ঠান কমে যাচ্ছে। চরম মূল্য এখন দিতে হয় নিমন্ত্রিত মেহমানদের। 'স্বাগতম' লেখা গেটের পেছনেই চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে মেজবানের প্রেজেনেটেশন কালেক্টর স্কোয়াড। বিমান বন্দরের কাস্টম কর্মচারীর মত সতর্ক চোখে অবলোকন করে মেহমানদের। খালি হাতে ঢুকলেই ধরা পড়বে নির্ঘাত।

ইছালে সাওয়াব, কুলখানি, চল্লিশা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এখনো প্রেজেন্টেশন বিনিময় পদ্ধতি চালু হয়নি। দাওয়াত পেলে বিনা মূল্যে এখনো খাবাব মেলে। মিলাদ মাহফিলে তাবারক খেতে দাওয়াত লাগে না। ইয়ানবী সালাম আলাইকা শব্দ শুনেই ঢুকে পড়া যায় যে কোনো অনুষ্ঠানে। তবে তাবারকের মান কমে গেছে অনেক। মিষ্টির পরিবর্তে বিস্কুটের প্রচলন শুরু হয়েছে অনেক আগেই।

মিলাদের অঙ্গন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ঐতিহাসিক বাতাসা। শবেবরাতে এখন বখাটে ছেলেদের প্যারডি শোনা যায় না।

বাতাসা এখন গবেষকদের খুঁজে পাওয়ার বিষয়। মসজিদভিত্তিক মিলাদের চেয়ে গৃহভিত্তিক মিলাদ বেশি লাভজনক। মেহমান মোটামুটি নিয়ন্ত্রিত থাকায় তাবারকের মান একটু উন্নত। একটি নিমকি ও একটি মিষ্টি আজকের বাজারে অবহেলার জিনিস নয়।

অনেক সাহেবের মুরিদদের জলসায় খিচুরির আয়োজন থাকে। মফিজের মতো বিনা আনন্দলোভী অনেক মানুষের সাক্ষাৎ মেলে সেখানে। ওয়াজ মাহফিলে শ্রোতার অভাব হলেও খাওয়ার প্যান্ডেল ভর্তি। মাটির সানকিতে গরুর গোশতের খিচুরি পরিবেশনের সনাতন পদ্ধতি এখনো চালু আছে।



www.pathagar.org

আবার কোনো কোনো পীর সাহেবের মুরিদদের জিকিরের মাহফিল আরো বৈচিত্র্যময়। তাদের দাওয়াতনামায় লেখা থাকে বিনা পয়সায় দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি। দুনিয়ার শান্তির জন্য টাকা পয়সার ভূমিকা ব্যাপক। কিন্তু আখেরাতের শান্তির জন্য টাকা পয়সার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? ব্যাপারটা তো এমন নয় যে দুনিয়ায় যে সবচেয়ে গরিব হবে, আখেরাতে সে সবচেয়ে ধনী হবে।

এক শ্রেণীর ধনী লোকের মনে এমন ধারণা জাগতে পারে যে, মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় লাখ লাখ টাকা দান করে দিলে বেহেস্ত আর ঠেকাবে কে? গরিব লোক বাঁচে কয়দিন? নামাজ রোজা করে সাওয়াবের বস্তা আর কতটুকু ভরবে পঞ্চাশ ষাট বছরে? ধনীদের সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব জমা হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

কিন্তু মফিজ একদিন বিনা পয়সায় কিছু আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের আশায় এক তাফসির মাহফিলে ঢুকে পড়েছিল। মাওলানা সাহেব যে তাফসির করলেন, তা এদেশের ধনী লোকদের না শোনাই ভালো। হুজুর বলেছিলেন, আল্লাহর পথে টাকা খরচ করলে আল্লাহ খুশি হয় ঠিকই। তবে সে টাকা হালাল হতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর হিসাবও নাকি সম্পূর্ণ উল্টা। দুনিয়ার মানুষ হিসাব করে, কে কত দিলো। আল্লাহ হিসাব করেন, কে কত রাখলো।

সম্পদশালীদের জাকাত দেয়া অপরিহার্য। এটা তাদের বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস বিলের মতোই বাধ্যতামূলক দেনা। সময় মত পরিশোধ না করলে শাস্তি পেতে হবে। নিয়তের গরমিলের কারণে বড় বড় দাতাদের জাহান্নামে যাওয়ার সুযোগ খুব প্রশস্ত অথচ রাস্তা থেকে একটি কাঁটা সরিয়ে ফেলেও প্রচুর সাওয়াব লাভের সুযোগ আছে মফিজের মতো গরিব ছেলেদের। কারণ নিয়ত পরিষ্কার। লোক দেখানোর কোনো বালাই নেই।

মফিজ যেমন হাজার টাকার সোয়েটার বিশ টাকায় কিনতে পারে ফুটপাথ থেকে, তেমনি এক পয়সা দান করে সত্তর পয়সার সওয়াব নিতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত দানের মাধ্যমে। এটার নামই মুক্ত হস্তে দান। হাজার হাজার টাকা অনেকেই মুক্ত হস্তে দান করে না। বহু তেল মালিশ করে তাদের পকেট থেকে বের করতে হয়।

বিনা পয়সায় দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি কামাই করার জন্য তাই মফিজ আর আজানগাছি যায়নি। বিনা পয়সায় যেমন আনন্দ মেলে তেমনি সওয়াবও মেলে। তবে কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হয়। তবু খোঁজার সময় মনে মনে ঐ গানটি গাইতে মফিজের বেশ ভাল লাগে।

'পয়সা ছাড়া দুনিয়ায়, মজা কিছু মেলে না।'

ঈদসংখ্যা : জানুয়ারি, ১৯৯৯



www.pathagar.org

# অন্য রকম পৃথিবী

আহমদ মতিউর রহমান

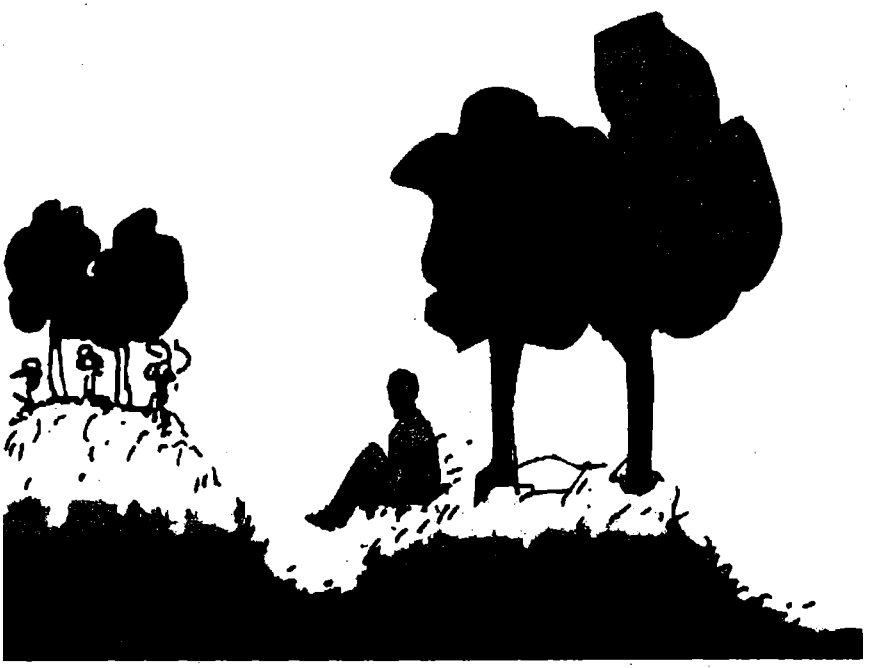

www.pathagar.org

*এক.*

আজ খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠলো রাজু। এমনি এমনি উঠে গেছে, ঠিকতা নয়। আটটা নয়টা না হলে প্রতিদিন বেশ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা রাজুর অভ্যাস। অভ্যাস কেন, বলা যায় বদঅভ্যাস। আব্বু আম্মু কত বকাঝকা করেন, এ জন্য আজ আব্বু শুধু বকাঝকা করে ক্ষান্তি দিলেন না। আব্বু নামাজ থেকে ফিরেই সকাল সকাল ঠেলে জাগিয়ে তুললেন। প্রতিদিন অবশ্য ঠেলে ঠুলেই চলে যান। আর রাজু উঠি উঠি করে সেই কড়কড়ে রোদ পর্যন্ত ঘুমায়। কিন্তু আজ আর তা হলো না।

আব্বু রোজ সোবহান সাহেবের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে বের হন। এরপর বাসায় ফেরেন কোন দিন আটটায়, কোনো দিন আরও পরে। সুতরাং রাজুকে ফিরে এসে পড়ার টেবিলে দেখে ফাঁকিফুকির কথা ভাবতে পারেন না ।

আজই অনেক দিন পর ব্যতিক্রম হলো। আজ রাজুর মনে হচ্ছে জীবনে এই প্রথমবার সে ভালো করে সকাল দেখছে। এই শহরে সকালটা যে কখন আসে আর কখন যে যায় টেরই পাওয়া যায় না যেন। আসলে সকাল নামে একটি ভালো লাগা মিষ্টি সময় যে আছে তা যেন একদম ভুলেই যাচ্ছিল সে।

সকাল, মানেই ভোর। কাক ভোর। সূর্য যখনো ওঠেনি। হয়তো উঠি উঠি করছে। আলো আঁধারির সে এক অন্য রকম পৃথিবী। গাছগাছালি আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাখি ডাকছে। বাড়ির আঙিনায় মোরগগুলো কুক কুরু কু ডেকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছে। চারদিকে শান্ত নির্জন। একটা ঠান্ডা শীতল আমেজ যেন বকুল কিংবা হাস্নাহেনা ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ হয়ে সারাক্ষণ নাকে লেগে আছে। এক ফাঁকে মসজিদ থেকে ফজর নামাজ শেষে সবাই বের হয়ে এলেন। মোড়ল বাড়ির আবিদ মোড়ল কিংবা তার ছেলে নুরু লাঙল কাঁধে গরু দু'টি তাড়াতে তাড়াতে উত্তর দিকের পথ এই মাত্র আলো আঁধারির জালে সেধিয়ে গেল। রাজুর কল্পনায় নিজেদের গ্রামের ভোর এমনি একটি সহজ সরল চিত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

লবাইর কান্দি ওদের নিজেদের গ্রাম। দেশের বাড়ি দাদা-দাদী, চাচা-চাচীসহ সবাই থাকে সেখানে। রাজুরা অবশ্য শহরে থাকে। ওর আব্বু শহরে চাকরি করেন। তাই শহরে থাকতেই হয়। ওর জন্য শহরে। গ্রাম শুধু ওর কাছে বেড়ানো আর খেলে সাঁতার কেটে কাটানোর জায়গা। প্রতি বছরই ওরা গ্রামে আসে। কোনো দিনই তার কাছে খারাপ লাগে না। ওদের গ্রামের নামটা অবশ্য ওর কাছে অদ্ভুত লাগে। এই নামটির কোনো অর্থ সে খুঁজে পায় না। শেষে সিদ্ধান্তে আসে এই বলে যে লবাই নামে হয়তো কেউ ছিল যে এই কান্দি বা গ্রামটির পত্তন করেছিল। সে কবেকার কথা কে জানে!

*দুই.*

ওদের গাঁয়ের সেই ছবি ছাড়া মনের ভেতর ভোরের অন্য কোনো ছবি বানাতে পারে না রাজু।



www.pathagar.org

সে গাঁয়ে এমন এক সকালে জাহাঙ্গীর নামে গাঁয়েরই আরেকটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয় রাজুর। সেবার স্কুলে ছুটি না থাকলেও কি একটা কারণে আব্বু আম্মুর সঙ্গে দেশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল সে।

মোহন কাকা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে রাজুকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এভাবে : ওর নাম জাহাঙ্গীর। আমরা ডাকি জাঙ্গী, ক্লাস থ্রিতে পড়ে। রাজুর চেয়ে বয়সে বড় হয়েও জাহাঙ্গীর ছোট ক্লাসে পড়ে কেন এ প্রশ্ন মনে এলেও সেদিন থেকেই ছেলেটিকে ওর কেন জানি খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ওর অদ্ভুত সুন্দর হাসি আর নানা অভিযানে বের হওয়ার বোহেমিয়ান স্বভাব। রাজু তাই ওর নাম দিয়েছিল জঙ্গী। জঙ্গী ডাকলেও জাহাঙ্গীর তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করতো না। হয়তো ও নামটি তারও পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

বড় দাদু পরে বলেছিলেন, গ্রাম-দেশতো, তাই ছেলেমেয়েরা বড় হয়েও ছোট ক্লাসে পড়ে।

যতদিন রাজু গ্রামে ছিল প্রতিদিনই জাহাঙ্গীর আর মোহন চাচাকে নিয়ে হাঁটতে বের হতো। বের হতো পাখি শিকার, আমগাছে চড়া আর মাছ ধরার অভিযানে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রতিদিন অনেক গল্প শোনাতো জঙ্গী। ঘুঘু পাখি, টুনি পাখি, ঘুটঘুটি সাপ আর অনেক জিনিস নিয়ে গল্প করতো জঙ্গী। সে সব শুনে ওর মনে হতো তার শহরে থাকাটাই বৃথা, জাহাঙ্গীর গ্রামে থেকে তারচেয়ে ছোট ক্লাসে পড়েও কত কিছু জানে।

ঘুঘু পাখি, ঘু-ঘু-ক ঘুঘু ঘুক ডেকে কি বলে, শালিকরা ঝগড়া করে কি নিয়ে আর ঝগড়া করার সময় কি বলা-কওয়া করে, আর গেরস্তেদের তাজা তাজা মোরগগুলো সেই কাকভোরে ডেকে ডেকে গলা ফাটায় কেন আর তারা কি বলে মানুষকে ডাকে– সব জানা ছিল তার।

জাহাঙ্গীর বলতো, মোরগগুলো নাকি ডেকে ডেকে বলে, ওঠো রে শেখ। অর্থাৎ হে মুসলমান তোমরা ওঠো আর নামাজের জন্য তৈরি হও। কুক কুরু কুক শব্দের বাজনার সঙ্গে ওঠো রে শেখ শব্দের বাজনার যেন আসলেই একটা মিল রয়েছে বলে মনে হতো রাজুর।

দুপুরে রাজুকে নিয়ে জঙ্গী পাখির বাসা খোঁজার অভিযানে বের হতো। কোন বাসায় ক'টা ডিম, কোন বাসায় কবে বাচ্চা ফুটেছে, চোখটাই বা ফুটবে কবে ইত্যাদি সবই জঙ্গীর জানা।

জঙ্গী বলতো, রাজু মিয়া তুমি খালি নিচে খাড়াইয়া থাকবা আমি পইকের ছাও পাইরা লইয়া আসমু। রাজু তাই করতো ।

*তিন.*

রাজু উঠলো। বারান্দা পেরিয়ে বাইরে ভেজা ঘাসের চিকন ডগার ওপর পা রাখলো। এখন রাজুর অনেক হালকা মনে হচ্ছে। আর এক রকম ভালো লাগায় বুকটা ভরে



www.pathagar.org

যাচ্ছে। রাজুর নিজেকে একদম হালকা মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করলেই যেন সে পাখির মতো ডানা ঝটপটিয়ে উড়াল দিতে পারে।

রাজু দেখলো চড়ইগুলো ভেন্টিলেটারে পাশ ঘেঁষে দেয়াল আর বেরিয়ে থাকা লোহার শিকের ওপরে বসে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। পাখিগুলো ভেন্টিলেটারের ফোকর গলিয়ে ঘরের ভেতর হরদম আসা-যাওয়া করে। এগুলোর ডাকাডাকিতে রাজুর আম্মু প্রায়ই বিরক্ত হন। কিন্তু কিছু করার নেই, ওগুলো রোজ রোজই জ্বালাতন করে। মাঝে মাঝে রাজুর নিজেরও বিরক্তি ধরে যায়।

আজ চড়ুইগুলোর ডাক অন্যরকম লাগালো রাজুর কাছে। কেন জানি ভাল লাগছে খুব। ওর মনে হতে থাকে চড়ই পাখিগুলো হুল্লোড়-আনন্দ করছে। রাজু কতক্ষণ দেখলো। একবার ওর মনে হলো সে চড়ুই পাখি হয়ে যায়।

পা বাড়ালো রাজু। ওদের বাসার পথটা ছেড়ে এক্ষুনি ও পাকা রাস্তায় পড়বে। একবার কি ভাবলো। তারপর সত্যি সত্যি বাড়ির বাইরে গেল সে।

*চার.*

সকালটা এখনো নির্জনতায় ডুবে আছে। আস্তে আস্তে আঁধার পাততাড়ি গুটিয়ে পালাচ্ছে। দূরে চায়নাদের আমবাগানে আরো কয়েকটি পাখির ডাক শুনলো সে। চায়নার আম্মা নামাজের জন্য অজু করছেন। কয়েকটা পাখি পাতার আড়ালে থেকে শুধু ঝুপঝাঁপ লাফাচ্ছে আর ডাকছে। রাজুর আরেকবার পাখি হতে ইচ্ছে করলো। সুন্দর ডানাওয়ালা পাখি। যেন সে বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে। যেগুলো ঝটপটিয়ে ডানা মেলে দূর আকাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়ে চলতে পারে রাস্তায় চলতে চলতে এক সময় মনে হলো রাজু সত্যি সত্যি পাখি হয়ে গেছে। চারদিকে ফুরফুরে বাতাস। নিজেকে আরো হালকা মনে হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে এই তো সে উড়াল দিয়ে এগিয়ে যচ্ছে।

এক সময় খানপুরের মাঠে পৌঁছে পরিচিতি দু'একজনকে দেখে মনে হলো সে এখন আর পাখি নয়। কত লোক। কেউ লাফাচ্ছে। কেউবা আবার হালকা চালে দৌড়াচ্ছে। এর আবার বাহারি নাম আছে। একে বলে জগিং করা। বিচিত্র পোশাকে নানা রকম মানুষ জগিং করছে। আবার কয়েকজন ব্যায়াম করতে লেগে গেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই বড় বড়, আব্বু আর মামার মতো। এত বড় বড় মানুষেরা এমনি করে? দারুণ অবাক হলো রাজু।

অনেক ছোট ছোট ছেলে আছে। এক পাশে দেখলো সে সবাই দৌড়-ঝাঁপে ব্যস্ত। ছেলেদের দলটিকে পাশে ফেলে রেখে আরো এগুলো রাজু। বাসার কথা ভুলেই গেল। এক সময় রেল লাইনে গিয়ে উঠলো সে। এবার রাজু একেবারে থ।



www.pathagar.org

দাদুর বয়েসী সব বুড়োরা তাদের মোটা পেট আর ভুঁড়ি নিয়ে লাফাচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে। এই বড় ভুঁড়ি নিয়ে এমনি দৌড়ানো যায়, ও মরে গেলেও কোন দিন কল্পনা করতে পারতো না। ওরা অবশ্য এই মেদভুঁড়ি কমানোর জন্যই হয়তো এই কসরত করেছে। কিন্তু ওর মনে হতে থাকে দাদু হলে ভুঁড়ি না হলে কি মানাবে? ভুঁড়ি না থাকলে মজা করে ছড়া কাটবে কি নিয়ে?

*পাঁচ.*

রেললাইনের পাশ ঘেঁষে নিচু ডোবামত পুকুরে কচুরির ফুল দেখলো রাজু। লবাইর কান্দি গ্রামে জাহাঙ্গির কচুরির ফুল জোগার করে দিত ওকে, মনে পড়লো। শহরের এদিকটা অনেকটা গ্রামের মতন। দূরের গ্রাম ও ধানের ক্ষেত দেখলো রাজু, সবুজে সোনায় একাকার হয়ে গেছে। তারই সমবস্ক একটি ছেলে সাত সকালে ফুল গাছে পানি দিচ্ছে। এদিকটায় এলে এমনি কেন জানি ভাল লাগে ওর। সারা প্রাণ খুশিতে আকুল হয়।

রাজু রেললাইন ধরে আরো এগিয়ে চললো। আস্তে আস্তে চানমারি টিলার দিকে এগুতে থাকলো সে। বাসায় ফেরার কথা একদম ভুলে গেল সে। এক সময় সামনে ওদের পাড়ার রুমি ভাইয়াকে দেখলো যেন রাজু। হ্যাঁ রুমি ভাইয়াতো। একবার ভাবলো ডাক দেয়। তারপর সত্যি সত্যি রুমি ভাইয়া বলে ডাকলো রাজু।

না। কোন সাড়া নেই। রেল লাইনের কাঠে তালে তালে পা ফেলে রুমি ভাইয়ার মতো যাকে মনে হয়েছিল সে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ধ্যাত! এই রুমি ভাইয়া নয়। এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পায় রাজু। রুমি ভাইয়া হলে তাকে বলে বসতো : কি রে রাজু, এত ভোরে ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস! হারিয়ে যাবি যে। পেছনে ক্রমশ লাল সোনালী সূর্য আসমানের পর্দা ফেঁড়ে বেরিয়ে আসছে। চারদিকে সোনালী লাল আলো। রাজু একটু দাড়িয়ে থেকে দেখলো। এ যেন নতুন একটি জগৎ দেখেছে সে। প্রতিদিন বেলা করে আর ঘুম থেকে উঠবে না মনে মনে ঠিক করলো। প্রতিদিন খুব ভোরে উঠবে। উঠে নামাজ পড়ার অভ্যাস করবে সে। আব্বু আম্মু কতনা খুশি হবেন এতে। আর নতুন সে জগত তার সামনে মেলে ধরলো, প্রকৃত অর্থে তার ডাক আর সে উপেক্ষা করতে পারবে না।

চানমারি টিলার কাছাকাছি পৌঁছে ঘাসের ওপার ধুপ করে বসে পড়লো রাজু। আজকের কালকের আর আগেকার অনেক কথাই ভবলো সে। খানিক আগে ডান দিকে মোড় ফিরে রুমি ভাইয়ার মতো লোকটা কোথায় গেল বুঝতে পারে না রাজু। ফুল ফসলের ক্ষেতে হযতো বা সে হারিয়ে গেছে। তাকে এক্ষুনি বাসার পথে পা বাড়াতে হবে। পুবের আকাশে এখনো সূর্যের সুবর্ণ ছটা লেগে আছে। কি কোমল, কি পেলব!

ঈদ সংখ্যা ॥ জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮



www.pathagar.org

# ঘুমপাড়ানি

নাজিব ওয়াদুদ

www.pathagar.org

লেবুগাছটায় অসংখ্য ফুল। কচি কচি গুটি ধরতে শুরু করেছে। সবুজ সবুজ গোল গোল দানা। কী সুন্দর! গাছটার কাছে যায় সুফিয়া। আহ্ কি মিষ্টি সুবাস! প্রাণ ভরে যায়। জোরে শ্বাস টানে সুফিয়া। মনে হয় বুকের মধ্যে ঢুকে গেল সমস্ত সুবাস! শরীর কেমন তরতাজা হয়ে ওঠে। মনটা কেমন দোয়েলের মতো চঞ্চল, উড়ু উড়ু হয়ে যায়। আহ, কী যে মজা হতো, যদি তার দুটো পাখনা থাকতো। ভাবে সুফিয়া। কিন্তু উপায় নেই। মানুষের পাখা থাকে না, মানুষ উড়তে পারে না। মাগরিবের আজান পড়লো।

– কইরে বইন, এদিকে আয় অজু করি। নামাজ পাড়বি না? নানীর ডাক শুনে ছুটে গেল সুফিয়া। নানীর দেখাদেখি অজু করে নিলো, তার পাশে দাঁড়িয়ে নামাজও পড়লো।

এখন রাত। এই গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি। রাত মানে গভীর অন্ধকার। তবে জোছনা আছে। তবু আর কোথাও তার যাওয়া চলবে না এখন। কড়া নিষেধ। চারদিকে ঝোপঝাড়, গাছপালা। সাপ-খোপের ভয় আছে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাকে সঙ্গীতের মূর্ছনা। শেয়াল তো সন্ধ্যা থেকেই ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। ভয় লাগারই কথা সুফিয়ার। শহরে বাস করা সদ্য শৈশব পেরোনো মেয়ের জন্য গ্রামের এই পরিবেশ রহস্যে ঘেরা, সুতরাং ভয়ের। তবে আকর্ষণও থাকে। দিনের বেলায় সমস্ত পাড়াটা, দক্ষিণের মাঠটা, পশ্চিমের জঙ্গলটা, সব দেখে এসেছে সে। সঙ্গে ছিল আজিমা, মারুফা, শাহীন, নানু। কী যে ফূর্তি লাগছিলো তার! কত রঙের পাখি। কত যে লতা-গুল্ম। কত যে গাছ-গাছালি। পায়ের নিচে মুখমন্ডলের মতো পুরো নরম ঘাস। কোথাও শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। মচমচ। মচমচ। মচমচ। আহা, সে যেন কল্পপুরীর রাজকন্যার কানন। সুফিয়া গাছে উঠতে জানে না। কিন্তু আজিমা-মারুফারা কেমন তরতর করে গাছে উঠে যায়। ঠিক চিড়িয়াখানায় দেখা বানরগুলোর মতো। এ ডাল থেকে ও ডাল। ও ডাল থেকে সে ডাল। নিচ থেকে ভারি দুঃখ হচ্ছিলো সুফিয়ার। ইস! কেন যে সে গাছে চড়া শিখলো না! তবে শিখে নেবে। তাকে শিখিয়ে দিতে চেয়েছে ওরা। কী মজাই না হবে তখন। উফ! খুশিতে চোখ বুজে আসে সুফিয়ার। তার কচি মুখে জোছনার আলো আদর ছড়িয়ে দেয়। আবার লেবুগাছের ওপর চোখ পড়ে সুফিয়ার। উঠোনের পূর্ব-দক্ষিণে কোণে গাছটাকে দেখে বইয়ের ছবির মতো মনে হয়। কী সুন্দর! জোছনার আলোয় মনে হয় কুয়াশা যেন আদর হয়ে চুঁইয়ে পড়ছে গাছের সর্বাঙ্গে। সাদা সাদা ফুল। গাঢ় সবুজ পাতা কিছুই তেমন স্পষ্ট নয়। কেমন একটা মায়া মায়া ভাব ওখানে। নিশ্চয়ই পরীরা এসে বসে। না বসে পারে? সে পরী হলে কি না বসে পারতো? সুফিয়ার ইচ্ছে জাগে লেবুতলায় গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু যেতে পারছে না। মায়ের বারণ, রাতে উঠোনের নিচে একা নামবে না। নামাজের পর নানীও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সে কথা। মুরুব্বিদের কথা অমান্য করা ঠিক নয়, ভাবলো সুফিয়া। সে শানের ওপর বসে পড়লো।

কিরে বইন, বুড়ি মানুষের মতো বসে বসে কী ভাবছিস?



www.pathagar.org

না, নানী, কিছু না। তোমার কথাই ভাবছি। নানীকে পেয়ে ভারী খুশি হলো সুফিয়া। ওমা আমার বুড়ি রে। কী মন ভুলানো কথা। নাতনীর পাশে বসে তাকে কোলে তুলে নিলেন নানী।

লেবু গাছটা কী সুন্দর, না নানী? কী সুন্দর ফল! কী মিষ্টি সুবাস। ওখানে কি পরীরা এসে বসে? সাদা পরী, নীল পরী, লাল পরী, ঐ ফুলের মতোই সুন্দর। উৎসুক হয়ে ওঠে সুফিয়ার চোখ।

তুমি ওদের দেখেছ, নানী? কেমন দেখতে ওরা? খুব সুন্দর?

– খুউব সুন্দর! ঐ জোছনার মতো দুধ ধোয়া রং। দীঘল কালো কেশ মেঘের মতো ভাসে। বাতাসে ওড়না ওড়ে ফুরফুর... ফুরফুর... আর কী সুন্দর যে ওদের মুখ, ঠিক তোর মতো।

– আমার মতো?

লজ্জা পায় সুফিয়া।

– ধ্যাত। আমার মতো হবে কেন?

– কেন হবে না? তোর মতো নাক, তোর মতো চোখ, তোর মতো ভুরু, গালে এমনি একটা ছোট্ট তিল... ঠিক তোর মতো। শুধু যদি দুটো পাখনা থাকতো তোর!

– তাহলে কী হতো নানী?

– ও মা সে কথা জানিস নে? পাখা থাকলে তুই সত্যি সত্যিই পরী হতে পারতিস। কেমন গুনগুন গুনগুন করে উড়ে যায় পরীর দল। গুনগুন গুনগুন গুনগুন ... পাখনা থাকলে তুইও অমন উড়তে পারতিস। উড়তে উড়তে চলে যেতিস চাঁদের দেশে... গুনগুন... গুনগুন... গুনগুন.... গুনগুন।

মায়ার জগতে চলে যায় সুফিয়া। নানীর কোলে মাথা রেখে সে ভাবে– আহা! আমার যদি সত্যি সত্যিই পাখনা থাকতো। তাহলে উড়ে যেতাম। ... উড়ে ফেতাম দূর আকাশে ... পরীদের দেশে... পরীদের দেশ ছাড়িয়ে চাঁদের দেশে... গাছপালা ছড়িয়ে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে, ফুরফুর করে ওড়না উড়িয়ে শুধু ওড়া আর ওড়া... শুধু গুনগুন ... গুনগুন ...গুনগুন...

ওগো, তুমি কে গো? কোথায় চলেছ অমন একা একা?

– আহা পথের মাঝে আবার ডাকো কেন? আমার খুব তাড়া।

– আহা, একটু দাঁড়াও না ভাই। কোথায় যাচ্ছো?

নীলপরী মিনতি জানায়।

– আচ্ছা, বেশ, বেশ। আমি চাঁদের দেশে যাচ্ছি।

খুশিতে লাফিয়ে উঠলো নীল পরী :

– ওমা চাঁদের দেশে? সে কী গো! একাই যাচ্ছ নাকি?

ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্য দেখালো সুফিয়া। নীল পরীর আদেখলেপনাকে অনুসরণ করে



www.pathagar.org

বললো, একলা যাবো না তো দোকলা কোথায় পাবো গো?
নীলপরী আনন্দে আটখানা। সে পাখা ঝাপটে বললো, আমাকে সঙ্গে নেবে? নাও না ভাই। আমিও চাঁদের দেশে যাবো।
– যাবে তো এসো। বাধা দিচ্ছে কে?
– আর একটু দাঁড়াও না সই!
সুফিয়া গলে গেল। তুমি আমাকে সই বললে? তবে তাই হোক। আজ থেকে তুমি আমার সই।
– ওমা, কী খুশির কথা! তবে আরেকটু দাঁড়াও সই, আমার আরো সই আছে, ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। কই গো লালপরী, সাদাপরী, কোথায় গেলে? এদিকে এসে দেখো আমাদের কী সুন্দর আর একজন সই জুটেছে।
এদিক-ওদিক থেকে ছুটে এলো একদল পরী। সুফিয়াকে ঘিরে ঘিরে তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওরা আনন্দে কেমন নাচতে শুরু করে দিলো। সুফিয়াও ওদের সঙ্গে নাচলো। গাইলো। তারপর আবার উড়তে লাগলো ... গুনগুন.. গুনগুন... গুনগুন... উড়তে উড়তে চাঁদের দেশে পৌঁছালো।
আহা, কী সুন্দর দেশ! রঙিন মাটি, রঙিন আকাশ, আর রঙিন যতো গাছপালা · বাতাসও যেন রঙিন, যেন ছোঁয়া যায়, আর কতো মোলায়েম!
ওমা ঐ তো লেবুগাছ। তার সবুজ সবুজ পাতা, সাদা সাদা ফুল, বাতাসে ভাসছে মিষ্টি সুবাস। গাছের কাছে ছুটে গেল সুফিয়া।
অবাক হয়ে সে দেখলো গাছের নিচে সাদা ফুলের মখমল বিছানা পেতে বসে আছে চাঁদের মা বুড়ি। সে কি! এ যে তার নানীর মতোই দেখতে! ছোটখাট, চাঁদের মতোই ফর্সা রং, মাথায় লেবু ফুলের মতো সাদা সাদা চুল।
একটুও ভয় করলো না সুফিয়ার। সে এগিয়ে গেল।
– তোরা কে রে বাছা?
কী মিষ্টি কণ্ঠ চাঁদের মা বুড়ির! যেন গানের সুর। আর কত যে দরদ সেই সুরে!
– সে কি নানী, চিনতে পারছো না? আমরা পৃথিবী থেকে আসছি।
– পৃথিবী থেকে? আগে বলবি তো? তা হ্যারে বাছা, পৃথিবীতে আমার বোনটা কেমন আছে? কতদিন খবর পাই না।
– কার কথা বলছো তুমি? আমার নানীর কথা?
– তাছাড়া আর কার কথা বলবো, বল? আমার আর কে আছে?
– খুব ভাল আছে আমার নানী। ওর কাছেই তো তোমার কথা শুনলাম। সে-ই তো পাঠালো।
– আহা, বলবে না? আমারই বোন যে!
– কিন্তু...



www.pathagar.org

– আবার কিন্তু কিসের বাছা? অবাক হলো চাঁদের মা বুড়ি।
ঠোঁট উল্টায় সুফিয়া। মনে তার অভিমান,
– আমাদের তো কোনো খোঁজ নিলে না তুমি?
হেসে ফেলে চাঁদের মা বুড়ি।
– ওমা এ যে দেখছি আমার বোনটার মতোই হয়েছে। কথায় কথায় শুধু ঠোঁট ওল্টানো। আচ্ছা বাবা, দোষ হয়েছে। এবার হলো তো? আয়, বোস, আয়, কাছে আয়।
সবাইকে ডাকলো সুফিয়া। সবুজ গালিচায় সাদা ফুলের মখমল বিছানায় গিয়ে বসলো ওরা। কী মসৃণ, আর কী নরম বিছানা। কী মিষ্টি তার সুবাস! কাত হয়ে শুয়ে পড়ে ওরা। আহ ক্লান্তি... কী ক্লান্তি...
– আহারে বাছা, তোরা ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?
– হ্যাঁ নানী, আমরা খুব ক্লান্ত... আমরা এখন ঘুমাবো।
– বেশ। তবে এই শরবতটুকু খেয়েনে বাছারা। তারপর চোখে মায়ার অঞ্জন লাগিয়ে দেবো, আরাম করে ঘুমাবি। আয় বাছারা, শরবত খেয়ে নে... শরবতের সুগন্ধে ওদের চোখ আরো জড়িয়ে আসে। তবু শববতের বাটিতে চুমুক দেয়– চুঁ ... চুঁ ... চুঁ ... চুঁ...
– ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? ওমা লালায় যে বালিশ ভিজে গেল!
হাসে নানী। শাড়ির আঁচল দিয়ে নাতনীর মুখের লালা মুছে দেয়। নানীর চোখে মুখে জোছনার মতো স্নেহ ঝরে পড়ে, ভিজিয়ে দেয় তার সর্বাঙ্গ।
সুফিয়া এসব কিছুই বুঝতে পারে না। তার নাকে তখন চাঁদের মা বুড়ির শরবতের সুবাস। চোখে মায়ার অঞ্জন।

জানুয়ারি, ২০০১



www.pathagar.org

# সবুজ পৃথিবী লাল সূর্য

সাবিনা মল্লিক

www.pathagar.org

খুব একটা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আহমদের জ্ঞান ফিরে এলো। অন্ধকারে প্রথমটায় কিছু ঠাওর করতে না পারলেও সে যে শুয়ে আছে হাসপাতালে, সম্ভবত পোস্ট অপারেশন ওয়ার্ডে ক্রমে সেটা অনুভব করল। অ্যানেসথেশিয়ার প্রভাবে কোমরের নিচ থেকে তার কোনো সাড়া নেই। নিশ্চিত, সেখানে সার্জিক্যাল অপারেশন চালানো হয়েছে। জ্ঞান হারাবার আগে মার্কিনি বোমা বর্ষণ, দাউ দাউ করে আগুন, গ্রামবাসীদের ভয়ার্ত চিৎকার, মায়ের হাত ধরে ছোটাছুটি, নিজের শরীরে স্প্রিন্টার ঢুকে যাওয়া– ভয়াবহ কষ্ট ইত্যাদি কিছু চিত্র এবং কিছু অনুভূতি সে স্মরণ করতে পারছে। বাকিটা মনে নেই। না-একটু একটু মনে পড়ছে। কারা যেন তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন খুব হুড়োহুড়ি। তার আধবোজা চোখের সামনে ঘুরছে ফিরছে মুখোশ পরা কয়েকটা লোক। হঠাৎ সব অন্ধকার। কারা চেঁচাচ্ছে তার স্বরে কারেন্ট চলে গ্যাছে... কারেন্ট আর আসবে না। জেনারেটরে তেল নেই... বাতি আনো... হারিক্যান ... তেল নেই? মোম জ্বালাও ... কাঁচি ... কাঁচি ... চোখের সামনে আলো .... অন্ধকার ... ছায়া... মুখোশ...যেন প্রেতাত্মা ... নাহ্ আর কিছু মনে নেই।

আহমদের খুব পিপাসা পেয়েছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কেউ নেই। শুধু ধূসর ধূসর অন্ধকার। নিজের নিঃশ্বাসের ছাড়া আর কোনো শব্দও নেই। আশ্চর্য! সে একটুও নড়তে পারছে না। সে কি মরে গেছে? শুয়ে আছে কবরে? আহমদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। গরম লাগছে প্রচন্ড। একফোঁটা পানির জন্য তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে বুক। অনেক কষ্টে মাথাটা এদিক ওদিক নাড়াল ও। দুর্বল গলায় ডাকল, 'মা! মা!'

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর কে যেন এলো। তবে মা নয়। হাতে হারিক্যান খুব লম্বা পাহাড়ের মত এক লোক। মুখখানা মমতায় ভরা। সে হারিক্যান উঁচু করে ধরলে আহমদ তাকে দেখতে পেল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ও ভীষণ অনুনয় করে বলল, 'আমার মাকে একটু ডেকে দেবেন আঙ্কেল?' লোকটা ডান হাত রাখল আহমদের মাথায়। চুলগুলো এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল, 'অস্থির হয়ো না বাছা! আল্লাহকে ডাকো।'

'আঙ্কেল আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে। পানি খাব।'

হারিক্যানটা স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে লোকটা ওর মুখে একটু একটু করে পানি ঢেলে দিল।

আহমদের আবার একটা ঘুম ঘুম ভাব চলে এসেছে। কেমন শীত শীত লাগছে। হঠাৎ হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠছে গা-টা। আহমদ আবার তলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ঝকঝকে নীল আকাশ। অনেক অনেক উঁচুতে একটা ঘুড়ি বিন্দুর মতো। একলা হাওয়ায় ঘুরছে। নিচে মাঠের মধ্যে লাটাইয়ের সুতা ছাড়তে ছাড়তে আহমদ অবাক হয়ে দেখছে, ঘুড়িটা একলা নয়, একটা পরী আলতো হাতে ধরে ঘুড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরীটা আসলে মা। মাথায় চমৎকার লেসের ফ্রিল দেয়া সাদা ওড়না। ওড়নার দুই প্রান্ত পাখার মতো ছড়িয়ে আছে দুই পাশে। আহমদ আনন্দে আটখানা হয়ে চিৎকার ছাড়ল, 'মা! আমিও উড়ব মা! আমাকে না-ও ...'



www.pathagar.org

কিন্তু , অতো উঁচুতে ওর ডাক পৌছল না। মা নিচেও তাকাল না একটিবার। আপন মনে সে উড়েই যেতে লাগল। উড়েই যেতে লাগল উড়েই যেতে লাগল। আকাশে খুব আওয়াজ উঠেছে। বোধ হয় মেঘ করেছে। মেঘের ডাক। মাকে ফেরানো দরকার। কিন্তু আওয়াজ এত বেশি!

আহমদ মরিয়া হয়ে চোখ মেলল। ভীষণ রকমের গোলমাল চারদিকে। আকাশে যুদ্ধ বিমানের গর্জন। কাছে কোথায় বোমা ফাটছে। ওদের হাসপাতালের বিল্ডিংটা কেঁপে উঠছে থর থর করে। লোকজনের ছোটাছুটি চেঁচামেচিতে সেই বিভীষিকা।

আহমদ ভয়ে আবার চোখ বুজল।

মাথার কাছে কার যেন উদ্বিগ্ন গলা শুনতে পেল সে।

'আমাদের এক্ষুনি শিফট করা দরকার। যা অবস্থা দেখছি, যে কোনো মুহূর্তে এখানে বোমা পড়বে। এই পেশেন্টের লোকজন নেই জামাল?'

জামাল নামের লোকটা কথা বলতেই আহমদ চিনল– সেই আঙ্কেল। গভীর বিষাদের সাথে বলছে, 'নাহ, নেই। ডক্টর, ছেলেটা এতিম। আমি খোঁজ নিয়েছি। ওর নিকটজন বলতে ছিল শুধু মা। পরশু রাতের বোমা হামলায় তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। ওদের গোটা গ্রামটাই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে এর দেখভাল করার আর কেউ নেই।'

'হুম। একে তাহলে কি করা যায় বলতো? নিচের পেশেন্ট সব চলে গেছে। একে কি করবে জামাল? ডক্টর আহমদের কপালে হাত রাখলেন,

– 'আরিববাবা গা-তো পুড়ে যাচ্ছে। দেখি পা-টা।'

ডক্টর পা দেখার সময় আহমদের তীব্র যন্ত্রণাবোধ হলো। কথায় যেন সে এক্ষুনি মরে যাবে।

ডক্টর গম্ভীর। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন–

'ড্রেসিং শুরু করা দরকার। ব্লাড পাওয়া গেছে?'

– নাহ্। আমাদের কারো সাথে গ্রুপ মিলছে না। ডক্টর ওষুধের কি হবে? কোনো রকমের অ্যান্টিবায়োটিকই স্টকে নেই! স্যালাইন যে ক'টা আছে তাতে নতুন পেশেন্ট এলে বড়জোর দুটো দিন চলবে।'

'উ!' ডক্টরের অন্যমনস্ক গলা শুনতে পেল আহমদ। ফিস ফিস করে যেন আপন মনে বলছে, 'সব শেষ। ওষুধ শেষ। স্যালাইন শেষ। ডক্টর নার্স সব শেষ। একে বাঁচানো যাবে না মনে হচ্ছে জামাল। পায়ে পচন শুরু হয়েছে। গ্যাংগ্রিন। পা-টা এক্ষুনি কেটে ফেলা দরকার। কিন্তু কি করি বল! যেভাবে বম্বিং হচ্ছে হসপিটালই তো আর থাকছে না।'

কে যেন ছুটতে ছুটতে এলো।

– 'ডক্টর রাই! আপনি এখানে? নিচে আসুন। প্রচুর পেশেন্ট এসেছে। বোমায় ঝলসে যাওয়া মারাত্মক সব পেশেন্ট। কাম ডাউন! কুইক।'

– 'ডক্টর জায়েদ। আমরা কোনো অ্যাম্ব্রি নিচ্ছি না। ওদেরকে চলে যেতে বলুন। অন্য হসপিটালে যেতে বলুন। আমাদের স্টক ফুরিয়ে গেছে। এ হাসপাতাল উঠিয়ে দিতে



www.pathagar.org

হবে। এখানে বোম্বিংয়ের এখন প্রচুর আশঙ্কা। ওদেরকে বুঝিয়ে বলুন ...।'
আতঙ্কে, উদ্বেগে ডক্টর রাই পাগলের মত চেঁচাচ্ছেন। ডক্টর জায়েদ তাকে থামালেন। প্রায় ধমকের সুরে বললেন,
– 'কি বলছেন আপনি? কাছাকাছি আর হাসপাতাল আছে নাকি? নেমে আসুন। প্লিজ নেমে আসুন। কুল ডাউন ডক্টর। মনে রাখবেন। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা চেষ্টা করব। মুজাহিদরা জীবন বাজি রেখে লড়ে যায়। আমরা মুজাহিদ। আসুন আমার সাথে প্লিজ।
ডক্টর রাই চলে গেলেন। জামাল একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে আহমদের কপালে চেপে ধরল।
মা নেই। আহমদের মা মরে গেছে। এত বড় সত্যটা ও কি করে সইবে? সোভিয়েত হামলায় ওর আব্বা যখন শহীদ হয়েছিলেন তখন ও কেবল দুই বছরের শিশুটি। শত ঝড়-ঝাপটা দুঃখ বেদনায় মা-ই এরপর ওকে বুক দিয়ে আগলে অত্ত বড়টি করেছেন। দেশে কত হানাহানি হল, কোন্দল হল, গৃহযুদ্ধ সব বরবাদ হয়ে গেল। খরায়, দুর্ভিক্ষে কত লোক মরল। মা কিন্তু ওর গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেননি। কি করে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাকে। নিজে না খেয়ে দু'টি মুঠো অন্ন ঠিকই তুলে রেখেছেন নয়নের মণিটির জন্য।
সে রাতেও সে নিশ্চিত ঘুমুচ্ছিল মায়ের বুকে মুখটি রেখে। হায়েনাদের বোম্বিং শুরু হতে ওরা ঘর ছাড়ল। মা ওকে আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চাইলেন। হাতছাড়া করলেন না শেষ পর্যন্ত। জ্ঞান হারাবার আগ মুহূর্তেও আহমদের হাত ছিল মায়ের হাতের মুঠোয়। সেই মা কখন চলে গেল? কখন?
দুঃসহ যন্ত্রণায় আহমদের কলেজেটা ছিঁড়ে যেতে চাইছে।
– মা মাগো! আমার পা নাকি ওরা কেটে ফেলবে। আমি পঙ্গু হয়ে গেলে আমাকে কে দেখবে বলো মা? ...'
আহমদের বোজা চোখের কোল বেয়ে নেমে এলো তপ্ত অশ্রুর ধারা। সেই অশ্রু পরম মমতায় মুছিয়ে দিতে দিতে জামাল বলল,
– 'সাহস রাখ বেটা। ভেঙে পড় না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। আমার কথা ভাব। আমার একমাত্র মেয়েটা মরে গেল গত সপ্তাহের হামলায়। ওর স্বামীটাও গেল। সেই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। এর আগের যুদ্ধগুলোতে হারিয়েছি একের পর এক মা-বাবা, বউ বাচ্চা। ছিল একটা বেটি। আমার বুক জুড়ে। তাকেও উঠিয়ে নিলেন আল্লাহ পাক।'
জামালের কথায় আহমদের কান্না থামল না। বরং বেড়ে গেল। শব্দ করে কাঁদতে লাগল সে। ওকে থামাতে জামাল ক্রমাগত কোশেশ করে গেল। দুষ্টুমি করে বলল, 'বুড়ো খোকা। কাল রাতে আপনি যে বিছানা ভিজিয়েছিলেন– তা কি জানেন? কত কষ্ট করে আপনার বিছানা পাল্টাতে হয়েছে এই আমাকে– কিছুই টের পাননি?'
আহমদের ফোঁপানিটা কমল। অবাক চোখে সে চাইল সে জামালের দিকে। তেরো



www.pathagar.org

বছরের বুড়ো ছেলে সে কি করে বিছানা ভেজায় ভেবে পেল না।'
জামালের চোখে কৌতুক। 'হুঁ হুঁ। ভুলটা আমাদেরই। তোমাকে আসলে তখন ক্যাথিটার দেয়া হয়নি। আমাদের স্টোরে অবশ্য বাড়তি ক্যাথিটার ছিল না। আজ হাসপাতাল খালি হতে একটা এনে লাগিয়ে দিয়েছি। এখন স্যালাইনের পানি নিশ্চিন্তে ঢালতে পারবে। বিছানা ভিজবে না।'
আহমদ লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল! ছি! জ্ঞান হবার পর থেকে সে বিছানায় পেশাব করেনি। আর এখন এমনই অসাড়-অথর্ব হয়ে গেল সে! কখন কি হয় টেরও পায় না?'
– 'তবে খুব ওজনদার ছেলে তুমি। মা খুব ভাল ভাল খাওয়াতেন বুঝা যাচ্ছে। তোমায় তুলতে আমার মত জোয়ানের বারোটা প্রায় বেজে যাচ্ছিল আর কি?'
আহমদ চোখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, 'আর কেউ ছিল না আঙ্কেল?'
'আর কেউ? নাহ্। বম্বিংয়ের ভয়ে অ্যাটেনড্যান্টরা সব পালিয়েছে। মরেও গেছে কেউ কেউ। নিখোঁজ অনেকে। এখন সর্বসাকুল্যে দুই ডক্টর আর আমরা কয়েকজন নার্স। ঝাড়ুদারের কাজ থেকে সার্জারি সব নিজেদেরকে করতে হচ্ছে।'
জামাল হাসল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল,
– 'আমাকে যে একটু নিচে যেতে হচ্ছে আহমদ! কি পরিমাণ পেশেন্ট এসেছে দেখে আসি। বাতিফাতির ব্যবস্থা করি। ওটিতে যেতে হতে পারে। কি তুমি ভয় পাবে একা একা?'
আহমদ মাথা নাড়ল– ভয় পাবে না।
– 'এই তো বাপের বেটা। মুজাহিদের বাচ্চা। একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর কেমন? তোমাদের জন্য স্যুপ আনা যায় কি-না দেখি।'
উঠে দাঁড়ানোর আগে জামাল দু'হাতে চেপে ধরল আহমদের মাথাটা বুকের সাথে। কপালে চুমু খেতে খেতে বললো।
– 'ঘাবড়াসনে বেটা! আমি তো আছি! তোর কেউ নেই। আমরাও নেই। তুই আজ থেকে আমার ছেলে। আমি যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ তোর দায়িত্ব আমার। তোর জন্য আমি রক্ত জোগাড় করব। ঔষধ জোগাড় করব। তোর পায়ের চিকিৎসা হবে ইনশাআল্লাহ।'
রাতে আহমদের ভাল ঘুম হলো। সে স্বপ্ন দেখল, একটা প্রকান্ড মাঠের মধ্যে বসে আছে একাকী। তার দু'টি পা থেঁতলানো, ঝলসানো। সেখানে থেকে বহু রক্ত ঝড়ছে অবিরাম। সে পা নাড়াতে পারছে না। উঠে দাঁড়াতে পারছে না। পেটে তীব্র ক্ষুধা। সে চেঁচিয়ে ডাকছে কাউকে। কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না।
এক সময় একটু দূরে ভেসে উঠলো অনেকগুলো মুখ। ছোট্ট ছোট্ট শিশুর মুখ। অনেক রঙের অনেক চেহারার। বিচিত্র বেশভূষার। ওদের হাতে আবার ছোট ছোট পতাকা। তাতে বোঝা যাচ্ছে কে কোনো দেশের। আহমদ ওদেরকে ডেকে বলল,
'এই দ্যাখ আমার অবস্থা। মার্কিনি নরপিশাচরা কি দশা করেছে? আমার মাকেও ওরা মেরে ফেলেছে। আমার এখন এই পৃথিবীতে কেউ নেই। জামাল আঙ্কেল ছাড়া। কিন্তু



www.pathagar.org

সে-ও বড্ড অসহায়। ডাক্তাররা বলেছে আমার জরুরি অপারেশন না হলে আমি বাঁচব না। অথচ আমাদের হাসপাতলে ওষুধ নেই, রক্ত নেই, পণ্য নেই, কিচ্ছু নেই। তোমরা কেউ আসবে আমাকে একটু সাহায্য করতে? এক ফোঁটা রক্ত দেবে কেউ আমাকে? একটু ওষুধ, একমুঠো খাবার? কেউ দেবে?'

কিন্তু, শিশুরা নতমুখ। আহমদের আবেদনে কেউ জবাব দিচ্ছে না। হয়তো ভরসা পাচ্ছে না। হয়তো শক্তিধর জালেমদের ভয়ে ওরা ভীত। আহমদ ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেল। তার পায়ের যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হল। এতগুলো শিশু মুখের সামনে সে কাঁদতে লাগল অসহায়ের মত, পর্যুদস্তের মত। কিন্তু, একটি কোণ থেকে অবশেষে সাড়া মিলল।

– 'আমরা আছি আহমদ! আমরা আছি তোমার জন্য। আল্লাহর দোহাই আমহদ ভয় পেয়ো না। আমরা সাহায্য নিয়ে চলে আসব তোমার পাশে। অপেক্ষা কর আহমদ! অপেক্ষা কর।'

আহমদ মুখ তুলে দলটিকে দেখল। সবার সামনের ছোট্ট শিশুটির হাতে সবুজ পতাকা। পতাকার মাঝে গোল লাল বৃত্ত। বুকে সাহস আর চোখে আগ্রহ নিয়ে দলটি তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

আহমদ শুধালো, 'তোমরা কারা?'

ওরা সংগ্রহে বলল, 'আমরা বাংলাদেশী শিশু-কিশোর। আমরা তোমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত।' পতাকা যার হাতে, সেই খুদে শিশুটি সুরেলা কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'হুঁ– আমাদের আব্বু আম্মু আর বড়রা আমাদেরকে যে ঈদি দিয়েছে সেগুলো জমিয়ে আমরা একটা ফান্ড করে ফেলেছি। ঈদের যে দু'তিন সেট জামা পেয়েছি সেখান থেকেও কিছু কিছু তুলে রেখেছি তোমার আর তোমার বন্ধুদের জন্য।'

ভারি মিষ্টি শোনাল ওর কথাগুলো। আহমদের খুব ভাল লাগল। ইচ্ছে হল, দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়। কিন্তু, ওর পা যে ...।'

অন্য একটি ছেলে বললো, 'আমরা স্কুল থেকে টাকা তুলব। বড়দের কাছ থেকেও সাহায্য নেব তোমাদের কথা বলে। কোনো দুশ্চিন্তা কর না কেমন? তোমার চিকিৎসা হবে। তোমার পা ভাল হয়ে যাবে দেখ।' দেখতে দেখতে অন্য দেশের শিশুরাও চলে এলো বাংলাদেশী শিশুদের পেছনে। ওরাও চেঁচিয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে লাগল আহমদকে।

সবুজ লালে মেশানে একটি পতাকাকে সামনে রেখে এক ঝাঁক শিশু ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো আহমদের দিকে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে। আনন্দে, গর্বে, উচ্ছ্বাসে, আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে গেল আহমদের স্বপ্ন আহমদের সময়।

ডিসেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# মৌমাছি মুক্তিযোদ্ধা ও অস্ত্র

লুৎফুল খবীর

www.pathagar.org

গ্রামে খাকি পোশাকের সৈন্য দেখা গেছে। খাকি পোশাক মানেই পাকসেনা। কে দেখেছে কেউ বলতে পারছে না। কোথায় দেখেছে তাও বলতে পারছে না। তবে গ্রামে সৈন্য এসেছে এটা সত্য বলেই ধরে নিয়েছে সবাই। সবার চোখে মুখে আশঙ্কার ছাপ। কেউ বলছে মানু মাস্টার সৈন্য দেখছে। কেউ বলছে জেবু মিয়ার সামনে পড়েছিল, কেউ বলছে, খন্দকার বাড়ির জাহিদ মিয়া অল্পের জন্য ধরা পড়ে নাই। কিন্তু কোথায় গেল সৈন্য? কোনো ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে আছে? হঠাৎ হামলে পড়বে নাতো? অন্তুর বুক ভয়ে টিপ টিপ করছে। কিন্তু সৈন্যদের দেখতে প্রচন্ড ইচ্ছে হচ্ছে তার। কিভাবে তা সম্ভব? ওদের হাতে নাকি স্টেনগান থাকে। দেখলেই ঠুস। ভয়ে গা ছমছম করে উঠে অন্তুর। বাড়ির পেছনের কাউগাছের ওপর থেকে ফালগুন করা গ্রামটা দেখা যায়। অন্তু কাউগাছে উঠেছে। উপরে আরো উপরে। এক সময় মগডালটায় উঠে বসলো সে। একটা কাউফল ভেঙে, দুটো কোষ মুখে পুরলো। তারপর আদিগন্তে দু'চোখ ছড়িয়ে দিল অন্তু। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তাহের চৌধুরীর বাড়ি। বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে সে বোধ হয় হাসেম চৌধুরী। স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না। উত্তরে সিরাজ উকিলের বাড়িও দেখা যায়। সেখানে মানুষের জটলা। কোথায় পাক সেনা? তবে কি খবরটা ভুয়া? কত কষ্ট করে এই কাউগাছে উঠা। বুকে কত আঁচড় পড়েছে। পেট ভরে মিষ্টি কাউ খেয়ে তা পুষিয়ে নিতে হবে। কিন্তু মায়ের ডাকাডাকিতে তা আর হয়ে উঠল না। গাছ থেকে নেমে এল অন্তু। আহা কি আরাম! গাছ বেয়ে উঠা যত কষ্টের, নামটা ঠিক ততই আনন্দের। গাছের গা বেয়ে ঝিরঝির করে নেমে আসে অন্তু। তারপর ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াবে এমন সময় হুঙ্কার দিয়ে উঠে কেউ বললো,

: তোমলোক কোন হ্যায়?

পাক সেনাদের দেখে ভড়কে গেল অন্তু। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়? সৈন্যদের এখানে দেখে অন্তুর যত না ভয়, রাগ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি। বাড়ির পেছনের বাগানে আসবে কেন সৈন্যরা?

গোঁফওয়ালা সৈন্যটা আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,

: বাতাও, তুম কোন হ্যায়?

: তোমকো বোন জামাই হ্যায় ...

রাগের বশে কথাটা মুখ ফসকে বের হলো অন্তুর। পাকসেনা বলল,

: বোন জামাই, ক্যায়া হ্যায়? বোন জামাই? এতক্ষণে ভয়ে কাঁপছিল অন্তু। যখন বুঝল সৈন্যরা তার তিরস্কার বুঝেনি তখন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মুচকি হেসে অন্তু বলল : বোন জামাই মানে দুলাভাই হ্যায়, দুলাভাই মানে সাচ্চা পাকিস্তানি হ্যায়।

অন্তুর কচি মুখে সাচ্চা পাকিস্তানি শব্দ শুনে সৈন্যরা দারুণ পুলকিত হল। তারা অন্তুর পিঠ চাপড়ে বললো,



www.pathagar.org

: তুম আচ্ছা লাড়কা হ্যায়।
: ঠিক বলেছ, ছাগলের বাচ্চা, মৃদু হেসে বলল অন্তু।
: ছাগলের বাচ্চা ক্যায় হ্যায়?
: ছাগল মানে দুশমন কো খতম করলিয়ে, জো আদমি পেরেশন হ্যায়, পাগল হ্যায়।
: বহুত আচ্ছা বাত হ্যায়। তুমভি হামকো ছোট্টা দোস্ত হ্যায়।
হঠাৎ অন্তুর চোখ পড়লো। তার মুজিব মামা এদিকে আসছেন। মামা এখনো সৈন্যদের খেয়াল করেননি। পাকসেনা কামান্ডার মামার দিকে কটমট করে তাকিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে। মামা কাজী মুজিবুর রহমান প্রফেসর মানুষ। উদাসভাবে হাঁটছেন। যেন কবি কবি ভাব ছন্দের অভাব।
সৈন্যদের হল্ট ধ্বনিতে তিনি থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।
: তোম কোন হ্যায়? মুক্তি হ্যায়?
মামা উর্দু জানেন, না, তাই ঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। শুধু ঘামছেন। বিড়বিড় করে যেন কিছু বলছেন, বুঝা যাচ্ছে না। মামা এখনও অন্তুকে খেয়াল করেনি। তার ভয়ার্ত দৃষ্টি সৈন্যদের দিকে।
গোঁফওয়ালা সৈন্যটা আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।
: বাতাও ক্যায়া নাম হ্যায়! তেমনি ভয়ে ভয়ে মামা বললেন,
: মুজিব, মুজিব কাজী মুজিব রহমান হ্যায়।
: মুচি? মুচি? কাজই মুচি ক্যায়া নাম হ্যায় তুমভি হিন্দু আওর শেখ হ্যায়, কোন হ্যায়?
মামা যেন শরীরের সমস্ত শক্তি মুখে ঠেসে ধরে উচ্চ কণ্ঠে বললেন,
: শেখ হ্যায়, শেখ মুজিবুর রহমান হ্যায়, হাম শেখ হ্যায়। মামার কণ্ঠ শুনে প্রায় সব সৈন্য একযোগে চেঁচিয়ে উঠল।
: তুমভি শেখ মুজিবুর রহমান হ্যায়!
গোঁফওয়ালা কমান্ডার হুঙ্কার ঝাড়লো উচকো কো পাকড়াও।
সৈন্যরা ঘিরে ধরল মামার চারপাশ। একজন তার হাত বাঁধতে এগিয়ে এল। একজন চোখ বাঁধতে উদ্যত। মামা হাঁফাচ্ছেন। এতক্ষণে অবশ্য মামা অন্তুকে লক্ষ্য করল। তার কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে। অন্তু বুঝতে পারলো মামাকে তো 'নামে নামে যমে টেনেছে' কিছু একটা তো করতে হবে। কী করা যায়? মামা অসহায় দৃষ্টিতে অন্তুর দিকে তাকিয়ে আছেন। অন্তু তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ মেরে অভয় দিতে চাইল। মামা চোখের ভাষা বুঝলো কি না অন্তু বুঝে উঠতে পারলো না।
হঠাৎ অন্তুর মাথায় বুদ্ধি এসে টোকা দিল যেন। অন্তু আকাশ ফাটা চিৎকার জুড়ে দিল।
: মুক্তি হ্যায় মুক্তি। মুক্তি বাহিনী হ্যায়।
সৈন্যরা ভীত কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উর্দুতে যা বলল বাংলাতে তার অর্থ দাঁড়ায় :



www.pathagar.org

: মুক্তি বাহিনী কোথায়? কই মুক্তি, দেখিয়ে দাও।

অন্তু তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতে সামনের গাছের মোটাডালের বিশাল মৌচাকটি দেখিয়ে বললো,

: হারমিকা বাচ্চা মুক্তি হ্যায়। উচকো পাকড় লও।

মুক্তিবাহিনী বাগে পাওয়ার আনন্দে সৈন্যরা লাফিয়ে উঠল। মৌচাকের দিকে তাকিয়ে গালি দিতে দিতে সৈন্যদের গোঁফওয়ালা কমান্ডার এগিয়ে গেল অন্তুর দেখানো মৌচাকের দিকে।

অন্তু লক্ষ্য করলো, মামা নেই। নিশ্চয়ই সুযোগ বুঝে পালিয়েছে। সেও এই ফাঁকে জঙ্গলে ঢুকে দেয় ভোঁ দৌড়। কতদূর গিয়ে অন্তু লক্ষ্য করল সৈন্যরা মৌচাকের তলায় ছটফট করছে। তাদের সারা শরীরে জেঁকে ধরে কামড়াচ্ছে মৌমাছিগুলো।

অস্ত্রগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, সৈন্যরা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর বলছে, বাপরে বাপ ইয়ে ক্যায়সা মুক্তি হ্যায় বাবা! মুক্তিবাহিনী হামকো মাফ কর দো!

ডিসেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# পিটি স্যারের ধোলাই

মহিউদ্দিন আকবর

www.pathagar.org

আমার কথাই বলি। এবার জুনিয়র বৃত্তি পাওয়ায় আব্বা- আম্মু তো বাদই দিলাম, স্কুলের স্যার এবং পাড়ার সব বন্ধুর কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছি। কিন্তু প্রিয় হতে পারিনি কেবল পিটি স্যারের। স্যার যেন আমার দিকে কেমন কেমন করে তাকান। আর কেবলই ধোলাইর কথা বলেন। তাই পিটি স্যারকে আমার একটুও ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, স্যার আমাকে মোটেও পছন্দ করেন না। একটু একা একা থাকলেই স্যারের রয়েল বেঙ্গল টাইগার মার্কা চেহারাটা আমার মনের মাঝে ভেসে ওঠে। ইস কি রাগারাগি চেহারারে বাবা! তার ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো তো সব সময় রক্ত লাল হয়েই থাকে। তাছাড়া স্যারে গোঁফজোড়াও গা শিরশির করার মতো। মনে হয় যেন জেনালের এমএজি ওসমানী। আমার আব্বার বস জেনারেল ওসমানী সাহেবকে তবুও মানাতো। তিনি যে সেনাপতি ছিলেন। শুধু কি তাই? তিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বাধিনায়ক পরে হলেন সেনাপ্রধান। তার মানে, সৈনিকদের বড় নেতা। লাখ লাখ সৈন্যকে শাসন করতে হলে অমন রাগারাগি চেহারার ভাব লাগে বৈকি! আর তাকে গোঁফজোড়াতে মানাতোও ভালো। কিন্তু পিটি স্যারতো তার মত আর অতবড় কেউ নন। তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যও নন। তা ছাড়া পিটি স্যার কম পক্ষে পুলিশ হলেও একটা কথা ছিলো। চোর ও ডাকাত আর দুষ্ট লোকদের ভয় দেখানোর জন্য ওদের গোঁফজাড়াও নাকি একটা অস্ত্রের মতো কাজ করে। না হয় মানলাম, আমাদের মানে ছাত্রদের ভয় দেখানোর জন্য স্যারেরও একজোড়া গোঁফ থাকা চাই। কিন্তু আমরা তো চোর অথবা ডাকাত নই। সবাই তো ভদ্রলোকের ছেলে পুলে। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে– আমরা দুষ্টুমি করলে স্যার আমাদের গোঁফ দেখিয়ে শাসন করতে চান। তাও যদি হয়, তিনি আমার সাথে অমন হাবভাব করেন কেন? দুষ্টুমি কি আমি একাই করি? বরং ছাত্র হিসেবে তো আমাকে সবাই ভালোই জানে। আর সব স্যারেরাও। আমিও জানি, আমার চেয়ে মেধাবী ছাত্র আমাদের ক্লাসে নেই। এবারও তো এইট থেকে ফার্স্ট হয়ে নাইনে উঠলাম। তাহলে? কেন পিটি স্যার অমন করেন? এমনি আরো হাজার কথা মনের আকাশে পেজা পেজা মেঘ হয়ে, ভেসে ভেসে যায়। কিন্তু এ সবের কিছুই প্রকাশ করতে পারি না, বলতে পারি না কারোর কাছে। বড় ভাইয়াকে যে বলবো, তাও সাহস হয় না। ভাইয়াটা যে কেমন! কোনো কথারই দাম দিতে চান না। ওইতো সেবার ব্যাডমিন্টন খেলা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল বিজুদের সাথে। বলা নেই কওয়া নেই, বিজুই গায়ে পড়ে বাধিয়ে দিলো ঝগড়াটা। আবার হুমকিও দিয়েছিল আচ্ছা করে ঠ্যাঙাবে বলে। মাঠে বসে অবশ্য বিজুকে কিছুই বলিনি। মনে মনে ভেবেছিলাম, ভাইয়াকে বলে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করবো। কিন্তু ওই ভাইয়াটাই কিনা শেষে আমার ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিলেন। আমি তো সেদিন ভাইয়ার কাছে বেশ রয়ে সয়েই কথাটা বলেছিলাম–

– জানো ভাইয়া, বিজুনা শুধু শুধুই আমাদের খেলাটা বন্ধ করে দিলো। কত কষ্ট করে আমরা ব্যাডমিন্টনের কোর্টটা কাটলাম। আর উনি দিলেন খেলা বন্ধ করে।



www.pathagar.org

– কোটটা নিশ্চয়ই বিজুদের ছোট মাঠটায় কেটেছিলি?
– তাতো কেটেছি কিন্তু ও-ই আমাদের বললো, ওদের মাঠে কোট কাটলি নাকি কেউ কিছু বলবে না।
– তা আজ আবার কি হলো?
– বিকেল বেলা আমরা যেই না নেট টানিয়েছি, অমনি বিজু আর ওর বড় ভাই এসে হ্যাঁচকা টানে নেটটা খুল ফেলে দিলো। আর কি বললো, জানো?
– তা আমি জানবো কেমন করে?
– বললো, ওই কোটে যদি আমরা ফের খেলতে যাই, তাহলে আচ্ছা করে ঠ্যাঙানি লাগাবে।
: ওদের জায়গায় জোর করে খেলতে গেলে শুধু ঠ্যাঙানি কেন? দরকার হলে পরে চ্যাংদোলা করে বেঁধে রাখবে। আরে আমি হলো তো তাই করতাম। বুঝলিরে গাধা?
– কিন্তু বিজুই তো আমাদের দিয়ে কোর্টটা কাটালো!
– ভালোই তো করেছে। তোমাদেরকে খাটিয়ে নিয়েছে। এখন মজা করে ওর ভাইদের নিয়ে খেলবে।
– তুমি কি ভেবেছো আমারাও ছেড়ে দিবো?
– তাহলে আর আমাকে বলতে এসেছিল কেন? যা যা, মারপিট করগে যা। আমি আর ভাইয়ার হেঁয়ালির মত কথাগুলো হজম করতে পারি না। রাগে গজ গজ করতে থাকি।
– ইস তুমি যে কী! আমি, মুন্না লতিফ আর বাচ্চু মিলে সারাটা দিন খেটেখুটে কোর্টটা বানালাম, তার বুঝি কোন দাম নেই?
– খাটুনির দামতো থাকতেই হবে।
– তাহলে বিজু যে উল্টো ঠ্যাঙানির কথা বলে দিলো?
– ও তো একটা ছোট লোক, ওর মুখে যা মানায় তাই বলেছে।
এবার ভাইয়ার কথায় আমার মনে কেমন এটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সন্দেহটা আর বুকে চেপে রাখতে পারি ন। তাই বলে ফেলি–
– তুমি যে কি বলো না ভাইয়া! বিজুদের চারতলা বাড়ি, দুটো হোসিয়ারি, তিন চারটে গাড়ি, দুটো স্টেশনারি, একটা বেকারি। তারপরও ওরা ছোট লোক হলো কেমন করে?
– সে তুই বুঝবিনে হাদারাম চ-।
– কেন বুঝবো না? আমি কি এখনো ফিডার খাই?
– আরে হাবা চরণ দেবুনাথ, রাশি রাশি টাকা আর ধনসম্পদ থাকলেই তো বড়লোক হওয়া যায় না। বড়জোর ধনীলোক হওয়া যা। বড়লোক হতে হলে বড় কাজ করা চাই, বড় মনের মানুষ হওয়া চাই। যে মনের মাঝে থাকবে না হিংসা, নিষ্ঠুরতা, থাকবে না মানুষকে ঠকানোর ভাবনা, আর থাকবে না মানুষের প্রতি অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা। এই ধর না আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথা। তার তো তেমন কাড়ি কাড়ি টাকা পয়সা অথবা গাড়ি বাড়ি, জমিদারি কিছুই ছিলো না। কিন্তু তার মনটা ছিলো


www.pathagar.org

আকাশের মতো উদার। মানুষের প্রতি ভালোবাসার কমতি ছিলো না। আর দেশ ও জাতির জন্য কাবি নজরুলের অবদানের কথা কে অস্বীকার করবে? সারাটি বিশ্বই যেন তার আপন ছিলো। সে জন্য তার সম্মানও দুনিয়া জোড়া। অথচ ওই যে বিজুর বাবা, তার নামও তো নজরুল ইসলাম লস্কর। এতো যে টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি তবু তার লোকের শেষ নেই। এইতো গত বছরও বেকারিতে ভেজাল রুটি বিস্কুট বানানোর দায়ে ছয় মাস জেলের ঘানিও টেনে এলো। ক'দিন আগেও তার দোকানে ফেনসিডিল রাখা অপরাধে পুলিশের কি প্যাদানিটা না খেলো। পুলিশ তার চুলের মুঠি ধরে, ম্যানহোল থেকে তাকে যখন টেনহিঁচড়ে শত শত মানুষের সামনে বের করে আনলো এবং হাতে হাতকড়া লাগিয়ে পুলিশভ্যানে তুলে নিলো, তখন তো আমরাই বোকা বনে গেছি।

– কেন, কেন? তোমরা বোকা বনে গেলে কেন?

– আরে, আমরা বোকা বনে যাবো না! আমরা তো জানতাম তার এমন সুন্দর সাজানো গোছানো জেনারেল স্টেশনারিতে কেবল মানুষের কাজে লাগে এমন সব জিনিসই বিক্রি হয়। কিন্তু সে যে মানুষ মারার, মানুষকে ধ্বংস করার জন্য খারাপ সব জিনিসই বিক্রি করে, আর পুলিশ বিডিআরের চোখ ফাঁকি দিতে ওই সব ইয়ে ভর্তি দুর্গন্ধময় ম্যানহোলে গিয়ে পালাতে পারে তা কি কখনো কেউ ভাবতে পেরেছিলাম? আরে পুলিশ টুলিশ তো দূরেই থাক, আমাদের আব্বাকে একটা টাকার গোডাউনও যদি কেউ পুরস্কার দেয় তবুও কি আব্বা ওই ইয়ে ভর্তি বিষাক্ত ম্যানহোলে একটি বারের জন্য নামতে যাবেন? আর যারা আরো বড়লোক, তাদের কথা না হয় না-ই টানলাম। আচ্ছা এবার তুই ভেবে দেখ, আমাদের আব্বা অথবা আমাদর জ্ঞানী গুণীজন কিংবা সহজ সরল সত্যবাদী কেরানি চাচা বাকের সাহেব, তারাই বড়– না মিথ্যাবাদী, সুদখোর, ঘুষখোর, চোরাকারবারি, ধনী লোকেরাই বড়? আচ্ছা নামের কথাই বলি একটু ভেবে দেখতো ও ব্যাটা নজরুল লস্কর কি বড়লোক, নাকি কবি নজরুলই আসলে বড়লোক? আরে! যে বা যারা মিথ্যা বলে, অপরাধ করে লোককে ঠকায়, দেশকে ভালোবাসে না, দেশের জন্য, জাতির জন্য যাদের প্রাণ কাঁদেনা– তারাই তো আদতে জাত ছোটলোক। তাদের বস্তা বস্তা টাকা থাকলেই কি? আর ডজন ডজন বাড়ি গাড়ি থাকলেই বা কি? এরা কখনোই বড়লোক হতে পরে না। উদার হতে পার না। এমনকি মানুষও হতে পারে না।

– বুঝেছি ভাইয়া বুঝেছি, তোমার ভাষণ শুনে মনে হচ্ছে বিজুরা আসলেই ছোটলোক।

– অতএব, ওদের সাথে বাড়াবাড়ি করতে যাসনে।

– কিন্তু ওরা যদি যেচে পড়ে লাগতে আসে?

– এড়িয়ে চলবি।

– যদি হামলে পড়ে লেগেই যায়?

– কোনোভাবে গা বাঁচিয়ে চলে আসবি, না হলে সহ্য করবি।

– একদম মুখ বুজে?



www.pathagar.org

– তা কেন? মুখ ফুটে সাহস করে প্রতিবাদটা জানিয়ে তবেই কেটে পড়বি।
এবার আর কি বলবো ভাইয়াকে? ভাইয়ার কথায় বিজুদের সাথে ফুল ফাইটিং করার উৎসাহটা হারিয়েই অগত্যা তার কাছ থেকে সটকে পড়ি। সেই ভাইয়ার কাছেই কি না আবার যাবো পিটি স্যারের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আলাপ করতে। মনের থেকে সায় পাচ্ছি না। সুতরাং নিজে নিজেই একটা বিহিত ব্যবস্থা করবো ভেবে ভাইয়ার পড়ার রুমের একেবারে দরজায় এসেও আবার ফিরে চলি। তারপর স্কুলে পড়া তৈরি করে, একটু আগে বাগেই ঘুমুতে গেলাম। কিন্তু আমার মনে একই চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো। ভেবেই পাচ্ছি না কেন যে পিটি স্যার আমার ওপর খুশি হতে পারছেন না? এমনি ভাবনায় আমার চোখ জুড়ে আর ঘুম জেঁকে বসতে পারে না। মনের আয়নায় দেখতে পেলাম, শুধু আমার ওপরই নয়– আবিদ, অলিদ, তাহের, নাঈম আর সুজনকেও পিটি স্যার প্রায়ই পিটুনি লাগান। তাই রোববারটা ওদের কাছেও ভীষণ ভয়ের দিন বলে মনে হয়। কেননা, রোববারই যে আমাদের ড্রিল ক্লাস। খেলতে গিয়ে একটু ভুল করলেই হলো। আর রক্ষা নেই। গুনে গুনে দশটা করে বেতের ঘা খেতেই হবে। এতে ভালো ছাত্র কিংবা ক্লাস ক্যাপ্টেন হলেও রেহাই নেই। পিটি স্যারের ক্লাসে যে ভালো করবে, তার মতে সে-ই হচ্ছে বেস্টবয়। যদি সে গুবরে গনেশ মার্কা ছাত্রও হয়। তবুও সে বেস্টবয়! এ ব্যাপারটি অবশ্য দুই মাস আগেও বুঝতে পারিনি। কিন্তু ঘুম পালিয়ে গিয়ে আমার সামনে পিটি স্যারে মারের কারণ হিসেবে এ ব্যাপারটাই এতক্ষণে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যায়। আমার আর ভাবনাতে কিছু কুলোয় না। এক সময় নিজের অজান্তে ঘুমের বাদশাহ হয়ে যাই।
একটি ঘুমেই রাত কাবার।
সকালে আব্বার ডাকে ঘুম পালাতেই, অজু সেরে তার সাথেই ছুটে চলি ফজর জামায়াত ধরতে। তারপর পড়ার টেবিলে মুখোমুখি হই ক্লাস রুটিনের। আজ রোববার। শেষ পিরিয়ডে ড্রিল ক্লাস। মাথাটা কেমন চড়াৎ করে ওঠে। একবার ভাবি মাথাব্যথা অথবা পেটব্যথার কথা বলে সপ্তম ঘণ্টায় স্কুল পালাবো। কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? মিথ্যে বলায় শুধু শুধু পাপের বোঝাই বাড়বে। তাছাড়া মিথ্যার আশ্রয় নেয়া আর চরিত্রটা ধ্বংস করা যে একই কথা। জ্ঞান অর্জন করতে এসে চরিত্রটাই যদি গড়তে না পারি, তাহলে আর লেখাপড়া শিখে লাভ কি? বরং মিথ্যাকে যত বেশি দূরে রাখা যায়, ততোই তো লাভ আর লাভ। অবশ্য এ কথাগুলোও পিটি স্যারের কথা। একদিন ড্রিল ক্লাস চালাতে গিয়ে স্যারই বলেছিলেন এই অমূল্য কথামালা। তাই পিটি স্যারকে কেমন করে যে জয় করা যায়- এখন সেটাই ভাবতে হচ্ছে। আর এ কথা ভাবতে ভাবতেই আমার মাথায় হুট করে একটা বুদ্ধি খেলে যায়। তাই আর দেরি না করে, আম্মুকে তাড়া লাগিয়ে চটপট নাস্তাটা সেরে, ঝটপট বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। একে একে আবিদ, ওলিদ, তাহের এবং নাঈমকেও জুটিয়ে নিয়ে এক দফা পরামর্শ করলাম। তারপর সোজা চলে এলাম স্কুলের মাঠে। এতোটা সকালে আমাদেরকে কেউ স্কুলের



www.pathagar.org

মাঠে জট পাকাতে দেখলে অবাকই হবেন। হয় যদি হোক না অবাক, তাতে আজ আর কি আসে-যায়? আজ আমাদের জীবন-মরণ পণ, পিটি স্যারের ধোলাই থেকে আজ আমাদের বাঁচতেই হবে। তাই আজ আর ফিরবো না পিছু, আসুক যতোই নিন্দা ঝড়। সুতরাং আর থেমে থাকা নয়। শুরু হয়ে গেল অভিযান। পাঁচজনা মিলে কুড়িয়ে নিলাম পঁচিশ রকম ঠুনকো জিনিস। তারপর খাতা থেকে পাত ছিঁড়ে টুকরো বানালাম পঁচিশটি। আর সেগুলোর সব ক'টিতেই লিখে ফেললাম কুড়নো সব ঠুনকো জিনিসের নাম। এ কাজটুকু শেষ হলে পর পাঁচজন সময় মতো হাজির হলাম ক্লাস রুমে। সবারই মনের মাঝে চঞ্চলতার গোল্লাছুট।

চোখে মুখে কেমন একটু দুষ্টুমিও খেলে যাচ্ছে। শুধু কি তাই? থিরিথিরি একটা ভয়ের দোলাও দুলছে মনের ভেতরটাতে। কিন্তু আমরা যে আজ বেপরোয়া। যা হবার হোকগে শেষে, আগে তো একটা ঘটনা ঘটিয়ে নিই। ক্লাস শুরু হতে এখনো অনেক সময় বাকি। তাই আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা নয়। ঝটপট নেমে পড়লাম কাজের কাজে। ক্লাস ক্যাপ্টেন হিসেবে আমাদের শাখার ক্লাসসুদ্ধ এক সাথে করে, সবাইকে জানিয়ে দিলাম আমাদের সেই প্লানটাকে এবং সবার হতে গুছিয়ে দিলাম একটা করে টুকরো স্লিপ। ভাগ্যিস মাথা গুনে দেখলাম আমরা পঁচিশ, স্লিপও পঁচিশ। যেন সোনায় সোহাগা। তাই ঠুনকো জিনিসগুলোর নাম লেখা স্লিপের কমতিও হলো না। আবার বাড়তিও হলো না। এ যেন প্রিপ্লানের প্রথম বিজয়! সে আনন্দের উত্তেজনায় বুকের ভেতর একটা শিহরণ যেন ঢেউ খেলে গেলো। মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। কৃতজ্ঞচিত্তে চুপিসারে পড়ে নিলাম– আলহামদুলিল্লাহ। তারপর সহপাঠীদের দিকে ডান হাতটা উঁচিয়ে ধরে বললাম, তোমরাও ডান হাত ওপরে তুলে শপথ করো। একবার বলো, মারের তোড়ে পিঠের ছাল উঠে গেলেও কেউ বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না। বাঁচতে হয় এক সাথে বাঁচবো, মার খেতে হয় এক সাথে মারা খাবো। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন

আমার সাথে সাথে সবাই ডান হাতে তুলে বললো, আমিন। আমি বললাম, এবার তোমরা স্লিপে যে লেখা আছে, হুবহু তা যার যার রাফ খাতাতে তুলে নিয়ে স্লিপটা ছিঁড়ে ফেলে দাও। ব্যাস পরীক্ষা শুরুর মতো শুরু হয়ে গেল কাজ। আমিও ওদের অনুসরণ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ শেষ। অমনি ঢং ঢং শব্দ করে ক্লাস শুরুর ঘন্টা ধ্বনিত হলো। আমরাও কুচকাওয়াজ সেরে এসে সুবোধ ছেলের মতো ক্লাসে বসে গেলাম।

দেখতে দেখতে চার চারটে পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলো। টিফিনের ঘন্টা পড়তেই আমরা পাঁচজনা ছুটলাম জামাল মিয়ার দোকানের দিকে। আর যেই না স্কুলের প্রধান ফটকটা পার হয়েছি, অমনি একটা ঢোলের মতো পেটের সাথে গুঁতো খেয়ে থেমে গেলো তাহের। তাই পড়িমরি করে পালিয়ে বাঁচতে চাইলো বেচারা। কিন্তু বাঁচতে চাইলেই কি আর বাঁচা যায়? শত হলেও পিটি স্যারের ভরা পেটটায় লাগিয়েছে গুঁতো। তা-ও যদি



www.pathagar.org

গুঁতোটা আস্তে লাগতো! টিচার্স রুমে ঢুকে অন্যান্য দিনের মতো পিটি স্যারের ঘুমটা যে আজ বরবাদ হয়ে গেলো! না জানি আজ স্যারের পেটে ট্রাবলই হয়ে যায়। তাহলে কি নিস্তার আছে কারো? স্কুলের সব ছাত্রই পিটি স্যারের এই ঘুমের খবরটা জানেন। তৃতীয় ঘণ্টায় ক্লাস সিক্সে একটা ক্লাস নিয়ে সেই যে স্যার স্টকে পড়েন- তারপর খেয়ে দেয়ে ঢোলের মত পেটটা ফুলিয়ে ফিরে আসেন টিফিনের ঘণ্টা পড়লে পরে। এবং এসেই টচার্স রুমে ঢুকে চার চারটে চেয়ার পাশাপাশি সাজিয়ে তৈরি করেন তক্তপোষ। আর তাতে কোনোমতে গা এলিয়ে সেই যে নাক ডাকতে শুরু করেন– তো, জাগতে জাগতে সপ্তম পিরিয়ড শেষ হয়ে যায়। অবশ্য গুনে গুনে সাতটা ঘণ্টা পড়তেই স্যারের নাক ডাকানো কর্পূরের মতো কোথায় যে হাওয়া হয়ে যায়, তা তিনি আর এক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। আর ঘুম থেকে উঠেই তার চিরাচরিত অভ্যাস মত বগলদাবা করে একটা কালো রঙের বেত নিয়ে চলে আসেন স্কুলের ঠিক মধ্য মাঠে। এসেই বাঁশি ফুঁকে ঘোষণা করেন ড্রিল ক্লাস শুরু। কিন্তু কোনো কারণে যদি তার ঘুমটায় এতটুকুন ডিস্টার্ব হলো তো, সেদিন আর কারো নিস্তার নেই। লাল টকটকে জবা ফুলের মতো চোখ দুটো এবং মাথা ভর্তি উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে ডান হাতে কালো বেতটাকে শক্তভাবে কষে ধরে হাজির হবেন মাঠে। তারপর কারণে অকারণে ছাত্রদের পিঠে বেত চালিয়ে শোধ মেটাবেন ঘুম বিনাশের। স্যারের পেটে গুঁতো খেয়ে তাহের তো সে ভয়েই চুপসে আছে। ও দিকে তাহেরের কান্ডে মহাবিপদ আঁচ করে আমরা শিউরে উঠতেই পিটি স্যারের খপ করে ওর একগুচ্ছ চুল খামছে ধরলেন। তারপর গগনবিদারি একটা ধমক লাগিয়ে বললেন, আয়, গরু, গুঁতোতে চাসতো গরুর পালে ভর্তি হয়। কতো গুঁতোতে পারিস তা ড্রিল ক্লাসে দেখবো।– কথা ক'টা বলেই স্যার হন হন করে এগিয়ে গেলেন টিচার্স রুমের দিকে। এইমাত্র বাঘের কবল থেকে রেহাই পাওয়া হরিণ শাবকের মত পড়িমরি দৌড়ে গিয়ে তাহের হাজির হলো স্কুলের পেছন দিকের আম বাগানে। আমরাও ছুটে এসে জড়ো হলাম ওকে ঘিরে। সবাই ভীষণ হাঁফিয়ে গেছি। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে তাহের বললো, নারে ভাই, স্কুল না পালালে আজ আর উপায় নেই। আজকে পিঠের ছাল থাকবে না। তোরা থাক, আমি চম্পট দেই। তাহেরের কথা শুনে আমিই ওকে সাহস জোগাই, কি যে আবোল তাবোল বকছিস! তাহলে সারাদিনের প্লানটাই তো মাটি হয়ে যাবে। তাছাড়া স্কুল পালালেই কি রেহাই পাবি? কাল যে তবে ডাবল সাজা কপালে জুটবে। তার চাইতে ক্লাস করাই ভালো। দেখে নিস, স্যার আসলে কিছু বলারই সুযোগ পাবেন না। আমার কথা শেষ না হতেই তাহের রীতিমতো প্রতিবাদ করে উঠলো ইস বললেই হলো? স্যারের কিন্তু সব কিছুই মনে থাকে। কেন, মনে নেই? গত সপ্তায় ইমুকে তিনি কি মারটাই না দিলেন। ওর কী দোষ ছিলো? টিচার্স রুম থেকে চক-ডাস্টার আনতে গিয়ে বেচারার হাত থেকে ফসকে গিয়ে ডাস্টরটা পড়েছিলো ফ্লোরে। আর তাতেই বাঘের মতো গড় গড় করতে করতে খপ করে ধরে ফেললেন ইমুর চুলের ঝুঁটি। তারপর কি কা-টা যে



www.pathagar.org

হলো, তাতো সবাই জানিস। আমার আর খেয়ে- দেয়ে কাজ নেই– তোদের কথায় ড্রিল ক্লাসে থাকি আর পিটি স্যারের ধোলাই খেয়ে মরি। তার চেয়ে বাবা কেটে পড়ি। এবারও তাহেরের কথায় আমি বরং দামে না গিয়ে ওকে আরো সাহস জোগালাম। বললাম–

– তুই বিশ্বাস কর, স্যার তোকে আজ কিচ্ছু বলার সুযোগই পাবেন না। আর যদি তুই পিটুনি খাস, তাহলে আমরাও যে তা থেকে বাদ যাবো– এমনটি ভাবিসনে।

– সে হয় কেমন করে? আমার জন্য তোরা খামোখা মা খাবি! কেন খাবি?

আমরা যে কেন মার খাবো, সে তো তুইও জানিস। তুই চলে গেলেও আজ যে আমরা পিটি স্যারের ধোলাই থেকে রেহাই পাবো– তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? এবার জনাব ভেবে দেখুন, আপনি প্রস্থান করে ভীতুর ডিম শিরোপাটি লাভ করবেন?

না কি বীরদর্পে আমাদের সাথে যুদ্ধে যাবেন?

আমার বলার ঢঙ দেখে তাহের ফিক করে হেসে ফেলে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে ধীর ধীরে দাঁত ঘষে ঘষে বলে ওঠে, আমাকেও যে থাকতেই হবে। তাহেরের দৃঢ়তায় আমরা ভীষণ খুশি হই। তারপর জামাল মিয়ার কনফেকশনারি থেকে টিফিন সেরে চলে আসি ক্লাসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লাস শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে তিন তিনটি পিরিয়ডও শেষ হয়ে গেলো। বেজে উঠলো সাত সাতটি ঘণ্টা। আর দফতরি বিষুনাথের প্রতিটি ঘণ্টা পেটানোর সাথে সাথে আমাদের ক্লাসসুদ্ধ সকলের বুকে একেকটা হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো। ঘণ্টার ধ্বনি থেমে গেলে আমরা সবাই জোট বেঁধে বেরিয়ে এলাম খেলার মাঠে। ওদিকে গোট্টাগাট্টা ছোট্ট হাতিটির মত দুলতে দুলতে পিটি স্যারও এগিয়ে এলেন। আর মধ্য মাঠে পৌঁছেই তিনি ঠিক সিনেমার ভিলেনের মতো ঘুরে দাঁড়ালেন আমাদের মুখোমুখি। তারপর খানিকটা সময় নিয়ে আমাদের মাথা থেকে পা অবধি রক্তজবার মতো টকটকে চোখে বার দুয়েক পরখ করে নিলেন। তারপর হুঙ্কার হয়ে উঠলেন, আজকে তোদের হাশর নাশর, বুঝেছিস!

স্যারের হুঙ্কারের আমাদের পিলেসুদ্ধ চমকে উঠলো। ভয়ের চোটে টাল খেয়ে তাহের রোবটের মতো ঘাড়টা ঘুরিয়ে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, তোদের পাল্লায় পড়ে আজ ধরাই খেলাম। দেখছিস না কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছেন। তার সব রাগ যে আমারই ওপর তা কিন্তু বুঝতে পারছি দোস্ত। ইস তার চেয়ে বরং পালালে ভালো করতামরে। আমাদের এই চরম সময়ে তাহেরের ভীতুপনা দেখে আমার মাথায় যেন জ্বালা ধরে যায়। তাই দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, ডোন্ট টক উল্লুক! স্যার হাশর নাশর বললেই হলো! আমরাও আজ পুলসিরাত পার না হয়ে যাচ্ছিনে।

পিটি স্যার তার কালো চকচকে বেতখানি উঁচিয়ে ধরে বললেন, এই গরুর দল, বলতো দেখি আজকের খেলা কোনটি ছিলো?

পিটি স্যারের প্রশ্ন শুনে আমরা যেন আকাশের চাঁদটাই হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম। তাই আর দেরি না করে চটপট বলে ফেলাম স্যার, আজকে তো স্যার কিমস গেম



www.pathagar.org

খেলার কথা। অন্য খেলা কি খেলাবেন স্যার?
অমনি স্যার ধমকে উঠলেন– অ্যাঁ, অন্য খেলা খেলবো কিনা? আমাকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে! একেবারে পেঁদিয়ে ছাল তুলে ফেলবো। এই হতভাগা হতচ্ছড়ার গোষ্ঠী! যা, এক মিনিটের মধ্যে খাতা নিয়ে আয়। এমনটির জন্য আমরাতো তৈরিই হয়েছিলাম। তাই স্যারের আদেশ শুনে এক দৌড়ে সব হুড়মুড় করে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলাম। তারপর যন্ত্র চালিতের মতোই যার যার রাফ খাতা নিয়ে একদমে পৌঁছে গেলাম মাঠে। স্যার তখন চুয়ান্না পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বলে সেকেন্ড গুনছেন আর তার কালো বেতটি দিয়ে নিজের ডান পায়ে একটা একটা করে বাড়ি লাগিয়ে চলছেন। আমরা সবাই এসে যাওয়ায় তার আর ষাট পর্যন্ত গোনাও হলো না কাউকে পিটুনিও লাগাতে পারলেন না। কেবল কটমট করে তাকালেন সবার দিকে। এবার বাম হাতে তার সেই শাহি গোঁফ জোড়াতে দু'পাক তা লাগালেন এবং বললেন, কেয়ামত, কেয়ামত! আজকে তোদের কেয়ামতের দিন। একটু পরেই ইসরাফিলের প্রথম শিঙ্গা বাজবে। সাথে সাথে তোরা মাঠের শেষ সীমানায় পৌঁছবি এবং ছড়িয়ে পড়ে সারা মাঠ খুঁজে এক এক জনা এক একটা ঠুনকো জিনিস এনে আমার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে, ওই দূরের লাইন ধরে দাঁড়াবি। দ্বিতীয়বার শিঙ্গা বাজলে দৌড়ে এসে এই জিনিসগুলোকে দেখে গিয়ে যার যার খাতায় লিখবি। আমি ষাট পর্যন্ত গুনে তৃতীয় শিঙ্গা বাজাবো। সাথে সাথে লেখা শেষ করে যার যার খাতা হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে যাবি। তখন আমি দেখবো- কে কতটা আইটেমের নাম লিখেছিস। যদি কারো একটা আইটেম বাদ পড়ে যায়, তার জন্য আজ সোজা জাহান্নাম। আর যার বেশি আইটেম বাদ যাবে তাকে পাঠাবো হাবিয়া দোজখে। হাঃ হাঃ হাবিয়া দোজখ! আরে, এই গরুর দল! হাবিয়া দোজখ চিনিস? হাঃ হাঃ। হাবিয়া হলো জাহান্নামের দাদা। যাকে বলে একশত এক বেতের ঘা। বুঝলি কিছু? বুঝলি কথার মর্মবাণী? হাঃ হাঃ আজকে তোদের কেয়ামতের দিন।
পিটি স্যারের কথায় আমাদের পিত্তি জ্বলে গেলেও কেউ কিন্তু টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলাম না। অযথা কথা বলে খামোখা পিটুনি খেয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং মৌনং শ্রেষ্ঠং পন্থায়ও। অর্থাৎ চুপচাপ থাকাটাই শ্রেষ্ঠ কাজ। ওই যে কথায় বলে না? বোবার কোনো শত্রু নেই। তবে মনে মনে জপে নিলাম, স্যার তো দেবেন হাবিয়া অথবা জাহান্নামে! আমরাও আজ পুলসিরাত পেরিয়ে সোজা চলে যাবো জান্নাতে। দেখি না কী হয়? আমনি আকাশ বাতাস দীর্ণ বিদীর্ণ করে ইসরাফিলের শিঙ্গায় আওয়াজ তুললেন পিটি স্যার তার টাইগার ব্র্যান্ডের স্টিলের বাঁশিতে প্রথম হুইসেল বাজিয়ে। আমরা একদৌড়ে ছুটে গেলাম মাঠের শেষ প্রান্তে এবং সবাই সবাইকে যার যার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এটা ওটা ঠুনাকো জিনিস, যেমন ঘাস, ফুল, আইসক্রিমের কাঠি, বাদামের খোসা, বোরই বিচি, তেঁতুল বিচি, ছোট্ট টুকরো কাগজ, খেজুরের বিচি, ইটের কণা, ঘাসের গুটি, মাটির গুলি, আমপাতা, জামপাতা, ম্যাচের খোসা ইত্যাদি ইত্যাদি সব আইটেম ঠোকানোর ভান করে ছড়িয়ে পড়লাম মাঠের এদিক ওদিক এবং ক্লাস শুরু



www.pathagar.org

আগে সকাল বেলাতে আমাদের বিতরণ করা আইটেমগুলো চোখের পলকে পকেট থেকে বের করে এক দৌড়ে এসে সেগুলোকে স্যারের পায়ের সামনে রেখে লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্যার তখনো তার সেই চিরাচরিত মুদ্রাদোষে আক্রান্ত হয়ে আছেন। একটা করে সেকেন্ড গুনছেন আর একটা করে বেত কষছেন নিজের পায়ে। তারপর হঠাৎ বেজে উঠল তার দ্বিতীয় হুইসেল। আমরাও যার যার খাতায় লেখার ভান করে সকলেই স্লিপ দেখে লিখে রাখা ঠুনকো জিনিসের নামলেখা পাতাটা বের করে এমনি এমনিই হাত ঘুরাতে লাগলাম। পিটি স্যার তখন দূরে দাঁড়িয়ে তার সেই মুদ্রদোষের চর্চাটি মনের সুখেই চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি ভাবতেই পারলেন না, আমাদের এখানে কি দিয়ে যে কি ঘটে যাচ্ছে। এদিকে আমরাও তীব্র রোমাঞ্চ অনুভব করছি। অমনি লম্বা একটা হুইসেল ফুঁকে পিটি স্যার তার তৃতীয় বাঁশি বাজানো শেষ করলেন। আমরাও এক লাফে যার যার খাতা হাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। পিটি স্যার পকেট থেকে রুমাল বের করে তার পায়ের কাছ থেকে আমাদের সব ঠুনকো জিনিসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে রুমালে তুললেন এবং একটা পোটলা বানিয়ে সেটিকে বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে তার চকচকে কালো বেতটাকে ঠিক সহিসের মতোই বাতাসের গায়ে সপাং সপাং মারতে মারতে এগিয়ে এলেন। তার প্রথম টার্গেটই যেন আমি। রুমালে বানানো পোটলাটি আমার সামনেই মাটিতে রেখে খুলে ফেললেন। তারপর সবগুলো জিনিস সাজিয়ে নিয়ে খপ করে একথাবা মেরে আমার খাতাটা কেড়ে নিলেন। কিন্তু খাতায় লেখা ঠুনকো জিনিসের তালিকা আর জিনিসগুলো একদম মিলে যাওয়ায় স্যার যেন খানিকটা হতাশ হলেন। অনেকটা আনমনে আমার খাতাটা ফিরিয়ে দিয়ে বাজপাখির মতোই ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলেন তাহেরের খাতা। গুনে গুনে মিলালেন তালিকা। ওর দিকে কটমট করে তাকালেনও দু-একবার। কিন্তু তাহেরকেও তিনি আর জাহান্নাম বা হাবিয়া দোজখে পাঠাতে পারলেন না। এভাবে এক এক করে দেখতে দেখতে আমাদের ক্লাসের গুবরে গনেশ নামে খ্যাত হাবুল উদ্দিন বেপারী ওরফে হাবলু মিয়াকেও পিটি স্যার বেতুনী তো দূরেই থাক একটা ফুলের টোকাও যখন দিতে পারলে না, তখন তিনি রাগে ক্ষোভে আর অপমানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার থেকে নেমে গিয়ে একেবারে রয়েল বেঙ্গল মার্জার হয়ে নিজের মাথার চুল টানতে টানতে টিচার্স রুমের দিকে ফিরে চললেন। এদিকে বিজয়ের আনন্দে যেই না আমরা হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠেছি, অমনি স্যার ঘুরে দাঁড়ালেন। তখন তার চেহারাটা কঠিন পাথরের মতো দেখতে লাগলো। তিনি দৃঢ় পায়ে ফিরে এসে আমাদের মুখোমুখি হলেন। স্যারের এই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আমাদের অন্তরাত্মা রীতিমত খাঁচাশূন্য হবার দশা। আমার তো পিপাসায় একেবারে কলজে পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। আমরা প্রচ- একটা ভূমিকম্পের অপেক্ষা করতে লাগলাম। অমনি বজ্রপাতের মতো গুড়গুড় করে উঠলেন পিটি স্যার– বলি, আমাকে কি বোকা ঠাওরেছিস? তোদের এসব হারিং মারিং কিছুই বুঝতে পারিনি? বল এতো সবের নাটের গুরু কোন হোজ্জা? হোজ্জাটিকে আজ এমন ধোলাই দেবো, যেনো জীবনভর মনে থাকে এই কেরামত



www.pathagar.org

উল্লাহ্ পিটি স্যারের ধোলাইয়ের কথা। এই টিকটিকির দল। জলদি জলদি বল। এই ভোমরা মরা ছক্কাটাকে চেলেছে কোন হোজ্জা? না হলে সবগুলোকে।... স্যারের তর্জন গর্জনে সত্য কথাটি আমার মুখ ফসকে বেরিয়েই গেলো। কাচুমাচু করে বললাম, স্যার বুদ্ধিটা আমিই বের করেছি। আমাকে যেমন ইচ্ছে শাস্তি দিন, আর কাউকে মারবেন না স্যার। আসল সত্য কখনো চাপা থাকে না। আমার চালে পড়েই ওরা এমনটি করেছে। আমাকেই শাস্তি দিন স্যার।

পিটি স্যার এবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, কী! ডুবে ডুবে এতদূর! আবার আমাকে জ্ঞান দেয়া হচ্ছে? মনে মনে আল্লাহর নাম জপ কর। আজই তোর জীবনের শেষ দিন। আজই তোর কেয়ামত।

এই বলে স্যার তার তেল মাখিয়ে আগুনে ছ্যাঁকা কালো চকচকে বেতটাকে বজ্র কঠিন হাতে শাঁ করে আকাশের দিকে তুললেন। আমার কলজেটা ধক করে উঠলো। শির শির করে একটা প্রবাহ খেলে গেলো মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা অবধি। জ্ঞান হারিয়ে চোখ মুদে ফেলি আর কি! অমনি বিদ্যুৎ বেগে স্যারের বেতটা ছুটে গিয়ে পড়লো স্কুলের মাঠের পাশের ছোট্ট পুকুরের মাঝ বরাবর। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা সবাই পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলাম এবং সহসাই স্যার আমাকে বুকের সাথে জাপটে ধরে বললেন, যা, তোদের সব ভয়গুলোকে আজ পুলসিরাত পার করে দিলাম। আমাকে তোরা অমন ভয় করিস কেনরে? আর তুই হতভাগাটা আমার ধারে কাছেই ঘেঁষতে চাস না। কেবলই সরে সরে থাকিস। আমি বাঘ, না কি ভালুক? আমিও তো তোদের মতো রক্ত মাংসে গড়া একটা মানুষই। তোদেরই মতো আমারও তো দুষ্টুমি করতে মন চায়। হেসে খেলে বেড়াতে মন চায়। নইলে কি আর এমনি এমনি পিটি স্যার হয়েছিরে...। স্যার যখন কথাগুলো বলছেন, তখন, চোখ দুটো তার লবণগোলা ঝরণার বানে ঝাপসা হয়ে গেছে। আমার চোখও অশ্রুপ্লাবন বাঁধ মানতে চাইলো না। আমিও কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না, শুধু অস্পুট স্বরে স্যার! বলে তার বুকের সাথে নিবিষ্টভাবে সেঁটে রইলাম। আমার সহপাঠী বন্ধুরাও আনন্দ আর আবেগের অশ্রুনদীতে বিজয়ের নাও ভাসিয়ে মাস্তুলে তার তীর্যক আলোর পাল তুলেছে। স্যারের স্নেহবন্ধন থেকে মুখ তুলে দেখি অদূরে স্কুল বারান্দায় দাঁড়ানো আমাদের মাননীয় হেডস্যার অভিভূত হয়ে তখনো তাঁর রুমালের কোণে চোখ মুছছেন।

ডিসেম্বর, ১৯৯৯



www.pathagar.org

# মায়ের আদর

শরীফ আবদুল গোফরান

www.pathagar.org

সুন্দর একটি গ্রাম। নাম তার হাসানপুর। এই গ্রামে বাস করে দুই বন্ধু। একজনের নাম মাসুদ আর অন্যজন সাকিব। ওদের দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। একজন অন্যজনকে ছেড়ে থাকতে পারে না। মাসুদের আব্বা গ্রামে কৃষি কাজ করে, আর সাকিবের আব্বা শহরে চাকরি করে। সাকিবও এক সময় তার আব্বা-আম্মাসহ শহরে থাকতো। কিন্তু তার আম্মার অকাল মৃত্যু হলে আব্বা পুনরায় বিয়ে করেন। কিন্তু সৎ মা সাকিবকে মোটেও সহ্য করতে পারতো না। আব্বা অফিসে চলে গেলে হরহামেশা তাকে বকঝকা করতো। এসব কথা আব্বার কানে গেলে তিনি তাকে গ্রামের বাড়িতে দাদির কাছে পাঠিয়ে দেন। দাদি তাকে আদর যত্ন করে বড় করে তোলেন। এই গ্রামে এসেই সাকিবের সাথে পরিচয় হয় মাসুদের। সাকিব পড়াশুনায় ভাল নয় কিন্তু মাসুদ পড়াশুনায় খুব ভাল। কিন্তু তবুও একজন আরেক জনের বন্ধু। আব্বা বাড়ি এলে মাসুদের সাথে ঘুরতে দেখলে তাকে খুব বকা দিতেন। কারণ মাসুদরা গরিব। সে ভাল জামা কাপড় পরতে পারে না। আব্বা মনে করতেন মাসুদের সাথে ঘুরলে হয়তো সাকিব নষ্ট হয়ে যাবে। তার বকা খেয়েও সাকিব মাসুদের সাথে চলতো। কারণ সাকিব জানে তার গায়ে ভালো জামা কাপড় না থাকলেও সে খুব ভাল ছাত্র।

মাসুদরা গরিব বলে স্কুলে টিফিন নিতে পারে না। সাকিবকে ছেড়ে তাদের গাছের আম, জাম, পেয়ারা কিছুই খায় না। অনেক সময় স্কুল ছুটি হলে মাসুদ সাকিবকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। তার মা দু'জনকে আদর করে কত কিছু খেতে দেন। সাকিব যখন বাড়ি ফিরতো একা একা হাঁটতে হাঁটতে তার মায়ের কথা মনে পড়ে যেত। ভাবতো হায়রে! আমারও যদি মাসুদের মত এমন একটা মা থাকতেন তা হলে আমাকে কত আদরই না করতেন। অনেক সময় মাসুদের কাছে তার মায়ের কথা বললে, মাসুদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, মায়ের কথা মনে হলে আমাদের বাড়ি চলে আসবি। আমার মাকে দেখলে তোর মায়ের অভাব পূরণ হয়ে যাবে। তাই সে অনেক সময় লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসে মাসুদদের বাড়ি। আব্বা দেখলে তো নিস্তার নেই। তিনি অনেকবার বারণ করেছেন যেন মাসুদের সাথে না মেশে। কারণ তিনি গরিব লোক মোটেও সহ্য করতে পারেন না। সেদিন সাকিবের আব্বা শহর থেকে বাড়ি এসেছেন। সাকিবকে দাদির কাছে ডেকে এনে বললেন, সাকিব পড়াশুনায় দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কত বারণ করেছি গ্রামে নোংরা ছেলেগুলোর সাথে না মিশতে। সাকিব আব্বাকে বলার চেষ্টা করলো আমি তো মাসুদের সাথে ঘুরি, সে তো ভাল ছেলে। আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয়। কিন্তু সাবিকের কথা শেষ না হতেই আব্বা ধমক দিয়ে বললেন, ওসব ছোটলোকের ছেলেদের সাথে মিশতে তো আমি তোমাকে বারণ করেছি। যাক আমি ওসব শুনতে চাই না। আগামী সোমবার তোমাকে শহরে নিয়ে যাব। ওখানে ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেবো। সাকিব দাদির বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। সে যেতে চায় না শহরে। সে শহরে চলে গেলে মাসুদকে ছেড়ে থাকবে কেমন করে। সেখানে গেলে তো আর মাসুদের মায়ের মত এমন মায়ের আদর পাবে না।

বিকেলে সাকিব মাসুদদের বাড়ি যায়। তারপর মাসুদের হাত ধরে বললো ভাই মাসুদ, আব্বা আমাকে শহরে নিয়ে যাবেন। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকবো কেমন করে? একজন আরেক জনকে জড়িয়ে ধরলো। মাসুদ বলছে, ভাই আমাকে মাফ করে দিস। মাসুদের মা দূরে দাঁড়িয়ে তাদের এই আন্তরিক দরদ দেখে চোখের পানি মুছতে লাগলেন, যেন তার আপন পুত্র বিয়োগের ব্যথায় বুক ফেটে কান্না আসছে। মা কাছে গিয়ে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবা তোর যখনই মনে হবে আমার কাছে চলে আসবি। আমি তোর মা। তার পর সন্ধ্যা



www.pathagar.org

ঘনিয়ে এলে সে আবার বাড়ির পথে যাত্রা করে। মাসুদ এবং তার মা সাকিবের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'জনের চোখেই পানি।

এমনি করে একদিন সোমবার চলে আসল। সাকিব তার বইপত্তর, জামা-কাপড় সব ঠিক করে নিয়েছে। শুধু বাকি মাসুদের সাথে শেষবারের মতো দেখা করা। এক সময় মাসুদের বাড়ির দিকে দৌড় দিল কিন্তু আব্বা দেখে তাকে খুব ধমক দিয়েছেন। আর কোথাও যেতে হবে না। এখনই ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, এই বলে স্টেশনের দিকে যাত্রা করলো। পথেই মাসুদের সাথে সাকিবের দেখা হয়ে গেল। মাসুদকে জড়িয়ে ধরতে চাইলে আব্বা ধমক দিয়ে টেনে নিয়ে যান। মাসুদও তাদের পেছন পেছন রেল স্টেশন চলে আসে।

চোখের পানি মুছতে মুছতে সাকিব আব্বার সাথে ট্রেনে উঠে জানালার পাশে বসে। আর অমনি মাসুদের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে সাকিবের দিকে তাকিয়ে থাকলো। হাত নেড়ে বিদায় দিল সাকিবকে। কেঁদে কেঁদে মাসুদ বলল, শহর থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখিস। ধীরে ধীরে ট্রেন চলতে লাগলো। ট্রেনের জানালা থেকে মাথা বের করে সাকিব চিৎকার করে বলে, মাসুদ আবার আসবো। তুই ডাক পিয়নকে বলে রাখবি, আমি চিঠি পাঠাবো। কিছুক্ষণ পর ট্রেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

শহরে এসে সাকিবের মন মোটেও ভালো নেই। স্কুলে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু পড়ালেখা তার একটুও ভালো লাগে না। নতুন বন্ধুদের সাথে মোটেও মিলে না। কারণ কেউ তাকে মাসুদের মতো ভালবাসে না। সবাইকে তার কাছে যেন পর বলে মনে হয়। তার মনে পড়ে যায় গ্রামের কথা। বশু মাস্টারের পাঠশালায় কত মজা করে পড়েছে। বশু মাস্টার কত আদর করতেন। ঠিকভাবে না পড়লে আদর করে চকলেট দিতেন, পড়ার জন্য বলতেন। মাসুদের সাথে স্কুল থেকে ফেরার পথে অলিবাড়ির আমগাছ থেকে কত পাকা আম পাড়তো। মাসুদ গাছে উঠতো আর পাকা আমগুলো নিচে ফেলতো। সাকিব স্কুলব্যাগ ভর্তি করে আম নিয়ে বাড়ি ফিরতো। মাসুদদের বাড়ি গেলে তার মা কত আদর করে খেতে দিতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে খাওয়াতেন। তখন তার মায়ের কথা আর মনে থাকতো না। মনে হয় কতদিন সে মায়ের পরশ পায় না। দিনের বেলায় মাসুদের সাথে ঘুরে বেড়ানো, রাতের বেলায় দাদির কোলে মাথা রেখে রূপনগরের কিচ্ছা শুনতে কত মজাই না লাগতো। ভাবতে ভাবতে এক সময় কাগজ কলম নিয়ে বসে যায় সাকিব। আজ রাতেই মাসুদকে চিঠি লিখতে হবে।

সে লিখছে, মা কেমন আছেরে! তিনি কি আমাকে আগের মত আদর করবেন? তোর মা'টা আমাকে দিয়ে দেনা ভাই। তোর মায়ের মতো তো আমাকে কেউ আদর করে না। লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে যায় সাকিব। ও ঘর থেকে আব্বার গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। সাকিব এতরাত অবধি জেগে জেগে কি করছিস? সাড়ে এগারটা বাজতে চললো শিগগির শুয়ে পড়। দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালো সাকিব। তাইতো বেশ রাত হয়েছে। এবার ঘুমাতে হবে। তবে এখন ঘুমালে চলবে কেমন করে! চিঠি লেখা তো শেষ হলো না। লিখছে আর ভাবছে। ঘুমও পাচ্ছে। তবুও সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে ও আবার লেখায় মন দেয়।

এক সময় চিঠি লেখা শেষ হলো। লাইটের আলোয় ওর সাজানো সুন্দর ঘরটাকে আরও বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। হঠাৎ করে দেয়ালের কোণে মার ছবিটার দিকে নজর পড়লো। মনে হচ্ছে কি জীবন্ত মায়ের ছবি। মার ঘোমটা টানা মুখখানি কি মায়াময়! মার ছবির দিকে বারবার তাকায়। মার চোখ দু'টি যেন ওর দিকে স্থির। মা যেন ওকে প্রাণ ভরে দেখছেন। ওর অন্তরাত্মা বলে উঠলো, মা, মাগো, তুমি যদি বেঁচে থাকতে তা হলে আমাকে কত আদর



www.pathagar.org

করতে। ওর মা বেঁচে থাকতে বলেছিল, 'সপ্তম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উঠলে তোকে নুতন জামা বানিয়ে দেব। আজ তো আমি অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি। কে আমাকে নতুন জামা বানিয়ে দেবে? আজ কে আমাকে আদর করবে। আম্মু গো কে আমাকে জায়নামাজে বসে দোয়া করবে। তুমি কি জায়নামাজে বসে আমার জন্য দোয়া করবে না?

রাত বারটা বাজলো, মনের পর্দায় ভেসে উঠলো সাকিবের অনেক কথা। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদের মা, আর মাসুদ। হাত নেড়ে মাসুদের মা বলছেন, বাবা সাকিব আমিও তোর মা, আয় আমার কোলে আয়। আমি তোকে নিতে এসেছি। আমি তোকে আর মাসুদকে জড়িয়ে রাখবো। আমার বুক থেকে কেউ তোকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সারা জীবন ধরে তোকে মায়ের আদর দিয়ে যাবো। আয়, বাবা আয় আমার বুকে আয়। সাকিব মা, মাগো বলে কেঁদে উঠলো। তুমি কি আমার সাথে রাগ করেছ? মা, আমার খিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও মা। আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও মা।

মা সাকিবকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাছা তোর সাথে আমি রাগ করিনিরে। তোকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরে রাখবো। তুই তৃপ্তির সাথে আমার বুকে ঘুমা। সাকিব আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরতেই মা-আ, বলে চিৎকার করে উঠলো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে মা-তো নেই, তাহলে মার সাথে যে মাসুদ এলো সে কই? না, কেউ নেই। ...

সারা রাত সাকিবের চোখে ঘুম নেই। ভাবতে ভাবতে রাত গড়িয়ে ভোর হতে আর মাত্র অল্প কিছুক্ষণ বাকি। দূর মসজিদ থেকে ফজরের আজান ভেসে আসছে। আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম। ঘরে সবাই তখনো ঘুমে। সাকিব ঘর থেকে বের হয়ে কমলাপুর রেল স্টেশনে এসে পড়লো। সে আর থাকতে চায় না এই শহরে। সে চলে যাবে দাদির কাছে। যেখানে আছে তার বন্ধু মাসুদ। আর আছে মায়ের আদর। ভাবতে ভাবতে এক সময় ট্রেনে চেপে বসলো। অনেক পথ মাড়িয়ে ট্রেন এসে থামলো হাসানপুর রেল স্টেশনে।

ট্রেন থেকে নেমেই সাকিব মাসুদদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। মাসুদদের বাড়ি এসে ডাক দিলো, মাসুদ, মাসুদ, আমি গ্রামে চলে এসেছি। আমি তোকে আর মাকে ছেড়ে থাকতে পারি নারে! কি ব্যাপার যেন ভুতুড়ে বাড়ি। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ জবাব দিল না। ও ভীষণ অবাক হলো। ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখে মাসুদের ছোট ভাই মাহফুজ ছাড়া আর কেউ নেই। সে জিজ্ঞেস করে মাসুদ কোথায়, মা কোথায়? মাহফুজ কেঁদে দিলো। আপনি এতদিন পর এসেছেন! আপনি চলে যাওয়ার পর ভাইয়ার মন খারাপ হয়ে যায়। ভাইয়া প্রায় রেল লাইনের পাশে গিয়ে বসে থাকতো। আপনি কবে আসবেন সময় গুনতো। একদিন সন্ধ্যায় রেললাইন ধরে বাসায় আসার সময় একটি ট্রেন ভাইয়াকে দু'ভাগ করে চলে গেল। আমরা খবর শুনে দৌড়ে গেলাম। ভাইয়ার লাশ দেখে হঠাৎ মা বেহুঁশ হয়ে সেখানেই প্রাণ হারালেন। বড় মাঠের দক্ষিণ দিকে তাদের দু'জনকে পাশাপাশি কবর দিয়েছে।

সাকিব এই কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে কবরের দিকে গেল। মাসুদের কবরের ওপর তার চিঠি রেখে বলছে, তোকে লেখা চিঠি পড়, আমি কি লিখছি। আর মায়ের কবর জড়িয়ে ধরে বলছে, মাগো আমাকে আদর করো না। তুমি না বলেছ আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাবে! আমাকে নিয়ে যাও মা, আমাকে নিয়ে যাও।

জুন, ১৯৯৯



www.pathagar.org

# সত্য হলো বিজয়ী

মাহবুব আনোয়ার

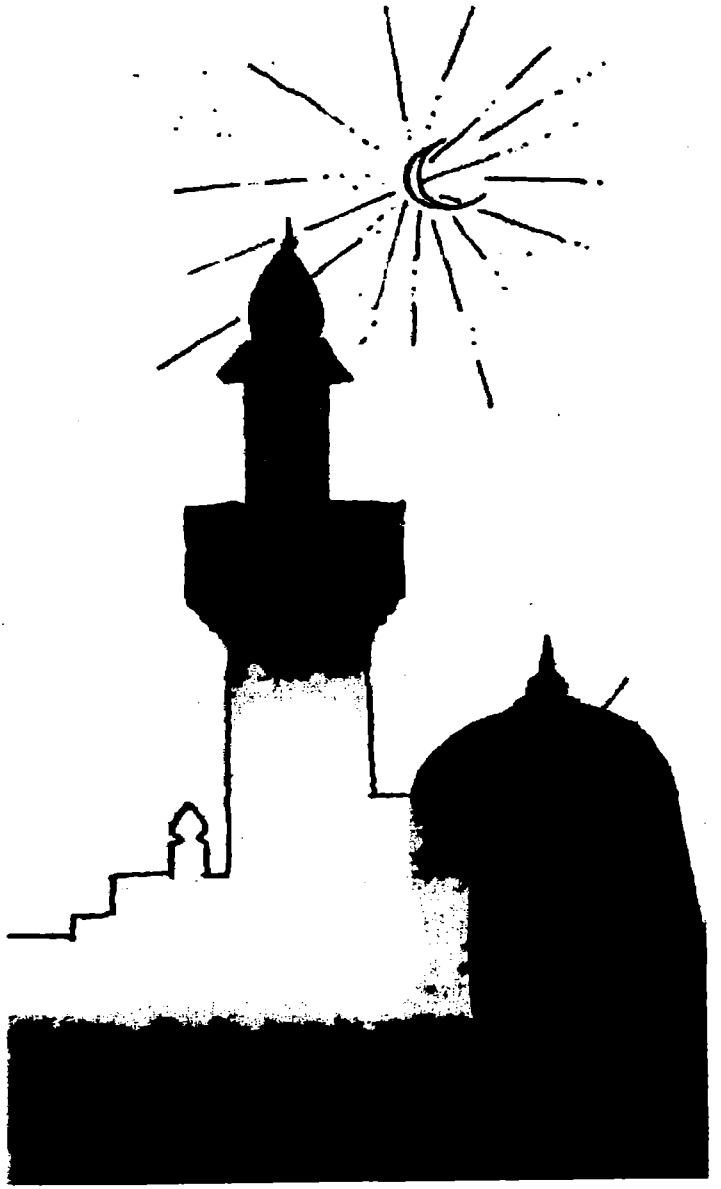

www.pathagar.org

রোম থেকে এসেছে একজন লোক। তিনি রাজার উজির। উজির নিয়ে এসেছেন তিনটি প্রশ্ন। বাদশাহ মনসুরের দরবারে। আরবের জ্ঞানীগুণীদের জন্য। বাদশাহ মনসুর ডেকে পাঠালেন দরবারে। এলেন আলেম জ্ঞানীগুণী পন্ডিত। সবার সামনে রোমের মন্ত্রী তিনটি প্রশ্ন করলেন। কিন্তু কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। কিল্লাফতে মনে করে রোমের মন্ত্রী মুচকি হাসেন। এমন সময় ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ উঠে দাঁড়ান প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য। অনুমতি চান। বাদশাহ, সওয়াল জওয়াবের অনুমতি দেন। ইমাম আবু হানিফা রোমের উজিরকে বললেন, আপনি তো জানেন প্রশ্নের উত্তরদাতাকে উপরের আসনে বসা উচিত।

রোমের মন্ত্রী বললেন, তাতো বটে।

এ কথা শুনে রোমের মন্ত্রী মুখ চুন করে নিচে এসে বসলেন। আর ইমাম আবু হানিফা উঁচু আসনে বসলেন। এতে ভোজবাজির মতো সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল।

ইমাম আবু হানিফা রোমের মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রথম প্রশ্ন কী?

রোমের উজির প্রথম প্রশ্ন করলেন, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর আগে কী ছিল? ইমাম আবু হানিফা বললেন, তুমি নিঃসন্দেহে এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি গণনা করতে জানো! তাহলে জবাব দাওতো একের আগে কোনো সংখ্যা আছে? রোমের উজির বললেন : না, নেই। ইমাম আবু হানিফা বললেন, একটি সংখ্যার যখন এই অবস্থা তখন আল্লাহ যে এক সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। রোমের উজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কী বল?

রোমের উজির উত্তর দিলেন : জি হ্যাঁ।

রোমের মন্ত্রীকে বললেন, এবার তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন বলো।

রোমের মন্ত্রী বললেন, আল্লাহর মুখ কোন দিকে বলতে পারেন? এ কথা বলে ইমাম আবু হানিফার দিকে তাকালেন। ইমাম আবু হানিফা বললেন, বলতো একটি বাতির আগুনের শিখার মুখ কোন দিকে?

রোমের মন্ত্রী বললেন, বাতির আগুনের মুখ সব দিকে।

এবার আবু হানিফা বললেন, আল্লাহর মুখও সব দিকে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি বললেন, এবার বলো তোমার তৃতীয় প্রশ্ন।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে মন্ত্রী বললেন, এখন আল্লাহ কী করছেন?

ইমাম আবু হানিফা বললেন, আল্লাহর অসংখ্য কাজের মধ্যে এখন একটা কাজ করেছেন, আর তাহলো আমাকে ওপরে উঠিয়ে তোমাকে নিচে নামিয়েছেন। বাদশাহ মনসুরের দরবার খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠলো। প্রতিযোগিতায় হেরে রোমের মন্ত্রীর উঁচু মাথা নিচু হয়ে গেল। কত আশা নিয়ে এসেছিলেন। সবই নষ্ট হয়ে গেল। তিনি তার রাজাকে বুঝিয়ে ছিলেন, আরবরা অকাঠ মূর্খ। তারা কি এই সব কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? রোমের রাজাকে বুঝিয়ে ছিলেন এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে রোমের রাজার কাছে পরাস্ত হয়ে আরবের রাজার কাছ থেকে কর আদায় করবেন।

ইমাম আবু হানিফা রোমানদের থোতা মুখ ভোতা করে দিয়ে ইসলামের গৌরবকে করলেন সমুজ্জ্বল। এইভাবে যুগে যুগে সত্যপন্থীরা বিজয়ী হয়ে ইসলামের মিশনকে করেছেন মহীয়ান।

মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯৩



www.pathagar.org

# চিঠি

## ইকবাল কবীর মোহন

www.pathagar.org

ভাইয়াটা যেনো কেমন হয়ে গেছে। সেই কদ্দিন হলো একদম আসে না। আব্বা না হয় একটু বকেছে। তাতে কি হয়েছে! তাই কি এমন করে লুকিয়ে থাকতে হয়? আব্বা যে কি! মাঝে মাঝে একদম খারাপ লাগে। ভীষণ জিদ ধরে তার ওপর। এমন করে বকতে হয়? ছেলেরা তো অনেক দোষই করে। সে জন্য বকাঝকা করে কি লাভ? ভাইয়ার দোষটাই বা কি? একটু দেরি করে না হয় ফিরেছে। তো কি হয়েছে? আজ ক'দিন হলো ভাইয়া ঘরে নেই। কোথায় থাকে, কেমন আছে খোঁজ নেই। মনটা একদম ভাল্লাগে না। ভাইয়া কবে আসবে। ইস, আজ ক'দিন ভাইয়ার ডাক শুনি না। এখন কেউ খেতে ডাকে না। বাগানে বেড়াতে কেউ তাড়া করে না। খুব ভোরে আর ভাইয়ার ডাকে ঘুম ভাঙে না । ভাইয়া! তোমাকে পেলে আচ্ছা করে বকবো। তুমি এমন হতে পারলে? আমাকে এতদিন ভুলে থাকতে পারলে? আব্বাকেও বকবো মনের মত। তিনি যেন কেমন মানুষ। প্রায়ই ভাইয়াকে বকা দেবেন। সময়ে অসময়ে শাসাবেন। ভাইয়ার কি দোষ? তিনি বলেন, ভাইয়া নাকি পলিটিকস করেন। তাই ভাইয়ার সাথে এত রাগ। কারো সাথে ভাইয়াকে দেখলেই হলো। আর নিস্তার নেই। বাসায় কেউ খোঁজ করতে এলো তো রক্ষা নেই। তার চৌদ্দ পুরুষ নিয়ে ছাড়বেন। কারো আব্বা এমনটি করেন?

ভাইয়া খুব ভালো। কখনও আব্বাকে কিছু বলেন ন। মুখের ওপর দু'কথা বলার মত ভাইয়া নন। আব্বার বকুনি খাবেন। তবু নীরবে সহ্য করবেন। লৈখাপড়ায় কোনোদিন খারাপ করেননি তিনি। রীতিমত কলেজেও যান। পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েন। পাড়ার যত বখাটে ছেলেপুলেরা আছে তাদের খুব করে বুঝাবেন। কত ছেলেইতো ভাইয়ার কথা শুনে নামাজ ধরেছে। কত সুন্দর করে ভাইয়া ইসলামের কথা বুঝান মানুষকে। ড্রইয়ং রুমে বসে কত যুক্তি দিয়ে ইসলামের কথা বলেন, খুব আনন্দ লাগে আমারও। তাইতো মাঝে মধ্যে ওপাশের রুমে বসে বসে এক মনে ভাইয়ার কথা গুলো শুনতাম।
এই যা ভাইয়ার দোষ। আব্বা বলেন, ইসলাম নিয়ে এত পন্ডিতি কেন? এই বয়সে ও এত চালাক হতে যাবে কেন? আব্বা ভাইয়াকে অনেক সময় ড্রয়িং রুমের এসে কাউকে বুঝাতে দেখতেন। আর সেই তো সারা। খুব ধমকাতেন ভাইয়াকে। এই সব না করে একটা নোবেল পড়লেও তো পারে সে। নোবেল পড়লে তো কিছু একটা লেখা যায়। আব্বার এসব কথা শুনে আমারও খুব খারাপ লাগে। তিনি একদম নামাজ পড়বেন না। তাই তো ভাইয়ার ভাল কাজও তার পছন্দ হয় না। তিনি চান আধুনিক হোক গানের পার্টিতে যাক। বিকেলে ঘোরাফেরা করুক। নাটক করুক। নোবেল পড়ুক। মাসখানেক হয়ে গেলো। ভাইয়ার খোঁজ খরব নেই। আম্মাতো চিন্তায়, কান্নায় একদম বিছানায়। আব্বার যেন কোনো চিন্তা নেই। কোনো উদ্বিগ্নতা নেই।
সেদিন দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে ঘুমাতে যাচ্ছি। চোখে কি আর ঘুম আসে? তারপরও ঘুমাবার ভান করা আর কি। এমন সময় কে যেন দরজায় কড়া নাড়লো শব্দ শুনে এলাম দরজা খুলতে। বারে, এ যে ডাকপিয়ন! পিয়ন চাচা।
– কি চাচা কেমন আছেন?
– ভালোরে মা। তুই কেমন আছিস?
– ভাল না চাচা। মনটা না খুব খারাপ।
– কেন রে মা? তোর আবার কি হলো?
চাচা, রিপন ভাইয়া না বাসায় নেই অনেক দিন। তুমি রিপন ভাইয়াকে দেখেছো? তুমি



www.pathagar.org

ভাইয়াকে না কত আদর করতে।

– রিপন বাসায় নেই! তাইতো ওকে বেশ অনেক দিন দেখি না। তো তোর আবাব কিছু বলছে নাকি?

– হ্যাঁ চাচা! তিনি ভাইয়াকে খুব বকেন। তাই ভাইয়া সইতে না পেরে চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। বলতে বলতে মিনুর দু'চোখ ভিজে ওঠে অশ্রুতে। ডাকপিয়ন এতক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়েছিল। মিনুর কথা থেমে গেলে সে মুখ তুলে তাকায়। চমকে ওঠে গফুর মিয়া।

– না মা কাঁদতে নেই। রিপন তোর ভাইয়া ফিরে আসবেই। রিপন আমার কলিজার টুকরারে মিনু। কত ভাল ছেলে। এমন ছেলে আজকাল আর হয়? ভদ্রতা, নম্রতা, সততা সব মিলে রিপনের তুলনাই হয় না। তাইতো যে একবার তাকে দেখেছে আর ভোলেনি। আমিও তো তাকে...।

বলতে বলতে বুক থেকে এটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ডাকপিয়নের। বুকটা যেন হাহাকার করে ওঠায় মিনু অলক্ষ্যেই দু'ফোঁটা অশ্রু বেরিয়ে আসতে চায়। যেন হাত ধরে পানি চেপে রাখে গফুর।

– মিনু। ও মিনু।

মা ডাকছেন মিনুকে। এতক্ষণ মিনু ঠায় দাঁড়িয়েছিল দরজায়। পিয়ন চাচার কথায় তার সকল চেতনা যেন হারিয়ে যাচ্ছিল কোথাও। মার ডাকে সম্বিত ফিরে পেলো মিনু!

– আসি চাচা। মা ডাকছেন।

– যাও মা। তুমি একটুও ভেবো না। আমি আজই রিপনকে খুঁজবো। ওকে বের করে আনবো ইনশাআল্লাহ। দুটো চিঠি মিনুর হাতে দিয়ে চলে যায় গফুর। মিনুর বুকটা যেন হালকা হয় কিছুটা। গফুর চাচা ওকেও খুব আদর করে। অনেক দিন থেকে পরিচিত এই ডাকপিয়ন। রিপন ও মিনু তাকে চাচা বলে ডাকে। গফুরও ওদের আপন সন্তানের মতই দেখে, স্নেহ করে। মিনু চিঠি দুটো মায়ের হাতে তুলে দেয়। মা ঠিকানা পড়ে একটা মিনুকে পড়তে দেন। মিনু বিস্মিত হয়। চিঠি! কে আমায় চিঠি লিখলো? কেউ আমাকে কোনোদিন চিঠি লেখেনি! ঠিকানা-টা দেখেই মিনুর বুঝতে বাকি রইল না। বুকটা তার আনন্দে ভরে উঠলো। এ যে ভাইয়ার চিঠি! মিনুর আনন্দ আর কে দেখে। ইনভেলাপ খুলে চিঠি পড়তে বসলো মিনু। রিপন লিখেছে– মিনু, স্নেহাশীষ জানিস। অনেক দিন তোকে লিখবো লিখবো ভাবছিলাম। লিখি লিখি করেও বেশ দেরি হয়ে গেলো। মিনু তুই আমাকে ভুলে গেছিস, না? যেদিন বাড়ি থেকে চলে এলাম সেদিন থেকে আমার জীবনটা যেন কেমন হয়ে গেছেরে মিনু।

বারবার প্রতি মুহূর্তে তোকেই শুধু মনে পড়ে। মনে পড়ে তো অংখ্যা স্মৃতি আর কথা। মাকে মনে পড়লে দুচোখ অশ্রুতে ভরে যায়। বহু কষ্টে বুকটা বেঁধে রাখতে চাই। কিন্তু পারি কই! মাঝে মাঝে ভাবি আব্বার অফিসের সময় একবার তোদের দেখে আসি। কিন্তু নতুন স্মৃতিতে অবলোকন করে আরো বেদনা বাড়াতে সাহস হয় না বলে আসি না। জানি তুই খুব ক্ষেপে আছিস। মন খারাপ করিস না মিনু। তোর রিপন ভাই মানুষ হতে চলে এসেছে। নিজের ঘরে মানুষ হতে পারিনি। তাই তো সব ছেড়ে দূরে এলাম। তা ছাড়া করারই বা কি ছিল? ইসলামের কথা বললে আব্বা ক্ষেপে যান। ইসলামের পথে চলতে গেলে বাধা দেন। বকুনি দেন অহরহ। কতদিন আর সহ্য করে থাকা যায় বল! আর এ কাজ কেন করি? এই কাজের জন্যই তো আমাদের সৃষ্টি। যেখানে লক্ষ কোটি যুবক খারাপ পথে পরিচালিত হচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে ইসলামের সুমহান আদর্শ, সেখানে আমাদের মত ছেলেদের বসে থাকার সময় কোথায়? এই বিপথগামী মানুষদের কে বাঁচাবে বল! আমাকে তাই চলে আসতে হলো সত্যের ডাকে।



www.pathagar.org

আল্লাহর দ্বীনের জন্য। আম্মা হয়তো ভেঙে পড়েছেন। আম্মাকে সালাম দিস। সব কিছু বুঝিয়ে বলিস আম্মাকে। তুই কিন্তু রীতিমতো নামাজ পড়বি। আলমিরাতে আমার যত বই আছে সব যেন তুই পড়ে ফেলিস। আমি জানি আব্বা একদিন আমাকে বুঝবেন। আর যে দিন বুঝবেন সেদি নিজেই বুকে তুলে নেবেন।

আব্বাকে সালাম দিস। আর আমার জন্য দোয়া করিস। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি তোমারই আদরের বড় ভাই।

গভীর মনোযোগ দিয়ে পুরো চিঠিটা পড়ছিলো মিনু। কখন জানি ওর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিলো। ইতোমধ্যেই চিঠিটা পানিতে ভিজে গেছে। পড়া শেষ করে চিঠিটা আর খামে পুরবার জো নেই। মিনুর খুব ফেটে যাবার উপক্রম হলো। টেবিলে মাথা রেখে সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। চিৎকার শুনে মা দৌড়ে এলেন। মা বুঝত পারলেন মিনুর কান্নার কারণ। কিন্তু তিনিই বা কি সান্ত্বনা দেবেন ওকে। কান্নায় মায়েরও বুক ভেসে যাচ্ছিল তখন। রিপনের চিঠি মিনু আর ওর মাকে যেন পাগল করে দিলো।

দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল। সাদেক সাহেব বাড়ি ফিরলেন। মিনুর মন খুব খারাপ। দরজা খুলে দিয়ে সোজা নিজের রুমে চলে এলো মিনু। মা শোবার ঘরে। টুঁ শব্দটি নেই কারো। সাদেক সাহেব সব বুঝতে পারলেন। হাত মুখ ধুয়ে সাদেক সাহেব ঢুকেন মিনুর ঘরে। মিনু! মা! তুই রাগ করিছিস কেনরে মা?

মিনু চুপ। সাদেক সাহেব ঢুকে টেনে নেন মিনুকে। আর এইতো মিনুর শুরু হলো বুকফাটা কান্না। সে কী চিৎকার! কে আর মিনুকে থামায়। সাদেক সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। ব্যাকুলভাবে অবশেষে পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

হঠাৎ তার চোখ পড়লো রিপনের টেবিলে। এ যে রিপনের চিঠি।! হাতে নিলেন তিনি চিঠিটা। আগ্রহ ভরে এক মনে চিঠি পড়লেন তিনি। চিঠির শব্দগুলো সাদেক সাহেরেব বুকের তোলপাড় সৃষ্টি করলো। ক্ষণিকের জন্য তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। সত্য সন্ধানী রিপনের সত্যপ্রিয়তা তাকে বিমোহিত করে দিলো। সহসাই যেন তিনি বুঝতে পারলেন তার ভুল। এমন সোনার ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে কি অন্যায়ই না করেছেন তিনি। নিজে নিজে লজ্জিত হলেন। লজ্জা ও বেদনায় দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে এসে মিনুর গালে পড়লো সহসা। মিনু ফিরে তাকালো আব্বার দিকে। মিনুর অশ্রুসিক্ত বড় বড় চোখের দৃষ্টি বিদ্ধ হলো তার হৃদয়ে স্থিরভাবে। কি এক অভাবনীয় দৃষ্টিতে মিনু তাকিয়ে থাকে আব্বার অশ্রুভেজা চোখের দিকে। কিছু পরে সম্বিত ফিরে পান সাদেক সাহেব।

আজই যাবোরে মিনু। আমার সোনার টুকরোকে খুঁজে আনতে আমি নিজেই যাবো। আর দেরি নয় মিনু। এক্ষুনি যাবো এক্ষুনি–

তখন গোধূলির লাল আভায় উদ্ভাসিত পৃথিবী। নয়নাভিরাম পরিবেশ। অফিসের কাপড়গুলো এখনো ছাড়েননি সাদেক সাহেব। রিপনের ঠিকানাটা বুক পকেটে গুঁজে রাস্তায় নামেন তিনি। তাকিয়ে থাকে মিনু। তার বুক থেকে বেরিয়ে আসে শান্তির দীর্ঘশ্বাস। আম্মা আনন্দে আত্মহারা। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন স্বামীর চলার পথের দিকে। সাদেক সাহেব হাঁটছেন। এদিকে নেমে আসে সন্ধ্যা। মিনারের চূড়ায় ধ্বনিতে হয় মাগরিবের আজান। অজু সেরে নামাজে দাঁড়ায় মিনু।

ঈদসংখ্যা : ডিসেম্বর, ১৯৯৯



www.pathagar.org

# মোরগ রাজা

নাসির হেলাল

www.pathagar.org

আজ থেকে বহু বছর আগের কথা। তখন এক দেশে বাস করতো এক বুদ্ধিমান মোরগ। কিন্তু মোরগটি ছিল অত্যন্ত অলস এবং স্বৈরাচরী। মোরগটি গায় গতরে ছিল বিশাল বপুর অধিকারী। সে যখন হাঁটতো, হেলে দুলে হাঁটতো। দেখেই মনে হতো কোনো রাজা বাদশাহ হেঁটে যাচ্ছে। এ জন্য পথের সবাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সালাম দিতে বাধ্য হতো। সালাম দেয়ার ধরন দেখে মোরগটি মনে মনে হাসতো– সে চিন্তা করলো কিভাবে তার প্রতি এই দুর্বলতাকে কাজে লাগানো যায়।

চিন্তার এক পর্যায়ে সে চমৎকার একটা পথ পেয়ে গেল।

আসলেই মোরগটি দেখতে খুব খাপসুরত ছিল। যেমন ছিল তার শরীরে তেল চকচকে পালক, লেজের বাহার, তেমনি ছিল মাথায় ফুল। মোরগটির মাথায় ফুল এতই লাল ছিল সে দেখলেই মন হতো আগুন। মোরগের বাড়ির পাশেই ছিল বিড়াল পল্লী। বিড়াল পল্লীর অধিবাসীদের কারো অবস্থাই তেমন ভালো ছিলো না।

বলা যায় তারা সবাই ছিল দিনমজুর শ্রেণীর। সারাদিনই তাদের পেট চালানোর কাজে ব্যয় করতে হতো। এজন্য তারা কিছুটা ভীরু প্রকৃতিরও ছিলো। মোরগ জানতো বিড়ালগুলো তার দিকে কেমন ভীরু চোখে তাকায়। চালাক মোরগ তাই একদিন বিড়াল পল্লীর সমস্ত বিড়ালকে এক জনসভায় আসার জন্য আহবান করলো। অবশ্য মোরগের আহ্বানের ধরন ছিল দাওয়াতের মতো। বেচারা গরিব বিড়ালরা কি অতবড় মোরগ রাজার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে? তাই দেখা গেল সত্যি সত্যিই বিড়ালরা নির্দিষ্ট সময়ে সমাবেশে এসে হাজির হয়েছে।

ঠিক সময়ে মোরগ বিড়াল শ্রোতাদের উদ্দেশে ভাষণ শুরু করলো–

প্রিয় বিড়াল ভাইয়েরা,

তোমরা সবাই আমার প্রতিবেশী। আমিও তোমাদের প্রতিবেশী। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের কোনো অভিভাবক ও শাসক নেই। যার জন্য আমাদের এলাকা অনেক উর্বর এবং সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও তেমন কোনো শান্তি নেই। তাই আমাদের উচিত একজন নেতা নির্বাচন করা। যার হুকুমে আমরা সবাই চলবো। তোমরা কী বলো?

উত্তরে সবাই একবাক্যে বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন মোরগ রাজ। আমরা আপনাকেই আমাদের রাজা নির্বাচন করলাম। আপনিই আমাদের নির্বাচিত নেতা।

বিনীতভাবে মোরগ বললো, এ তোমরা কি বলো! আমি কি তোমাদের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখি?

সমবেত বিড়ালরা উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করে বললো, না না আপনার কোনো ওজোর আপত্তিই শুনবো না, আপনিই আমাদের নেতা।

অযোগ্য মোরগ আর কি করে বিড়ালেদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। সাথে সাথে বিড়ালদের কাছ থেকেও ওয়াদা নিল যে, তারা প্রতিদিন মোরগকে পর্যাপ্ত পরিমাণে



www.pathagar.org

উঁইপোকা সরবরাহ করবে। কারণ খাদ্য হিসাবে উঁই মোরগের খুবই প্রিয়। তাছাড়া হাজার হলেও নেতার পছন্দ। নেতা তো আর নিজে নিজে উঁই ধরে খেতে পারেন না? তাতে কি দেশের মান থাকে! যেহেতু দেশ বলে কথা– তাই বিড়ালরা একবাক্যে এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে শ্লোগান উঠলো– মোরগ রাজা জিন্দাবাদ, আমাদের নেতা জিন্দাবাদ।

মোরগ যা চেয়েছিলো তা কড়ায়গন্ডায় পেয়ে গেল। অতএব মোরগের আনন্দ দেখে কে! নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর তাই মোরগ নিজের জন্য কারুকার্যখচিত বিশাল এক হুইল চেয়ার তৈরি কর নিল। ঐ চেয়ারে বসেই সে বিড়ালদের ওপর তার কর্তৃত্ব খাটাতে লাগলো। প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ উঁইপোকা তার জন্য উপঢৌকন দিতে লাগলো। প্রতিদিন অত উঁইপোকা ধরার ফলে এক সময়ে রাজ্য প্রায় উঁইশূন্য হয়ে যাবার উপক্রম হলো। যার জন্য বিড়ালরাও পর্যাপ্ত পরিমাণ উঁই সরবরাহ করতে হিমশিম খেতে লাগলো। মানে উঁই ধরতেই তাদের সারা দিন চলে যায়, নিজেদের খাবার জোগাড় করার সময় হয়ে ওঠে না।

বিষয়টি বিচক্ষণ মোরগ ঠিকই বুঝতে পারলো। কিন্তু তার কি করার আছে!

এতদিনকার আয়েশি শরীর। তার ওপর বসে বসে খাবার ফলে ভুঁড়িটাও দিন দিন বিশাল আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় তার পক্ষে কি আদৌ চাষাভূষা বা দিনমজুরদের মত মাঠে ময়দানে গিয়ে উঁই ধরে খাওয়া সম্ভব? তাই সে নীলকরদের মত রাজ্যে ঘোষণা করে দিল, যেভাবেই হোক উঁই আমার চা-ই। প্রজারা কিভাবে উঁই ধরবে এটা রাজার দেখার বিষয় নয়। শেষে মোরগ বিড়ালদেরকে এই বলে ভয় দেখালো যে যদি উঁই আনতে গড়িমসি করা হয় তো আমার মাথায় (ফুল দেখিয়ে) যে আগুন দেখছো এই আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে ফেলবো। একজনকেও বাঁচতে দেব না।

আর যায় কোথায়! বাধ্য হয়েই বিড়ালরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে উঁই সরবরাহ করতে লাগলো। ফলে বিড়াল রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হাহাকার উঠলো ঘরে ঘরে। ইতোমধ্যে ঘটলো এক চমৎকার ঘটনা। এক মা বিড়াল তার বাচ্চাদের জন্য রান্না করতে গিয়ে দেখলো চুলোয় আগুন নেই। তখন মা বিড়ালটির মনে পড়লো মোরগের কথা। সে তাড়াতাড়ি তার একটি বাচ্চাকে কিছু পাটকাঠি দিয়ে মোরগের বাড়ি পাঠালো আগুন আনবার জন্য। বাচ্চা বিড়ালটি মোরগ রাজার বাড়ি গিয়ে দেখলো মোরগ রাজা চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আর তার বিশাল পেটটি ওঠানামা করছে। মোরগকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে ডাকতে বাচ্চা বিড়ালটির সাহস হলো না। কিন্তু তার মাথায় খেলে গেলো এক দুষ্ট বুদ্ধি। সে করলো কি, মোরগ রাজা যেখানে ঘুমাচ্ছিলো চুপি চুপি সেই



www.pathagar.org

কাছের জানালার ধারে গেল এবং অতি সাবধানে পাটকাঠি মোরগের মাথার ফুলে ছোঁয়ালো। কিন্তু এ কি! আগুন ধরা তো দূরের কথা, একটু ধোঁয়াও তো ওড়ে না! বাচ্চা বিড়ালটি সেখানে আর অপেক্ষা না করে দ্রুত মা বিড়ালটির কাছে এসে সব কিছু খুলে বললো।

মা বিড়াল কিন্তু বাচ্চাকে মোটেই আমল দিল না। বরং চটে গিয়ে বললো না বাপু, তোদের দিয়ে কিচ্ছুটি হবার যো নেই। আমি না থাকলে তোদের যে কি দশা হয়! এই বলে মা বিড়াল নিজেই আগুন আনার জন্য মোরগ রাজার বাড়ি গেল এবং দেখলো সত্যি সত্যিই মোরগ ঘুমে কাতর। আর তার জালার মত পেটটি ওঠানামা করছে। এ দৃশ্য দেখার পর মা বিড়ালটি সন্দিহান না হয়ে পারলো না। তবুও সে পরীক্ষা করার জন্য পা টিপে টিপে জানালার কাছে গেল এবং মোরগের মাথায় আগুনের মত লাল ফুলটিতে পাটকাঠি ছোঁয়ালো। কিন্তু না! সত্যি সত্যিই আগুন ধরলো না। বয়সী মা বিড়ালটি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললো মোরগের চালাকি।

মা বিড়াল বাড়ি ফিরে রাষ্ট্র করে দিল মোরগের চালাকির কথা। আর যায় কোথায়– কি ভীরু বিড়ালরাও চোখ মেলে তাকালো। অত্যাচারী মোরগ রাজার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুললো–

অত্যাচারী মোরগ রাজা নিপাত যাও, ধ্বংস হও।

মিথ্যবাদী মোরগ রাজা ধ্বংস হও, নিপাত যাও।

মোরগ রাজার কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।

শ্লোগানের আওয়াজে মোরগের ঘুম ভাঙলে সে আড়মোড়া কাটতে কাটতে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে বেরিয়েই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল– এ কি! হাজার হাজর বিড়াল প্লাকার্ড, ব্যানার এবং শ্লোগান সহকারে মিছিল নিয়ে তার বাড়ির দিকেই আসছে। শ্লোগানের ধরন শুনেই মোরগ বুঝলো তার জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে গেছে। মোরগ জান বাঁচানোর জন্য উড়াল দিয়ে একটি উঁচু গাছে চড়ে বসলো। সাথে সাথে সে দেখলো তার সাধের রাজপ্রাসাদ, বাসাবাড়ি সববকিছু বিড়ালরা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে।

মোরগ জানে বেঁচে গেলেও আর বিড়াল রাজ্যে আসতে পারলো না। ফলে বিড়াল রাজ্যে শান্তি ফিরে এলো। সব বিড়ালই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো।

জানুয়ারি, ২০০০



www.pathagar.org

# ফুলের চোখে পানি

শাহ আলম বাদশা

www.pathagar.org

## আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি

আজ খুব খুশি মনেই বাড়ির পথে পা বাড়ায় সানিন। একে তো বছরের প্রথম দিকটায় স্কুলে লেখাপড়ার চাপ কম, তার ওপর সকাল সকাল ছুটি হলেই হলো। ওর ধেই ধেই আনন্দ আর দেখে কে? খুদে সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে খেলাধুলা আর হৈ-হুল্লোড়ের অবাধ সুযোগ পেয়ে বছরে শুরুটা বেশ ফুর্তিতেই কাটে।

আগামীকাল আবার একুশে ফেব্রুয়ারি শুনে ওর আনন্দ যেন ধরেই না। যাকে বলে খুশিতে বাগ বাগ অবস্থা আর কি। সত্যি, ফেব্রুয়ারি মাসের কুড়িটা দিন যে কখন কিভাবে কেটে গেল, টেরই পায়নি সে। ওর মনে হচ্ছে, কুড়ি দিন যেন কয় দিনেই কেটে গেল! হেড স্যারের নোটিশটা না শুনলে তো এতবড় আনন্দটা মাটিই হয়ে যেত, ধেৎ নিজেকে নিজে ধিক্কার দেয় সানিন। অথচ একুশকে নিয়ে এবারও কত না প্লান পরিকল্পনা! কিন্তু ওর আব্বু-আম্মু কোনদিন ওকে শহীদ মিনারে যেতে দেয় না এমনকি নিয়েও যায় না। গতবার কত্ত বায়না ধরেছে তবুও যেতে পারেনি। আব্বুর এক কথা আমি নাকি খুব ছোট্ট। থ্রিতে উঠলাম তবুও? দুর ছাই! আব্বু-আম্মুটা যে কী না! সহসা অভিমান জাগে ওর। ওদের স্কুলের কত ছাত্রছাত্রীই তো শহীদ মিনারে যায়, ফুল দেয়, এমনকি ওর ক্লাসের কেয়া, সাদিয়ারাও বড় ভাইবোনদের সাথে যায়। ইস আমারও কি যেতে মন চায় না?

আম্মুটা আবার বলে সে নাকি ভিড়ে হারিয়ে যাবে। সত্যি, ওর যদি কেয়াদের মত একটা বড় ভাইয়া থাকতো, কত না মজা হতো। সেও ওদের মতো শহীদ মিনারে যেতে পারতো, হারিয়ে যাবার ভয়ও থাকতো না। দুঃখে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ওর। তবে একটা ব্যাপার সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, ওর আব্বু আম্মুর মত স্যারেরা ওসব কথা বলেন না কেন? আসলে ওর ভীষণ সাধ শহীদ মিনারে যাবেই সে একবার। না হয় কাল সকালে স্যারদের সাথে যাবে! কিন্তু আব্বু আম্মু যেতে দেবে তো? ভেবে পরক্ষণে চুপসে যায়। আব্বু-আম্মুকে অবশ্য অত্যন্ত ভালোবাসে সে, তাই অবাধ্যও হতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে এক আধটু জিদ ধরে এই যা। ধরবে নাকি এবারও একটা জিদ এমন সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই একেবারে বাসার সামনে এসে হাজির হয়। অতঃপর সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে দোতলায় উঠে যায় এবং বইয়ের ব্যাগটা বিছানার ওপর ধপ করে ছুড়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়ে একটা। ওর আওয়াজ পেয়ে রান্নাঘর থেকে হেঁকে ওঠেন আম্মু মামনি, আজ এতো সকালে এলে যে?

: কাল একুশে ফেব্রুয়ারি তো, তাই আগেই ছুটি দিল, আম্মু, রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে আনন্দ বার্তাটা জানায় তাকে।

ওহ তাইতো হাসিমুখে কথাটা বলেই পরে কি ভেবে হঠাৎ দমে যান তিনি।

: আম্মু কালকে আমিও যাবো, শহীদ মিনারে ফুল দেবো। রান্নারত আম্মুর কোমর



www.pathagar.org

জড়িয়ে ধরে আবদার জানায় সানিন, জানো আম্মু স্যাররা সকালে সবাইকে স্কুলে ডেকেছেন। আমিও যাবো আম্মু।

ওর আম্মু সহসা কোনো জবাব দিতে পারেন না। তিনি ভাল করে জানেন, অত্যন্ত প্রিয় সন্তানকে ওর আব্বু কিছুতেই শহীদ মিনারে যেতে দেবেন না। যদিও বাসা থেকে তা খুব নিকটেই। সানিনের স্কুলের মত শহীদ মিনারও তাদের দোতলায় ছাদ থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। আসলে শহীদ মিনারের মত এলাকায় ইতঃপূর্বেকার একাধিক সংঘটিত সন্ত্রাস ও মারামারির ঘটনায় সানিনের আব্বু আলম সাহেব এখনো রীতিমতো উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। ওখানে যাবার আগ্রহটা তাই বহুদিন থেকে দমিয়ে রেখে আজকাল ছাদ থেকেই দেখেন শহীদ মিনারে দৃশ্য। হয়তো এবার সানিনের বায়না শুনলে ওকে আদর সোহাগে ভুলিয়ে ভালিয়ে ছাদে নিয়ে গিয়ে শহীদ মিনারের দৃশ্যগুলো দেখাতে ব্যস্ত হবেন। তবুও নিয়ে যাবেন না, কারো সাথে যেতেও দেবেন না। ছাদ থেকেই মিছিল, শ্লোগান, হট্টগোল, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ইত্যাদির একেকটা ব্যাখ্যা শুনিয়ে শুনিয়ে ওকে ব্যস্ত রাখবেন। সানিন হয়তো প্রশ্ন করবে, এত ফুল কোথায় পায় আব্বু?

: কেন, বাগান থেকে ছিঁড়ে আনে। একগাল হেসে জবাব দেবেন।

: ওখানে ফুল কেন দেয়?

আলম সাহেব এতটুকুন মেয়ের প্রশ্নের জুতসই কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে হয়তো সহজবোধ্য উত্তরের চিন্তায় গলদঘর্ম হবেন। হঠাৎ মেয়ে আবার তাড়া দেবে– কেন ফুল দেয় আব্বু, বলো অ-না? শহীদ, শহীদ মিনার, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা এবং মেয়ের জন্য দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যার ভয়ে হয়তো আমতা আমতা করে বলে বনবেন– শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, মামণি। এরপরও সমস্যা আছে, শ্রদ্ধা কী, কাকে শ্রদ্ধা, কেন শ্রদ্ধা এসব প্রশ্নও আসা স্বাভাবিক। তাই হয়তো, ঐ দেখো, ঐ দেখো কত মানুষ, মামনি... ইত্যাকার বলে বলে ওর চিন্তার মোড় ঘুরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সানিনের আবদারের জবাব না দিয়ে ওর আম্মু কিন্তু একটু হেসে আবার রান্নার কাজে মনোযোগ দেন। এদিকে জোহরের সময় হয়ে গেছে প্রায়। ওর আব্বু অফিস থেকে লাঞ্চের জন্য এক্ষুনি এসে পড়বেন হয়তো। তিনি আবার বিলম্বে অফিসে যাওয়ার ঘোর বিরোধী। তাই রান্নার এত তাড়া। জবাব না পেয়ে সানিন আম্মুর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে এবার, কাল কিন্তু যাবো আম্মু, আব্বুকে একটু বলো না?

: এই যে মামনি, আব্বুকে কি বলতে হবে অ্যা– আলম সাহেব সেই মুহূর্তে অফিস থেকে ফেরেন এবং হঠাৎ মেয়ের কথা কানে যেতেই হাসতে হাসতে দরজার কাছে এসে দাঁড়ান।

: কী আর, তোমার মেয়ে কাল শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাবে, ওর আম্মু মেয়ের হয়ে জবাব দেন। সর্বনাশ! তাই নাকি মামনি, রান্নাঘরে ঢুকে মেয়েকে ছোঁ মেরে কোলে



www.pathagar.org

তুলে নিয়ে জোরে হাসতে হাসতে বাইরে আসেন তিনি।
তুমি যে একটা ছোট্ট মামনি, ওর চিবুক ধরে চুমু খান।
: না আব্বু আমি যাবো। এই তো আমি তোমার মত বড় হয়েছি– কোলে থেকেই নিজের মাথাটা আব্বুর মাথার কাছে এনে এক সমান করার চেষ্টা করে সানিন। তিনি মেয়ের কা- দেখে ফিক করে হেসে ফেলেন– দুর পাগলী, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি ছোট্ট নও, অনেক বড়। তিনি জানেন এর চিন্তার মোড় ঘুরাতে না পারলে বিপদ! জিদ ধরলে কান্নাকাটি জুড়ে দেবেই। তাই মোক্ষম একটা টোপ ফেলে দেন, মামনি, চলো আজ চিড়িয়াখানায় যাবো। কত্ত বাঘ, ভল্লুক, পাখি দেখবে ওখানে।
: কখন যাবে আববু, চলো না এক্ষুনি। ওষুধে কাজ হয়েছে দেখে খুশি হন তিনি।
: হ্যাঁ হ্যাঁ, খেয়ে দেয়ে রেডিও হও। এক্ষুনি বেরুবো...।
চিড়িয়াখানায় পশু পাখি, ফুল
সমস্ত চিড়িয়াখানা ঘুরতে ঘুরতে একদম বিকেল। হরেক রকম পশু পাখির বিচিত্র দৃশ্য দেখে সানিন আনন্দে একেবারে আত্মহারা। বানরদের মজার অঙ্গভঙ্গিতেই আসলে ওকে বেশি আনন্দে দেয়। তাই অনবরত এটা কি, ওটা কি ইত্যাকার প্রশ্নে সে আব্বুকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মেয়েকে নিয়ে ওর আব্বু এবার ঢোকেন বোটানিক্যাল গার্ডেনে। চারিদিকে সবুজের ছড়াছড়ি আর অসংখ্য ফুলের দৃশ্য দেখে তিনি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানান মনে মনে। কিন্তু পর মুহূর্তে পড়ে যান মহা ফ্যাসাদে। আব্বু, ফুল ছিঁড়ব, গাছে গাছে নানা রঙের ফুল দেখে লাফ দিয়ে ওঠে সানিন। আবার ওর শহীদ মিনারের ঝোঁকটা জাগে কি না, ভেবে রীতিমত ঘেমে ওঠেন তিনি।
: না মামনি, ফুল ছিঁড়লে লোকে মারবে। কৌশলে ওকে ফুল ছেঁড়া থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, ফুল ছেঁড়া একদম ভালো নয় বুঝলে– চিবুক ধরে নাড়া দেন ওর।
: হাতের ইলাপারা যে ফুল ছিঁড়ে শহীদ মিনারে দেয়? ওদের কেউ মারে না কেন আব্বু? মেয়ের মুখে শহীদ মিনারের নাম শুনে এবার আঁতকে না উঠে উপায় থাকে না।
শহীদ মিনারের চিন্তাটাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই তো আজ অফিস থেকে ছুটি নিয়ে চিড়িয়াখানায় এসেছেন। মেয়ের মুখে কিনা আবার সেই কথা, রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে যান তিনি।
: ওরা যে চুরি করে ফুল ছিঁড়ে, মামনি? কেউ ওদের দেখতে পায় না তো তাই মারে না। অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলেন আলম সাহেব, দেখতে পেলে ওদেরও মারবে, বুঝেছ?
: আমিও চুরি করবো– বলেই সে আব্বুর কোল থেকে লাফিয়ে একটা গাছের দিকে হাত বাড়ায়।
: ছিঃ ছিঃ মামনি চুরি করে না, পাপ হয়। ফুলের নাগাল পাবার আগেই তিনি ওকে ঝট



www.pathagar.org

করে এবং রীতিমতো ধমক মারেন– খবরদার ফুল ছিঁড়ো না, লোকে মারবে। সানিন ওর আব্বুর এমন আচরণে একদম থতমত খেয়ে যায়। মনটাও খারাপ হয়ে যায় ওর। আলম সাহেবের এটাই একটা দোষ। আর যাহোক ফুল ছেঁড়াটা তার আদৌ সহ্য হয় না। প্রাণাধিক মেয়ের ব্যাপারেও এক্ষেত্রে নমনীয়তা নেই তার। সানিনের আম্মুর সাথে এ জন্যই তার একটা মতভেদ চলে আসছে। এমনকি বাড়িতে টবে লাগানো ফুলগুলোও তিনি মেয়ের নাগালের বাইরে রেখেছেন বিশেষ ব্যবস্থায়। ফলে ফুল ছেঁড়ারও সাধ্য নেই মেয়ের। অনেক সময় টবের মাত্র একটা ফুলের জন্য মেয়ে কেঁদেকেটে সারা হলেও মন গলে না তার। ফলে সানিনের আম্মুও কখনো ফুল ছিঁড়ে দিয়ে মেয়েকে থামানোর সাহস পায় না। মেয়ে অবশ্য বয়সের কারণে বাপের এমন কঠোরতার রহস্য কিছু বুঝে উঠতে পারে না। শত আবদার বায়না ও কান্নাকাটির পরও যখন সে একটা ফুল না পেয়ে এমনিতে নেতিয়ে পড়ে শান্ত হয় তখন আব্বুর নিষ্ঠুরতার কথাটা ভেবে ওকে শুধু হতবাকই হতে হয়। এরপর রাগে অভিমানে আব্বুর সাথে সেদিন হয়তো কথা বলে না কিংবা জিদ করে ঠিকমতো খায়ও না। তবুও ওর প্রিয় আব্বুর মন পর্যন্ত গলে না, এমনিই দেখে আসছে বরাবর। তাই তো এখন সেও আর টবের ফুলের জন্য কক্ষনো বায়না ধরে না। কিন্তু আব্বার এখনকার ব্যবহারটা সে কিভাবে নেবে? আজ তো সে টবের ফুল চায়নি? তবু ফুল ছিঁড়তে দিলেন না? ওর কচি বুকটা বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে। এখন চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে কিন্তু আশপাশের অপরিচিত লোকের কারণে লজ্জায় পারে না। সুতরাং আব্বুর সাথে আর কথাই বলবে না ভেবে মুখটা কালো করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

আলম সাহেব অবশ্য ব্যাপারটা টের পান। কিন্তু কিইবা লাভ তাতে, তিনি মেয়েকে তো আর ফুল ছিঁড়ে দিতে পারছেন না। আসলে কেন যেন ফুল ছেঁড়ার নামটাও তার সহ্য হয় না! সানিনের আম্মুর সাথে এ ব্যাপারে অনেকবার তার মান অভিমান শুধু নয়, রীতিমতো ঝগড়াঝাটি পর্যন্ত হয়ে গেছে। তার কথা, ফুলের যত শোভা সৌন্দর্য সব তার গাছেই। ফুল ছিঁড়লে যেমন সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় তেমনি কতগুলো নিষ্পাপ জীবনেরও পতন ঘটে অকালে। ফুল ছেঁড়াটা তার কাছে তাই দারুণ অমানবিক ও অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার বলে মনে হয়। মেয়েকে শহীদ মিনারে না নিয়ে যাবার এটাও একটা কারণ বৈকি। তাই তো প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি অসংখ্য ফুলের মৃত্যু দেখে তিনি ভীষণ অস্থির হয়ে যান। আর ভারাক্রান্ত মনে ভাবেন, কেন, ফুলগুলো ধ্বংস না করেও কি শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যায় না? তারা তো আর ফুলের জন্য মরেননি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া কোটি কোটি ফুলের ছড়াছড়িতে মহান শহীদদের আত্মাই বা কিভাবে শান্তি পায় তা-ও তার জানা নেই। তার মতে, শহীদরা এখন পরকালের অদৃশ্য জগতে আছেন, সেখানে দোয়া আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছুই পৌঁছে না। সৌন্দর্যের



www.pathagar.org

প্রতীক পবিত্র ফুলগুলো তো সেখানে কোনোদিনই পৌঁছে না বরং শহীদ মিনারে অনাদরে অবহেলায় পচে গলে নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে এত সুন্দর ও জীবন্ত ফুলগুলো ধ্বংসের আনুষ্ঠানিকতা করে কিইবা লাভ?

গত বছর সানিনের আম্মা জিজ্ঞেস করেছিল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে দোষের কী আছে?

: দোষের কিছু নেই বরং বেশি বেশিই শ্রদ্ধা জানানো কর্তব্য। আলম সাহেব হেসে জবাব দেন, কিন্তু শ্রদ্ধার নামে ফুল ধ্বংসের আনুষ্ঠানিকতা আর অর্থ অপচয়ের আমি ঘোর বিরোধী।

: তাহলে তোমার মতে কিভাবে শ্রদ্ধা জানানো উচিত?

: একদম সোজা ব্যাপার, তিনি মওকা বুঝে তার থিওরি ঝাড়েন। আসল কথা হলো, শহীদরা জান দিলেন ভাষার জন্য অথচ সেই ভাষাই এখনো সর্বত্র চালু হয়নি। সুতরাং তা সর্বক্ষেত্রে চালুর চেষ্টা করাই তো আসল শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ আর এভাবে বছরে একবার শুধু ফুল নিয়ে হইচই আনুষ্ঠানিকতাই বা কেন? তাদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য বরং সব সময় দোয়া করতে হবে যাতে করে তারা চির শান্তির বেহেস্ত পেয়ে ধন্য হন।

: তুমি বলছো, শহীদ দিবস পালনের কোনো দরকার নেই?

: আরে, না-না শহীদ দিবস অবশ্যই পালন করতে হবে, কিন্তু এভাবে নয়।

জাপানের লোকেরা যেমন নাগাসাকি হিরোসিমা দিবসে এটম বোমা নিক্ষেপের মুহূর্তটি আসা মাত্রই যে যেখানে যে কাজে, যে অবস্থাতেই আছে, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে শোক পালন করে এবং শ্রদ্ধা জানায়, তেমনিভাবে আমাদেরও আমাদের মত করে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। এভাবে লাখ লাখ ফুলের জীবন বিনষ্টের কি দরকার?

সানিনের আম্মু তার যুক্তি ও মানসিকতা আঁচ করতে পেরে আর কোনো কথাই বাড়াননি। সেদিন থেকে কেন যেন স্বামীর ওপর তার শ্রদ্ধাটাও বেড়ে যায়। তাই তখন একমত হতে না পারলেও তার মতামতকে তিনি বেশ শ্রদ্ধা করেন আর আলম সাহেব যে যাই বলুক না কেন নিজের মতেই অটল। ফুল প্রসঙ্গে তার মনে অবশ্য আরেকরটা প্রচ- ক্ষোভ রয়েছে। তা হলো গাছের জীবন আছে, অনুভূতি আছে এ সত্যের আবিষ্কারক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর কট্টর সমর্থক ও প্রচ- ফুলপ্রেমিক হিসেবে তিনি বছর পাঁচেক পূর্বে দোতলার গ্রাউন্ডে প্রবেশ পথের ধারে মনোরম একটা ফুলবাগান করেছিলেন। সেই বাগানের আকর্ষণীয় ছবি সংগ্রহের জন্য অনেক বিদেশী ভ্রমণকারী পর্যন্ত আসতো। তিনি ফুল ছিঁড়তে না দিলেও নারী-পুরুষ সকলকে অবাধে ছবি তুলতে দিয়ে গর্ববোধ করতেন। অথচ পর পর দু'বার একুশে ফেব্রুয়ারির রাতে সেই



www.pathagar.org

মনোমুগ্ধকর ফুলগুলো একদম সাবাড় করে দিয়ে তার প্রিয় বাগানটাকে তছনছ করে ফেলা হয়। এ ঘটনায় দু'বারই তিনি ক্ষোভে দুঃখে চোখের পানি পর্যন্ত ফেলেন। আর ঠিক তখন থেকে মাটিতে ফুলের বাগান করা ছেড়ে দিয়ে দোতলায় টবের ফুলগাছ লাগাতে শুরু করেন।

মেয়েকে মুখ কালো করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আলম সাহেব সত্যি এবার ঘাবড়ে যান। নিজের কঠোর আচরণটার জন্য লজ্জিতও হন মনে মনে। পরক্ষণে মেয়ের প্রতি তার গভীর ভালোবাসাই প্রবল বেগে উথলে উঠে। ফলে সব ভুলে গিয়ে ওর মান ভাঙাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হাসি মুখে আবার কোলে তুলে নেন ওকে। ওর গম্ভীর মুখে হাসি ফোটাবার আশায় আদর করতে থাকেন, দেখো মামনি, কত্ত সুন্দর সুন্দর ফুল, তাই না? কিন্তু সানিনের কোন সাড়া না পেয়ে বেশ বেকায়দায় পড়ে যান বেচারা। তা কী ভেবে নিয়ে আবারও বলেন, মামনি, কোন ফুলটা নিতে চাও বলোতো?

তিনি জানেন, ফুলের প্রসঙ্গ ছাড়া এ মুহূর্তে অন্য কিছুতেই ওকে সহজ করা যাবে না, তাই এ কৌশল আর কি? কিন্তু নিষ্ঠুর আব্বার মুখে হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত কথাবার্তা শুনে যেমন সে বিস্মিত হয় তেমনি দ্বন্দ্বেও পড়ে যায়। অবশ্য ওর মনে একটু খুশির ঝিলিকও ফুটে ওঠে, তাহলে আব্বু কি সত্যি সত্যিই ফুল ছিঁড়তে দেবে? কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে বিস্মিত চোখ শুধু আব্বুর মুখের দিকে তাকায় কয়েকবার। আলম সাহেবও কিছুটা আশান্বিত হয়ে একটা ডালিয়ার ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

: তুমি ফুল খুউব ভালোবাস, তাই না মামনি, ওর গালে আলতো করে চুমু দেন। ওকে আরেকটু স্বাভাবিক করার আশায় গালে মৃদু টোকা মারেন একটা, ফুল ছিঁড়তে কি খুব ভাল লাগে মামনি? কথা বলো, সত্যি আর রাগ করবো না বলছি ...।

এতক্ষণে চঞ্চলতা ফিরে আসে সানিনের মধ্যে। মুখেও খুশির ভাব ফোটে কিছুটা, কিন্তু কথা বলে না। আব্বু রহস্য করছে নাকি সত্যিই বলছে ঠাওর করতে না পেরে একবার ফুলগুলোর দিকে আরেক বার ওর আব্বুর দিকে তাকাতে থাকে। তিনি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে মেয়ের নাকে নিজের নাকটা ঠেকিয়ে অদ্ভুত এক রহস্য করেন কি গো মেয়ে, কথা বলবে না বুঝি?

হ্যাঁ তুমি যে ফুল ছিঁড়তে দাও না, না হেসে গম্ভীর মুখেই জবাব দেয় সানিন। তাই দেখে হো হো করে হেসে ওঠেন ওর আব্বু। সঙ্গে সঙ্গে সেও জোরে হেসে ফেলে আব্বুর গলা জড়িয়ে ধরে।

**গাছেরও জীবন আছে**

মেয়ের অভিমান ভাঙাতে পেরে মনটা হালকা হয় আলম সাহেবের। কি ভেবে সূর্যের দিকে বার কয়েক তাকিয়ে সামনের দিকে হাঁটা দেন তিনি। সানিন আবারও হরেক রকম প্রশ্ন জুড়ে দেয়। তিনিও সাধ্যমত হুঁ হুঁ করে যেতে থাকেন।



www.pathagar.org

: এই যে দুষ্টু মেয়ে, তোমাকে একটু চিমটি দিই, দেখো তো ব্যথা পাও কিনা– বলেই তিনি হঠাৎ করে মেয়ের ঘাড়ে একটা চিমটি কেটে বসেন। কিন্তু কাতুকুতু পেয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে সে।

: চিমটিটা লেগেছে মামনি? ওর থুতনি ধরে আদর করে শুধান।

: হ্যাঁ- তো, একটা লাজুক হাসি ছড়িয়ে দেয় সে।

: তাহলে শোন মেয়ে, ফুল ছিঁড়লে ফুলদেরও খুব ব্যাথা লাগে, তা জানো?

: সত্যি আব্বু? সানিন আকাশ থেকে পড়ে যেন এমনভাবে তাকায় আব্বুর দিকে।

: হ্যাঁ মামুনি, একদম সত্যি কথা। গাছেরও যে আমাদের মত জীবন আছে। মেয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরে খুশি মনে স্যার জগদীস চন্দ্রের থিওরি বুঝাতে শুরু করলেন, ডাল ভাঙ্গলে, পাতা ও ফুল ছিঁড়লে গাছেরা ব্যাথা পায়, কাঁদে বুঝলে?

: ফুলেরাও কাঁদে আব্বু? দারুণ বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন ছোড়ে সে।

: হ্যাঁ, হ্যাঁ কাঁদে। কিন্তু আমরা শুনতে পায়নে....

: কেন শুনতে পাই না আব্বু?

এ প্রশ্নের কোন সহজবোধ্য উত্তর খুঁজে পান না তিনি। কি বুঝ দেবেন ভেবে ভেবে একদম হয়রান হয়ে যান। মেয়ের তাগাদায় হঠাৎ চমক ভাঙে তার, ফুলেরা কাঁদলে শুনতে পাই না কেন, বলো -অ-না....

: ওরা ব্যাথা পায়, কাঁদে ঠিকই কিন্তু কানে শোনা যায় না, মামনি। সঠিক জবাব দিতে না পেরে মেয়ের পরবর্তী প্রশ্নের ঝামেলা থেকে বাঁচার আশায় তিনি আবার ওকে মাটিতে নামিয়ে দেন, আচ্ছা এবার আমার সাথে একটু হাঁটো দেখি...

আব্বুর কনিষ্ঠ আংগুল ধরে পা পা করে হাঁটতে থাকে সানিন। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা না বলে চুপচাপ হাঁটে। আব্বুর কথাগুলো ওর অন্তরে কিন্তু ভীষণ দাগ কাটে। ফলে কচি মনটায় দারুণ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভেবে সে কোন কূল-কিনারাই খুঁজে পায় না এসবের। গাছেরও জীবন আছে, ব্যাথা পায়, ফুলরাও কাঁদে কিন্তু শোনা যায় না- এ যেন ওর কাছে রূপকথা। সুতরাং আব্বুর কথাগুলো বোধগম্য না হওয়ায় আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা, ওরাও কি আমাদের মত খায়, খেলে?

: ওরা আমাদের মত খাবে কেন। দেখো না ফুলের টবে আমি পানি দেই, তবেই ওরা পানি চুষে খেয়ে বাঁচে, বড় হয়। আমাদের টবের ফুলগুলোও তো ছোট থেকে বড় হচ্ছে, দেখো না?

আব্বুর কথায় এবার মাথা দুলিয়ে সায় দেয় সে। হ্যাঁ ওর মনে পড়ে, সত্যিই তো ওদের টবের গাছগুলো খুব ছোট ছিল। এখন অনেক বড় হয়েছে এবং কত্ত ফুল ধরেছে ওতে। তবুও কৌতূহল দমাতে না পেরে প্রশ্ন করে, ওরাও কি আমার মতো খেলে, বলো-আ:...না?



www.pathagar.org

: হ্যাঁ, মামনি ওরাও খেলে। দেখো না গাছেরা সব সময় কেমন নড়াচড়া করে আর ফুলেরা হেলে দুলে নাচে? এই তো ওদের খেলা। প্রশ্নোত্তর দিতে দিতে ক্লান্তিবোধ করেন আলম সাহেব। প্রশ্ন করাই ওর বৈশিষ্ট্য বিধায় ক্লান্ত হলেও বিরক্ত হন না তিনি। প্রথম প্রথম হতেন, এখন অবশ্য স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ব্যাপারটা মানিয়ে নিয়েছে।

ইতিমধ্যে অনেক সময় কেটে যায়। আছরের আযানও কখন শেষ হয়েছে। নামাযের কথা স্মরণ হওয়ায় সানিনকে কোলে তুলে নিয়ে চিড়িয়াখানার লেকের দিকে হাঁটা দেন। লেকে শীতের অসংখ্য অতিথি পাখি দেখে বেশ চমৎকৃত হন তিনি। তাই খুশিতে সেদিকে মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালান, দেখো দেখো কত্ত বড় পাখি.....। কিন্তু সানিনের কোন মনযোগ না দেখে দমে যান কিছুটা। আর বেশি কথা না বলে ওকে ঘাসের ওপর দাঁড় করিয়ে তিনি লেকের পানিতে দ্রুত ওজুটা সের নেন এবং একটু দাঁড়াও তো মামনি, নামাজটা পড়ে নিই বরে ঘাসের ওপরই নামাজ পড়ে নেন। লেকের পানিতে কত বিচিত্র রঙের অতিথি পাখির অবাধ বিচরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান আলম সাহেব। সাদা মতন একটা পাখির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে তিনি ফের মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, দেখছো কত বড় ঠোঁট পাখিটার ? কিন্তু ওর মনোযোগে যতটা না পাখির দিকে আরও বেশি লেকের ধারে ফুটন্ত ক্ষুদে লাল নীল নাম না জানা ফুলগুলোর দিকে। ফলে আব্বুর কথায় কান না দিয়ে সে আনমনেই জিজ্ঞেস করে আব্বু, ঐ ফুলগুলোও কি ব্যাথা পায়, কাঁদে?

: হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাথা পায়, কাঁদে। তাই কক্ষনো তুমি ফুল ছিড়ো না কিন্তু। কি ছিঁড়বে নাকি? একথার কোন জবাব দেয় না সে। কারণ ফুল ওর খুবই প্রিয়। আর সুন্দর ফুল দেখলেই সে ছিঁড়তে ব্যাকুল হয়। ছিঁড়ে হাতে নিতেই ওর বেশি আনন্দ॥ অথচ আব্বু ওর মনের ভেতর বিরাট এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছ। তাহলে সে কি আর ফুল ছিঁড়বে না? ওর বান্ধবী কেয়াদের বাসায় গেল তো তার আপু ওকে ফুল ছিঁড়ে দেয়। কখনো কখনো সে নিজেও ছেঁড়ে, ডাল ভাঙে। কিন্তু ফুলরা নাকি কষ্ট পায় , কাঁদে। তাহলে তো ফূলদের সে অনেক কষ্ট দিয়েছে এতদিন ভাবনাগুলো ওর তালগোল পাকিয়ে দেয়।

: আচ্ছা আব্বু ফুল ছিঁড়লে কষ্ট ছাড়া আর কি হয় ওদের, গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করে সানিন।

: কেন মামনি, আমাদের মতো মরে যায়! এ কথায় ওর চোখেমুখে চরম বিস্ময় লক্ষ্য করে তিন আবার বলেন, ফুল ছিঁড়লে ব্যথায় কেঁদে কুটে শুকিয়ে ওরা একেবারে মরে যায়, বুঝেছো?

: কেমন করে মরে আব্বু? সানিনের চোখে মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটে ওঠে।

: কেমন করে? দেখবে এসো, বলে ওকে কোলে নিয়ে বেশ কিছু ফূল গাছের কাছে



www.pathagar.org

এগিয়ে যান এবং তীক্ষ্ণ চোখে কি যেন খুঁজতে থাকেন। কেমন করে মরে, বললে, না আব্বু? ওর একই প্রশ্ন।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখো এমন করে, মাটিতে পড়ে থাকো বেশ কিছু শুকনো ফুল। দেখিয়ে দেন ওকে। এই যে এসব দেখছো না, এ ফুলগুলো ভাল, তাজা ও জ্যান্তই ছিল। কিন্তু গাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলায় ওরা কেমন শুকিয়ে মরে গেছে, দেখছো? তাই খবরদার ফুলদের কষ্ট দিয়ে এমন করে মেরে ফেলো না।

: সব্বাই যে ওদের মরে ফেলে আব্বু, নতুন প্রশ্ন এবার।

: কে বললো সবাই মেরে ফেলে, সুযোগমত নিজের উদাহরণ টেনে বসেন, তিনি, কই আমি তো ফুল ছিঁড়ে ওদের কষ্ট দেইনে, মারিনে।

সানিন অবশ্য জান্মের পর থেকে দেখে আসছে ওর আব্বু নিজে ফুল তো ছেঁড়েন-ই না। আবার কাউকে ছিঁড়তেও দেন না। ওকেও ফুল ছিঁড়তে না দেয়ার রহস্যটা এতদিননে বুঝতে পারে সে। এক্ষনে আব্বুর ওপর থেকে ওর এতদিনের প্রচন্ড ক্ষোভ অভিমানটা দ্রুত মিলিয়ে যেতে থাকে। আব্বুকে নতুন করে আবিস্কার করতে পেরে কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় কিছুটা। অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারে না। আব্বুকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতেও ওর মন সায় দেয় না। ছোট্ট মনটার ভেতরে শুধু ভাবনার প্রচন্ড স্রোত বইতে থাকে। ফুলদের দু:খ বেদনার ব্যাপারটা এ মুহূর্তে ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনটা কেমন যেন হয়ে যায়।

ফলে চিড়িয়াখায় ঘোরার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে সে।

: আব্বু বাড়িতে যাব, চলো না? ওর কথায় চমকে ওঠেন আলম সাহেব। ওর ভারাক্রান্ত মুখটা দেখে সহসা কোনো কিছু ঠাওর করতে না পারলেও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান, ঠিক আছে চলো মামনি বলেই গেটের পথ ধরেন। দ্রুত সন্ধ্যা ও ঘনিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকেন তিনি। নিস্তেজ সূর্যটার লাল টুকটুকে রঙ তখন ছড়িয়ে পড়ছে সবুজ গাছের পাতায় পাতায়।

ফুলদের কান্না

: পরিকল্পনা মতো ফজরের আজানের পরই সানিনের বান্ধবীরা এসে হাজির। সানিনও আগে থেকেই জেগে ছিল। আব্বু নামাজে চলে যেতেই সেও দোতলা থেকে নিচে নেমে মূল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রুমা চমকে ওঠে, কিরে সানিন কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছিস

: দেখেই মুখে আঙ্গুল দিয়ে কথা বলতে বারণ করে সে। বলে চল চল দেরি করা যাবে না কিন্তু। সন্তর্পণে ওরা রাজপথে নেমে পড়ে এবং গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায় ওদের স্কুলের দিকে। হেড স্যারের ফুল বাগানটাই ওদের টার্গেট। স্কুলটা একটা গালির



www.pathagar.org

ভেতরে আর স্যারের বাসাটা ঠিক স্কুলে গেটের বামপাশে। বাসার দারজার দু'পাশেই বেশ সাজানো একটা ফুলের বাগান। ডালিয়ে, গোলাপ, গন্ধরাজ, বেলী, জবা, রজনীগন্ধা ছাড়াও আরো কতো বিদেশী ফুল হেড স্যারের বাগানে? ফুটলে যা লাগে না! রজনীগন্ধা ছাড়াও আরো কতো বিদেশী ফুল হেড স্যারের বাগানে? ফুটলে যা লাগে না! কিন্তু নিজ হাতে ফুল ছেঁড়ার আবেগে মনে মনে রোমাঞ্চিত হয় সানিন। পাশাপাশি হাঁটে ওরা চারজন। বেশ কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই। সুমিই প্রথমে মুখ খোলে, এই সানিন এত জোরে হাঁটছিস কেন? দাঁড়া না এক সাথে যাই....।

: তোরা আয় না, এই তো এসে গেছি..... ফুল ছেঁড়ার পোকা সানিন এটা সবাই জানে আর তাই তো সবার আগে ফুল ছোঁড়ার নেশাই পেয়েছে ওকে আজ।

: ও : বুঝেছি, আগে ফুল ছিঁড়বি তো. রুমার কথায় অন্য সবাই একসাথে হেসে ওঠে।

স্কুলে এদিকটায় লোকজন সাধারণত খুব কম যাতায়াত করে। ধরা পড়ার ভয় তাই একটাই, শুধু হেড স্যারের। আবছা আলোয় লাল হলুদ ফুলগুলো চোখে পড়তেই মুগ্ধ হয়ে যায় সানিন। বিরাট সূর্যমুখী ফুটছে দেখে বিলম্ব সয় না ওর। তাই বাগানের বেড়ার ঠেস দিয়ে যেই একটা ফুলে বোঁটায় মোচড় দিয়েছে অমনি উহ মাগো, মারলাম গো বলে জোরে একটা গোঙানী ওঠে। ভয়ে দু'পা পিছিয়ে আসে সানিন। কে চেঁচায় ব্যাপারটা আন্দাজ করতে না পেরে ভাবনায় পড়ে যায় সে স্যারের বাসায় কেউ ভেবে পরক্ষণে দরজার দিকে তাকায় কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। শেষে মনমাতানো ফুলগুলোর দিকেই গভীর মনোযোগ দেয়। নিশ্চয়ই বাগান থেকেই আওয়াজটা এসেছে, সন্দেহ হয় ওর। কিন্তু সেখানেও কাউকে না দেকে স্রেফ মনের ভুল ভেবে পুনরায় ফুটলটার দিকে হাত বাড়ায়। আবার একটা কারুণ কাকুতি ভেসে আসে, দোহাই সানিন আমাকে মেরে ফেলো না। তোমার পায়ে পড়ি.....। ফুলটাই কথা বলছে দেখে বিস্ময়ে 'থ' বনে যায় তৎক্ষণাৎ। মানুষের ভয়টা মন থেকে উঠে গিয়ে এক্ষণে প্রবল একটা কৌতুহল জাগে ওর।

: আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে ছিঁড়বো না বলে পাশের একটা লাল গোলাপের বোঁটায় হাত দেয় এবার।

: ওরে বাবা, গলাটিপে মেরে ফেললো রে, বাঁচাও. .. আবার একই চিৎকার। ভয়ে থমকে হাত গুটিয়ে নেয়।

: ধুত্তরি কি সব বলছে! বিরক্তি প্রকাশ করে সানিন, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, ফুল যে আমার চাই....ই...।

: একুশে ফেব্রুয়ারি তো আমাদের কি হয়েছে? আমাদের এভাবে গলা টিপে মরতে এসেছো কেন? একসঙ্গে অনেকগুলো ফুলে কণ্ঠ ভেসে আসে, আমরা ব্যথা পাইনে বুঝি? এবার মাথা গুলিয়ে যায় সানিনের। দাঁড়ায় পড়ে ভাবতে থাকে, ফুল কখনো ও



www.pathagar.org

আবার ব্যথা পায় নাকি?

কিন্তু দেরিও তো করা যায় না আর, ধীরে ধীরে চারিদিকে ফর্সা হয়ে আসছে যে, মনের ধুকপুক বাড়ে ওর।

: শহীদ মিনারে আমরা তাহের ফুল দেবো না, নাকি? রাগের সাথে বলে সানিন।

: আমাদের কষ্ট দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে শহীদ মিনারে কেন দাও বলোতো..... সূর্যমুখী ফুলটা গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন ছোড়ে।

: বা রে, সব্বাই দেয় না? তাইতো আমরাও দেই, তর্ক জুড়ে দেয় সে।

: তোমার আব্বু-আম্মুকেই জিজ্ঞেস করে এসো না, আমাদের হত্যা করে কী লাভ তোমাদের? মিষ্টি কণ্ঠে ডালিয়ে প্রশ্ন।

অনেক কণ্ঠের শোরগোলে পুরো বাগানটাই ভরে গেছে দেখে সানিনের বেহাল অবস্থা। কি করবে, কি বলবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। সুমিদের ও অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। এখনো ওরা আসছে না দেখে মনে মনে যেন ভয়ও জাগে কিছুটা। ফলে ফুল ছেঁড়া বাদ দিয়ে রাস্তার দিকে বারবার তাকাতে থাকে। হঠাৎ দেখে ওরাও বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে।

: কি সানিন দাঁড়িয়ে কেন, ফুল ছিঁড়ছিস না? দীনার কণ্ঠে বিস্ময়। তবে আগেই দৌড়ে এলি যে–

ওদের চারজানকে একসাথে দেখে এবার ফুলগুলো ভয়ে শিউরে ওঠে। হঠাৎ এত গলার ফিসফিসানি শুনে ওরাও কিছু বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়ায় সানিনের পাশে।

: ফুল ছিঁড়তে দিচ্ছে না তো– এতক্ষণেই মুখ খোলে সানিন, ওর কণ্ঠে হতাশা।

: কে রে? ভয়ে একসঙ্গে ফিসফিসিয়ে বলে ওরা। স্যাররা জেগেছে নাকি, এভাবে কথাবার্তাই বলছে কারা? বল না,

: কারা আবার, স্যারের ফুলগুলোই তো বাধা দিচ্ছে।

: ধ্যেৎ কী সব বলছিস তুই? দীনা উপহাস করে। ফুলরা আবার কথা বলে নাকি?

: কেন, আমাদের কি জীবন নেই? বাগান থেকে একটা মিষ্টিগলা ভেসে আসে, তা নাহলে চারা থেকে বড় হই আর কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটিইবা কী করে?

: চুপ করো, ওসব বুঝিনে আমরা সাদিয়া ধৈর্য হারিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে ফুলদের। এ-ই তোমরা এসো, ওদের কথা শুনো না কেউ? নতুবা শহিদ মিনারে ফুলই দেয়া হবে না।

: দোহাই তোমাদের আমাদের মেরো না! ফুলদের কান্নার রোল পড়ে যায়। দয়া করো, আমরা কোনো দোষ করিনি.....

: এই কী হলো তোমাদের সকাল হয়ে যাচ্ছে তো! রুমা বিরক্তির সাথে বলতে থাকে, ওরা যা বলে বলুক, আমরা পটাপট ছিঁড়ে নিয়ে পালাই, এসো না!

বাকিরা এতক্ষণ কি করবে না করবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলো না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়



www.pathagar.org

ফুলদের কান্ডই দেখছিল। রুমার কথায় এবার চমকে ওঠে ওরা। চারিদিকে দ্রুত ফর্সা হচ্ছে দেখে তাই আর দেরি ও করে না। বাগানের বেড়ার কাছে এসে ফুল ছেঁড়ার প্রস্তুতি নেয়। সাবই একসঙ্গে। ফুলদের মত কান্না, অনুনয় বিনয়ের কোনো তোয়াক্কা না করে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাগানের ওপর।

একদিকে ফুলের মধু পানরত ভোঁমরা এবং মৌমাছিগুলোর পরাগায়নের কাজে ব্যঘাত ঘটায় ওরাও ভোঁ ভোঁ,গুন গুন শব্দ তুলে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। পরক্ষণই সানিনদের দেখতে পেয়ে রাগে ক্ষোভে ঝাপিয়ে পড়ে ওদেরকই ওপর। একটা হলদে মৌমাছি এসব সানিনের গালে দেয় জোরে হুল ফুটয়ে। ব্যাস, উহ মাগো বলেই বিকট এক চিৎকার দিয়ে বসে সানিন এবং পাশের ঘুমন্ত আম্মুকে ভয়ে শক্ত করে ধরে জাড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটাও ভেঙে যায় ওর। এমন কি আম্মুর সাথে ওর আব্বুর ঘুম ছুটে যায়। আব্বু আম্মু দুজনই ধড়ফড় করে লাফিয়ে ওঠেন এবং আলম সাহেব দ্রুত বেড সুইচটা অন করে দেন।

: কি হয়েছে মামনি? ওকে জাড়িয়ে ধরে হন্তদন্ত হয়ে ওঠে বসেন ওর আম্মু : মামনি, স্বপ্ন দেখছো? ওর আব্বু চোখ কচলাতে কচলাতে প্রশ্ন করেন না। দেয়াল ঘড়িতে তখন রাত দুটো বাজে । বাতি নিভিয়ে মেয়েসহ আবার শুয়ে পড়েন দুজনে। সানিনের কিন্তু আর ঘুমই আসে না। স্বপ্নের দৃশ্যগুলো চিন্তা করে করে ঘেমে ওঠে। সে এই মুহূর্তে মৌমাছির কামড়ের চেয়ে ফুলগুলোর করুণ কান্নার আওয়াজ এবং কথাবার্তাগুলোই শুধু ওর কানে বাজতে থাকে।

সেপ্টেম্বর, ২০০০



www.pathagar.org

# রিয়াজের নীরবতা

জাকির আবু জাফর

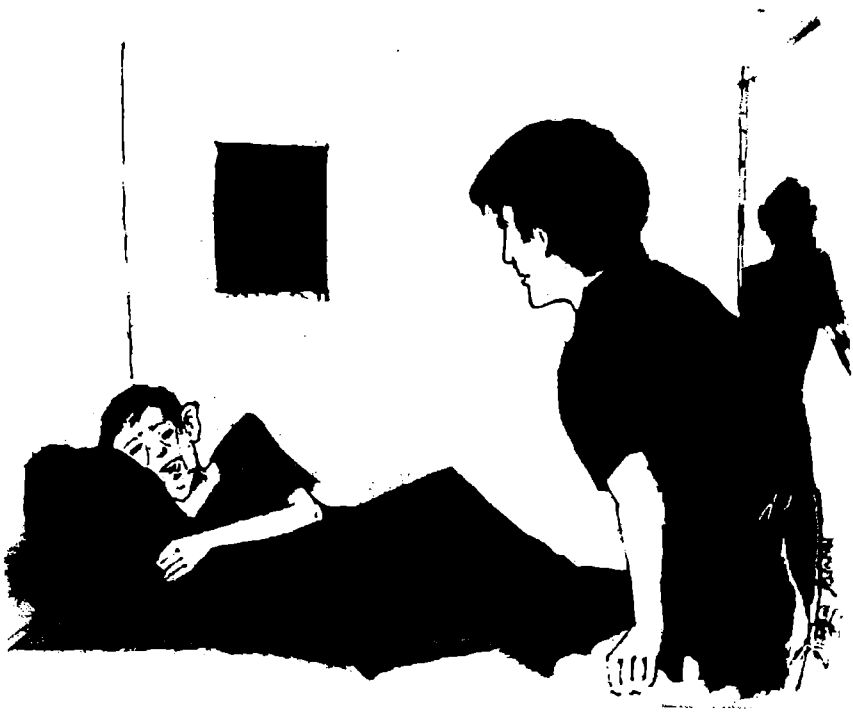

www.pathagar.org

রিয়াজের বিষয়টা অদ্ভুত। যে বয়সে সব ছেলে খেলাধুলা আর বই নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সেই বয়সটায় সে একদম ঘরকুণো এক বালক। বসে বসে ভাবে। কি যে ভাবে কে জানে! কাউকে বলবে না। কারো সামনে যাবে না। কোথাও বেড়াতেও যায় না। সহজে হাসে না। হাসলে কোনো খুশির চিহ্ন থাকে না। কোনো উচ্ছ্বাস নেই। আশা ও স্বপ্ন আছে কি না বোঝা যায় না। ক্লাস সেভেনে পড়ুয়া এক বালক এমন কেন?

অথচ বছর দুয়েক আগেও রিয়াজ ছিলো হাসির বন্যা। কারণে অকারণে হেসেই খুন। কারো বাড়িতে যাবার নাম নিলেই লাফিয়ে উঠতো। কোথাও বেড়ানোর সুযোগ পেলেই সব ছেড়ে চলে যেতো বেড়াতে। ঘরে কোনো মেহমান আসলেই রিয়াজের খুশির অন্ত থাকতো না।

রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে বলতো মা আজ আমিও কিন্তু মেহমান মনে থাকে যেনো। মুরগির একটা রান আমার চা-ই। সাথে মাথাটা দিলে মন্দ হয় না।

রিয়াজের মা-ও ছেলের রসিকতায় যোগ দিতেন। বলতেন, বারে তুই যে আমাদের বড় মেহমান। একটা রান কেন, দুটোই তো তোর জন্য। আর মাথা? ওটাতো অন্য মেহমান পেতেই পারে না। কৃত্রিম খুশিতে মাথা দুলিয়ে হাসতো রিয়াজ। কখনো কখনো রিয়াজের মা রিয়াজকে আব্বু বলে ডাকতো সেই সূত্রে মাকে বলতো শোন আমার বেটি আমার কথা মতো চলতে হবে কিন্তু। কারণ তুমি যে আমার মেয়ে।

মা বুকে টেনে বলতো আমার বাপের কি এমন নির্দেশ আছে যে তার মেয়েকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে? সুযোগ বুঝে রিয়াজ সাথে সাথে বলতো আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যেতে হবে কিন্তু। মা ছেলের ছোট্ট গালে চুমু খেয়ে বলতো তাই হবে বাপ তাই হবে। আমার আব্বু যেভাবে খুশি হয় আমি তো তাই করবো।

সেবার গ্রীষ্মে গাঁয়ের বাড়ি গেলো রিয়াজেরা। বাপ-মা এবং রিয়াজ এই তিনজনের ছোট্ট সংসার। সরকারি চাকরিজীবী রিয়াজের আব্বু। ফলে অফিসে দুই তিন দিনের বেশি ছুটি মেলে না। রিয়াজের স্কুল অনেক দিনের জন্য বন্ধ। অন্যদিকে রিয়াজের আম্মু কোনো চাকরিই করে না। রিয়াজ মনে মনে ভাবে এবারে কমপক্ষে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসবে গ্রামে। আম্মুটাকে ম্যানেজ করতে পারলেই হবে। আম্মুই আব্বুকে রাজি করাবে। রিয়াজ মনে মনে এ পরিকল্পনা বেশ পাকাপাকি করে নিয়েছে। বাসে জানালার পাশে বসা রিয়াজ। মনে নানা ধরনের ছবি ভেসে উঠছে। গাঁয়ের ছবি। মাঠের ছবি। মাঠের পাশে পাকি ডাকা বিলের ছবি। তালপুকুর। পুকুরের ওপাশে ঝিলটা। পুকুরপাড়ে ডুমুরগাছ। গাছের নেমে আসা ডালটা আর ডালে বসা মাছ শিকারি মাছরাঙা। শৈশবের খেলার সাথীরা। যে নদীর পাশে ওরা খেলতে যেতো সে নদীটা। নদীর পাড়ে কাশফুল। ওপরে ডানা ছড়ানো সাদা চিল। এভাবে নানা রকম নানা ধরন ও নানান দৃশ্য ঝিলিক দিয়ে দিয়ে মনের পর্দায় মিলিয়ে যাচ্ছে।



www.pathagar.org

কিন্তু একটি দৃশ্য বারবার ফিরে আসছে কেন বুঝতে পারে না রিয়াজ। এটা ভেবে আরো আনমনা হয়ে গেলো সে। হঠাৎ মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিলো। আচ্ছা শহীদ তো আমাদের নিকট আত্মীয, তবে আব্বু কেন শহীদের সাথে মিশতে বারণ করেছে।

শহীদ একজন ভালো ছাত্র। চরিত্র ভালো। নিরীহ। শুধু ও এতিম। তাছাড়া গরিব। তবে কি গরিব বলেই ...। রিয়াজ আর ভাবতে পারে না। স্মৃতিতে তার বাবার রক্তচক্ষু ভেসে ওঠে। সে যেনো শুনতে পায় তার পিতার কথাগুলো, 'সাবধান'। এ সমস্ত ছোট লোকদের সাথে মিশবে না কোনো দিনও না। রিয়াজ তখন বুঝতে পারেনি ছোট লোক কি? মনে মনে ভেবে নিয়েছিলো আকারে ওরা দু'জনই ছোট হয়তো তাই তার বাবা বলেছেন।

এখন ছোটলোক বড়লোকের পার্থক্য তার কাছে পরিস্কার। পরিস্কার বলেই মনে প্রশ্ন জাগে বাবা কেন উনার আত্মীয়কে, আত্মীয়ের সন্তানকে ছোট বললো।

রিয়াজের আরেকটা জিনিস মনে হচ্ছে। সেদিন ছোটলোকের অর্থ রিয়াজ বুঝতে না পারলেও শহীদ বোধ হয় ঠিকই ধরেছিলো। তার চেহারা পরিবর্তন দেখেই অনুমান করা যায়।

তারপর থেকে শহীদ আর কোনদিন রিয়াজের সাথে স্বাভাবিকভাবে মেশিনি। রিয়াজ নানাভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। আজ গাড়িতে বসে বসে রিয়াজের কেবলই সেই ঘটনা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে শহীদের করুণ মুখ।

গাড়ি এগিয়ে চলছে গন্তব্য লক্ষ্যে। গাড়ি ছাড়ার সময় সামান্য কিছু কথাবার্তা হলেও এখন পুরো গাড়িই স্তব্ধ। শুধু রিয়াজের আব্বা যেনো কাকে বেশ করে জ্ঞান দিচ্ছে। স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আব্বুর সামনে বসা লোকটা বিরক্ত। সম্মান রক্ষার্থে কিছু বলছে না। অথচ তার বাবার সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। বলেই যাচ্ছে বরাবর। বাস একই গতিতে এগিয়ে চলছে। মাঝে মাঝে রাস্তার উঁচু-নিচুতে ওঠানামা করছে। রিয়াজের দু'চোখে এখন বাইরের দৃশ্য। মনের দৃশ্যরা যেন বাইরের দৃশ্যের সাথে যোগ দিয়েছে। যেন পাতায় পাতায় লেখা সেই শৈশবের নানান কাহিনী। এভাবে দেখতে দেখতে এক সময় ঘুমিয়ে গেলো রিয়াজ। ঘুমিয়ে গেলো রিয়াজের আম্মুও। শুধু রিয়াজের আব্বুর জ্ঞান দান তখনো অব্যাহত। চোখ খুললো রিয়াজ। তখন ভেসে উঠলো সেই পরিচিত ঘরবাড়ি। সেই মসজিদ যেখানে রিয়াজের প্রথম নামাজ পড়ে ইমাম সাহেবের দোয়া নিয়েছিলো। সেই মক্তব যেখানে আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন শরীফ শিক্ষা নিয়েছে। মক্তবের সেই শিক্ষা এখন আর নেই। তিনি মারা গেছেন। ওহ! কি পবিত্র সেই ওস্তাদের মুখ। সফেদ দাড়ি টুপিতে কী যে ভালো লাগতো! রিয়াজ একবার সেই ছবি মনে করলো। আজো যদি ওস্তাদ থাকতেন এতক্ষণে আমার রিয়াজ বলে কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে জিজ্ঞেস করতেন- কেমন আছো আমার ছোট বাবা।



www.pathagar.org

রিয়াজকে তিনি ছোট বাবা বলেই ডাকতেন। সেই ওস্তাদের জন্য রিয়াজের মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো। গেলো বছর আচমকা মারা গেলেন তিনি। তেমন কোনো জটিল রোগও ছিলো না। সামান্য পেটে ব্যথা থেকে পেট ফুলে গেলো। সেই সাথে কখন যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো কেউ জানলো না।

রিয়াজদের খবর পৌঁছে গেছে চারদিকে। পাড়া প্রতিবেশী এসে ভীড় জমাচ্ছে। কুশল বিনিময় করছে। কখন ঢাকা থেকে ওরা রওনা দিয়েছে? পথে কোনো সমস্যা হলো কিনা? কত দিনের ছুটিতে ওরা এসেছে? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা প্রতিজিজ্ঞাসা চলছে। রিয়াজ এই প্রথমবার লক্ষ্য করলো গ্রামের মানুষের মধ্যে এতো আন্তরিকতা! এতো মিল! এতো ভালোবাসা! সবাই কিভাবে ছুটে আসছে ওদের এগিয়ে নেবার জন্য। সবার মুখে হাসি। আর সালাম। কি সুন্দর দৃশ্য। আসসালামু আলাইকুম বলে হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। হ্যান্ডশেক করছে। কেউ কোলাকুলি। কেউবা বাবা-মার পা ছুঁয়ে সালাম করছে।

এসব কোনো নতুন বিষয় নয়। যতবার রিয়াজেরা এসেছে ততবারই এ দৃশ্য সে দেখেছে। কিন্তু এভাবে এতো গভীরভাবে বিষয়টি রিয়াজের দৃষ্টিতে পড়েনি। ফলে তার কাছে মনে হচ্ছে এ এক নতুন কোনো দেশ বা সমাজে এসে গেছে তারা। যেখানে সবাই সবার আপন। সবাই সবাইকে সুখে-দুঃখে স্মরণ করে।

অথচ ঢাকা শহরে এটা ভাবাও অবকাশ নেই। সেখানে কেউ কারো খবর নেয় না। কেউ কারো সুখ-দুঃখের ভাগিদার হয় না। বিপদে পড়লে কেউ উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে না। বাবা-মার সাথে অন্যান্য প্রতিবেশীরা এগিয়ে চলছে। সাথে রিয়াজও। সামনে দেখা যাচ্ছে মহিলারা বাড়ির আঙিনায় জড়ো হয়ে অপেক্ষা করছে। সবার দৃষ্টি রিয়াজদের দিকে । কি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। খুব ভালো লাগছে রিয়াজের।

ঢাকা শহরের রোবটীয় জীবনকে কেমন বন্দিখাঁচা মনে হচ্ছে।

রিয়াজেরা যতই এগুচ্ছে ততই বাড়ির ভেতরের গাছগাছালি থেকে হরেক রকম পাখিদের কিচির মিচির ডাক শোনা যাচ্ছে। রিয়াজের কানে কানে কেউ যেন বলে দিচ্ছে দোয়েলের নাম। সেই সাত সকালে ডুমুর তলার দোয়েলটার গান শুনতে শুনতে রিয়াজ মক্তবে যেতো।

মক্তবে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত যে সুর ভেসে উঠতো সেটাকে হঠাৎ রিয়াজের মনে হচ্ছে পাখির কিচির মিচিরের মতোই। সেই অনেকগুলো পাখির একটি সে নিজেই।

বাড়ির উঠোনে পৌঁছে গেছে সবাই। রিয়াজ খুব খেয়াল করে দেখলো, সবাইকে দেখা যাচ্ছে শুধু শহীদকে কোথাও দেখছে না। ডানে বাঁয়ে কয়েক তাকিয়ে দেখলো। এক দুবার পেছনেও দেখা হয়ে গেছে। না। শহীদ কোথাও নেই। শহীদের আব্বু আম্মুকেও



www.pathagar.org

দেখছে না তাহলে শহীদেরা কি কোথাও গেছে? গেলে কোথায় যাবে? বেড়াতে?
আরো খেয়াল করে দেখলো রিয়াজ। না। সব মুখগুলো সে দেখতে পাচ্ছে। চেনা-অর্ধচেনা আর অচেনা মুখগুলোর কোন মুখই শহীদের সাথে মেলে না। রিয়াজের সাথে এক সাথে কুরআন শরীফ পড়েছে কামাল। কামলের সাথে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়নি রিয়াজের। কিন্তু রিয়াজের কাছ থেকে কামাল পড়া বাতলে নিতো। সেই সূত্রে কামাল রিয়াজকে খানিকটা সম্মানের চোখে দেখতো। এখনো তার পরিবর্তন হয়নি। তবে ঢাকার স্কুলে লেখাপড়া করে রিয়াজ এ রহস্যটুকু
কামালকে রিয়াজের থেকে একটু দূরেই রাখে।
আসসালামু আলাইকুম বলে কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে রিয়াজের আরেক বন্ধু কামাল। রিয়াজ হাত ইশারায় কাছে ডাকলো তাকে। জিজ্ঞেস করলো-শহীদেরা কোথায়?
জড়তা মিশ্রিত কণ্ঠে কামাল বললো-শহীদ অসুস্থ। আজ তিনদিন ধরে তার ভীষণ জ্বর। এখন অবস্থা বেশ খারাপ। টাকার অভাবে ভালো চিকিৎসাও করাতে পারছে না শহীদের আব্বা-আম্মা। ঠিকভাবে খেতেই পারে না, চিকিৎসা করাতে পারছেনা শহীদের আব্বা-আম্মা। ঠিকভাবে খেতেই পাওে না, চিকিৎসা করাবে কি করে? রিয়াজের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। টাকা পয়সার অভাবে একটি কিশোরের চিকিৎসা হয় না এটা ভাবতেই পারছে না সে।
রিয়াজের আব্বু-আম্মু তখন কুশল বিনিময়ে ব্যস্ত। এ সুযোগে বেরিয়ে পড়লো সে। সোজা শহীদদের বাড়ি। এক বাড়ি পরেই শহীদদের বাড়িটি।
বাঁশের বেড়ার দরজা। খানিকটা বয়সী। কোনো কোনো অংশ ভেঙ্গে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে। দরজাটি ভেজানো। রিয়াজ দরজায় গিয়ে টোকা দিলো। কোনো শব্দ নেই। ভেতর থেকে কেউ জিজ্ঞেস করে না, কে? আবার টোকা দিলো। না। কারোর সাড়া মেলে না। এবার কিছুটা জোরে নাড়া দিলো দরজায়। তারপরেও কোন শব্দ আসে না। অবশ্য রিয়াজ ইচ্ছে করলে দরজা খুলে ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় নক করছে। কিন্তু ভেতরে কোনো মানুষ আছে কি নেই বুঝা যাচ্ছে না।
আরেকবার দরজা ধরে নাড়া দিলো রিয়াজ। একই অবস্থা। কেউ উত্তর দেয় না। আর অপেক্ষা না করে বাঁয়ে দরজাটা ঠেলে বাঁশের খুঁটির পাশে খাড়া করে দিলো। উঁকি দিলো ভিতরে। বিকেলের সূর্য ঢলে পড়েছে আরও আগে। সূর্যের আলোর বাঁকা রশ্মি বাঁশের বেড়ার ছিদ্র দিয়ে কাউকে যেন খুঁজছে। রিয়াজ খুঁজতে শহীদকে। আর আলো খুঁজছে কাকে তাতোআর জানে না রিয়াজ। তবে রিয়াজের মনে হলো সূর্যের আলোটুকু খুঁজছে জীবনের স্পন্দন।
শহীদদের ঘরটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। মাঝখানে একটি পাটের শলা দিয়ে বানানো



www.pathagar.org

বেড়া। বেড়া পুরো ঘরটাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে।

রিয়াজ দরজায় দাঁড়িয়ে দুটো ভাগই দেখতে পেলো। প্রথমটায় মনে হলো ঘরে কেউ নেই। একটু খেয়াল করে দেখলো। চোখ গিয়ে পড়লো দক্ষিণ ভাগের এক কোণায়। কাঁথা মুড়ি দিয়ে কেউ যেন পড়ে আছে রিয়াজ এগিয়ে গেলো সেদিখে ময়লাযুক্ত কাঁথা। চাটাই থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতেও একাংশ পড়ে আছে। পাশে এসে দাঁড়ালো রিয়াজ। চোখদুটো কাঁথার স্তূপের ওপর। কোন পাশ উঠাবে তাই ভাবছিলো সে। দেখেশুনে উত্তর পাশটা উঠালো রিয়াজ। চমকে উঠলো সে। একটি মুখ বেরিয়ে এলো। কংকালসার। প্রথমটায় মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। না। এক ধরনের ভয় সারা শরীরে ঢেউয়ের মতো ধাক্কা দিয়ে গেলো। কপালে কাটা দাগটি নাথাকলে এটা শহীদের মুখ কিছুতেই বুঝতো না রিয়াজ। কপালে হাত দিয়ে ঢাকলো শহীদ, শহীদ! না, শহীদের কোনো অনুভূতি নেই। কপাল আগুন হয়ে আছে জ্বরে। রিয়াজের হাতের তালু দিয়ে সারা শরীরে যেন উত্তাপ ছড়িয়ে গেলো। এই মুহূর্তে ওর জন্য ডাক্তার প্রয়োজন। কিন্তু শহীদের আম্মা-আব্বা কেউ নেই। কেন? এই সময়ই কে যেন পেছন থেকে হাউমাউ করে বলে উঠলো কে আমার ছেলে মরণ দেখতে এসেছো?

রিয়াজ পেছনে তাকায়। দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে শহীদের মায়ের উদভ্রান্ত দৃষ্টি। অভাবগ্রাস্ত চোখে বসে আছে তার মুখে।

– খালাম্মা আমি রিয়াজ।

কোন রিয়াজ? কোনো রিয়াজকে আমি চিনি না। কাউকে না। আমার ছেলে মরণ দেখার জন্য আমি তো কাউকে দাওয়াত করিনি। কেন এলে তুমি?

খালাআম্মা আমি আজই ঢাকা থেকে এসেছি। মজিব সাহেবের ছেলে আমি, কিন্তু বলুন শহীদকে ডাক্তার দেখাননি কেন?

ডাক্তার কে ডাক্তার? ওরা তো টাকা ছাড়া কিছু চেনে না। ওরা ডাক্তার নয়; টাকাখোর। ওদের শুধু টাকা চাই। টাকা! আমার টাকা নেই।

শহীদের মায়ের কথাগুলো এমনভাবে প্রবেশ করলো রিয়াজের কানে, হৃদয় যেন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। দ্রুত বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। সোজা বাড়ি এলো। রিয়াজকে তখন খুঁজে খুঁজে সবাই হয়রান। ঘরে ঢুকতেই রিয়াজের আব্বুর সাথে মুখোমুখি।

– কি ব্যাপার কই ছিলে তুমি?

– আব্বু আমার পাঁচশ টাকা দরকার

– টাকা? কেন? কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ করলো তার বাবা।

– আমার হাতে সময় কম আব্বু পাঁচশ টাকা দাও। রিয়াজের কণ্ঠে দারুণ উৎকণ্ঠা।

– কেন হঠাৎ তোর এত টাকার দরকার সে কথা আমাকে বলতে হবে। না জেনে এত টাকা তোর হাতে আমি দিতে পারি না। বল কি দরকার তোর?



www.pathagar.org

– শহীদ মারাত্মক অসুস্থ। মরে যাচ্ছে ও। ঔষধ নেই। ডাক্তার আসে না টাকার জন্য।
– ও এই কথা? এতক্ষণ বললি না। তুই আবার সেই ছোটলোকদের সাথে মিশতে গেলি? টাকা দেয়া তো দূরের কথা, শাস্তি হবে তোর।
– এটাই কি তোমার শেষ কথা আব্বু?
– এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কোনো কথা শুনতে চাই না তোরমুখ থেকে।
– আমিও আর বলছি না বলেই ঘন পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো রিয়াজ।
ঘুরে এসে অন্য দুয়ার দিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো। ঢুকেই ডান পাশের রুমে দেখি তার আম্মু চাচীর সাথে গল্প করছে। সোজাসুজি সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আম্মু আমার পাঁচশ টাকা দরকার।
ছেলের দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন রিয়াজের মা। বললেন, কি হয়েছে আব্বু?
– সে কথা পরে বলবো মা। আগে আমার টাকা দাও। তবে আব্বুকে বলবে না।
রিয়াজের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে না রিয়াজের মা। নিজের ভ্যানেটি ব্যাগ খুলে তিনশ টাকার তিনটি নোট বের করে দিয়ে বললেন, আমার কাছে এই আছে নাও।
মায়ের হাত থেকে তিনশ টাকা নিয়েই ভেতরের রুমে চলে গেলো। ব্যাগ থেকে দুটো নতুন শার্ট নিয়ে বেরিয়ে এলা। চলে গেলো কামালদের বাড়ি দুটো শার্ট সাথে হাত ঘড়িটা খুলে দিয়ে কামালকে বললো, আমাকে দুশ টাকা দাও। কামাল রিয়াজের অবস্থা দেখে হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারলো না। ঘর থেকে দুশ টাকা এনে তুলে দিলো রিয়াজের হাতে। টাকা নিয়েই ছুটলো সে।
শহীদের দরজায় দাঁড়ালো রিয়াজ। শহীদের আম্মার বুকফাটা কান্না রিয়াজকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করলে সামনে তাকিয়ে দেখে আগের সেই কাঁথা আর গায়ে নেই শহীদের। উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি শুয়ে আছে শহীদ। সবই আগের মতো। শুধু যে নিঃশ্বাসের ওঠানামা দেখেছিলো রিয়াজ, সে নিঃশ্বাস আর নেই শহীদের বুকে। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে দরজা থেকে সরে গোলো রিযাজ। চারদিক থেকে এক নীরবতা এসে ঘিরে ধরলো তাকে।

ডিসেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# পরীর দেয়া জাদুর কাঠি

রফিক মুহাম্মদ

www.pathagar.org

সোমা খুব অভিমানী। অল্পতেই সে রেগে যায়। আর রেগে গেলে অভিমানে গাল ফুলিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। সবার সঙ্গে তখন ওর আড়ি। কারো সঙ্গেই কোনো কথা বলবে না। অবশ্য এই রাগ বা অভিমানও ক্ষণিকের। অভিমান করে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কেউ যদি ওর অভিমান ভাঙাতে না যায়, তখন আবার উল্টো সে একা একাই বলতে শুরু করে, আমাকে এখন কেউ আর আদর করে না, কেউ ভালোবাসে না বুঝেছি, আমি কালো তো এ জন্য কেউ আমাকে পছন্দ করে না। এসব বলতে বলতেই আবার আব্বুর কাছে গিয়ে বসবে। ওর আব্বুও তখন আদর করতে করতে অন্যদের কিছুটা শাসন করার সুরে বলেন, এই কে বলেছে আমার ছোট কালো। আমার মা-মণি খুবই সুন্দর। একেবারে পরীর দেশের রাজকন্যা। অভিমান ভুলে সোমা তখন আব্বুর কাছে বসে অন্যদের দিকে তাকিয়ে শুধু মুচকি হাসে।

সোমারা তিন বোন। পিয়া, সোমা ও তিশা। সোমাকে কালো বললে যেমন রেগে যায়, তেমনি মেজো বললেও অভিমানে মুখ ভার করে ফেলে। তাকে ছোট বলতে হবে। ক্লাস নাইনের ছাত্রী সে। তবু সে এখনো ছোট থাকতে চায়। ছোটদের সবাই আদর করে। ছোটদের ভুল হলে কেউ গালি দেয় না, মারে না, সবাই আদর করে। এ জন্যই সোমা সবার কাছে ছোট থাকতে চায়।

সোমার এ ধরনের অভিমানে কেউ বিরক্ত হয় না, সবাই বরং ওকে রাগিয়ে ওর অভিমানী ভাবকে বেশ উপভোগ করে। সোমাকে কালো বলে রাগিয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দ উপভোগ করে ওর কাজিন জামান।

জামান ওদের বাসায় গিয়ে প্রথমে সোমাকে খুঁচিয়ে রাগাবে, তারপর চুইংগাম বা চিপস দিয়ে ওর রাগ ভাঙাবে। সোমা এমনিতে শ্যামলা। রাগলে ওর উজ্জ্বল শ্যামলা মুখটা টকটকে লাল হয়ে যায়। তখন ওকে বেশ সুন্দর লাগে। জামান অবশ্য সোমাকে খুশি করার জন্য অন্য পদ্ধতিও ব্যবহার করে। চুইংগাম বা চিপসে খুশি না হলে, জামান তখন বলে, সোমা হলো আমার বোন। আম্মার মতোই শ্যামলা এবং সুন্দর। পিয়া, তিশা ওরাতো আমার মত নয়, আমার বোনও নয়। জামানের মুখে এ ধরনের প্রশংসা শুনে সোমার অভিমানের গোমড়া মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটতে শুরু করে।

সোমার দুঃখ একটাই। সে সুন্দর নয়। তার গায়ের রং কালো। বড় বোন পিয়া এবং ছোট বোন তিশা খুব ফর্সা। সে ফর্সা হলো না কেন? নিজের গায়ের রং নিয়ে ভাবলেই সোমার মন খারাপ হয়ে যায়। আজ বিকেল থেকেই সোমার মন খারাপ। স্কুল থেকে বাসায় ফিরতেই জামান ভাইয়া ওকে বলে এই যে আমার কালো বোন এসে গেছে। সেই থেকে সোমার মন আজ কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। সোমা ভাবে যদি এমন একটা জাদুর কাঠি পাওয়া যেত, যা গায়ে ছোঁয়ালেই কালো মানুষের গায়ের রঙ সঙ্গে সঙ্গে ফর্সা হয়ে যেতো। সোমা শুধু ভাবে। ভাবতে ভাবতে বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নামে। সোমা পড়ার টেবিলে যায়। পড়ায়ও সোমার মন বসে না। কবিতা মুখস্থ করবে কি, সে শুধু জাদুর কাঠির কথা ভাবে। আহা! যদি এমন একটা জাদুর কাঠি পাওয়া যেতো! রাতে শুয়ে শুয়েও সোমা শুধু জাদুর কাঠির কথা ভাবে। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে সে। ...



www.pathagar.org

পূর্ণিমা রাত। চাঁদের আলোয় সারা পৃথিবী ঝলমল করছে। কেমন যেন এক মায়াময় হয়ে উঠেছে পৃথিবী। আহা! কি সুন্দর রাত! একটি সুন্দর ফুলের বাগানে সোমা হাঁটছে। ওর মন খুব খারাপ। এই চাঁদের আলোর মত যদি ফর্সা হতো ওর গায়ের রঙে। সোমা বাগানে হাঁটে আর এসব ভাবে। হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে আসে ভারি সুন্দর এক পরী। সোমা পরীকে দেখে একটুও ভয় পায়নি। পরী এসেই সোমাকে আদর করে জিজ্ঞেস করে, তোমার মন খারাপ কেন? উত্তরে সোমা বলে, আমি তো সুন্দর না, তাই। ওই চাঁদের আলোর মতো যদি হতো আমার গায়ের রঙ। কথা শুনে পরী হাসলো। বললো, কে বললো তুমি সুন্দর না। তুমি তো ভীষণ সুন্দর! একেবারে আমাদের পরীর দেশের রাজকন্যার মতো।

পরীর কথা শুনে সোমাও এবার মুচকি হাসলো। বললো সত্যি বলছো! পরী বললো, হ্যাঁ, সত্যি। তুমি সুন্দর বলেই তো আমি তোমার কাছে এসেছি। সোমা তবুও বললো, কিন্তু আমার গায়ের রঙটা ফর্সা না। যদি একটা জাদুর কাঠি থাকতো। এই কাঠি ছোঁয়ালেই আমি ফর্সা হয়ে যেতাম সুন্দর পরীটা সোমার এ কথাটা শুনে আরো কাছে টেনে নিলো। ওকে মিষ্টি সুরে গান শোনালো, অনেক মজার মজার গল্প বললো। তারপর ওর হাতে তুলে দিল একটা জাদুর পরশ কাঠি। আর বললো, এই নাও জাদুর কাঠি, এটি গায়ে ছোঁয়ালেই তুমি চাঁদের আলোর মতো ফর্সা হয়ে যাবে। কি এবার খুশি হলে তো?

সোমা সত্যি ভীষণ খুশি হলো। এ সোমার খুশি দেখে পরীও খুশি হলো। পরীটা এবার সোমাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বললো, মানুষের শরীরটা তো বড় কথা নয়। মানুষের বাহ্যিক রূপ কিন্তু আসল সুন্দর নয়। মানুষের মন আছে, মনে হৃদয় আছে। মানুষের মন যদি কালো থাকে, কুৎসিত থাকে তাহলে দেখতে সে ফর্সা হলেও সুন্দর মানুষ হয় না। প্রকৃত সুন্দর মানুষ সেই, যার মন সুন্দর। যে সবাইকে ভালোবাসে। যার মনে কোনো হিংসা বিদ্বেষ নেই। তুমি তো সেই রকম এক সুন্দর মনের মেয়ে। তাহলে এই জাদুর কাঠি দিয়ে কি মানুষের মন সুন্দর করা যায় না? সোমা প্রশ্ন করে।

না। মনকে সুন্দর করতে হয় অন্যভাবে। সৎ পথে চললে, ভালো কাজ করলে, ভালোভাবে পড়াশোনা করলে... কথাগুলো বলতে বলতেই পরীটি আকাশে উড়তে উড়তে মিলিয়ে যায়।

পেছন থেকে সোমা পরীটাকে ডাকে– এই পরী, বলে যাও আর কি কি করলে মন সুন্দর হয়। বলে যাও না পরী, বলে যাও...।

এই সোমা ওঠ। অনেক বেলা হলো। ওঠে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসো। মায়ের ডাকে সোমার ঘুম ভেঙে যায়। সে মিটমিট করে মায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ওঠে বসে। অন্য দিনের মতো আলসেমিতে বিছনায় গড়াগড়ি যায় না। তাড়াতাড়ি ওঠে হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসে সোমা।

ডিসেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# জাহান্নামের অজগর

তরজমা : মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

www.pathagar.org

ইরাকের বসরা শহরে এক যুবক বাস করতেন। তার ছিল কিছু খারাপ অভ্যাস। তাই বলে যে কোনো সৎকাজ করতেন না, তা নয়। মাঝে মাঝে তিনি ইবাদত বন্দেগি করতেন। দুখী মানুষের পাশে গিয়েও দাঁড়াতেন। তবে বেশির ভাগ সময় তিনি নেশায় বিভোর হয়ে থাকতেন।

তার এক ফুটফুটে মেয়ে ছিলো। মেয়েকে তিনি ভীষণ আদর করতেন। মজার ব্যাপার হলো, সেই মেয়েটি যখন খুব ছোট্ট, মায়ের দুধ খায়, তখন আব্বুকে মদ পান করতে দেখলেই ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করে দিত। মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে মদের পাত্র কাত করে মাটিতে ঢেলে দিতো। এতে তিনি রাগে লাল হয়ে যেতেন। তবু আদুরে মেয়েটিকে কিছুই বলতেন না। দুই বছর বয়সের সময় অসুখে ভুগে একদিন সেই পরীর মত মেয়েটি মারা গেল। মেয়ের মৃত্যুতে যুবকটি সাংঘাতিক দুঃখ পেলেন। কিন্তু খারাপ অভ্যাসটি ত্যাগ করতে পারলেন না। শাবানের পনেরো তারিখের রাত। সে রাতেও তিনি মদ গিলে নেশায় বুঁদ হয়ে রইলেন। ইশার নামাজ না পড়েই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

চলে গেলেন স্বপ্নের ভুবনে। দেখলেন, কিয়ামত হয়ে গেছে। মানুষ কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটছে। তিনিও তাদের সাথে শামিল হয়ে গেলেন। অনেক সময় ধরে পথ চলার পর দেখেন তিনি একা হেঁটে চলছেন অজানার উদ্দেশে। আশপাশে আর কেউ নেই। হঠাৎ পেছনে অদ্ভুত একটি আওয়াজ শুনলেন। পেছনে তাকাতেই ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল। দেখলেন এক বিরাট অজগর তার দিকে তেড়ে আসছে। একেকটি চোখ যেন ফুটবলের চেয়েও বড়ো আগুনের গোলা। হাঁ তো নয় যেন পাহাড়ের বিশাল গর্ত। সেই হাঁ-এর ভেতর দিয়ে এক সাথে আট-দশজন লোক অনায়াসে হেঁটে যেতে পারবে। মুখ দিয়ে আগুন ছুটে বেরুচ্ছে। তাকে গিলে ফেলার জন্য হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে তার দিকে ধেয়ে আসছে। কোনো দিশা না পেয়ে তিনি প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছেন। কিছুদূর গিয়ে সামনে দেখতে পেলেন এক নওজোয়ানকে। সুন্দর পোশাক ও নূরানী চেহারা। পোশাক থেকে খুশবু বেরিয়ে চারদিকে আমোদিত করে রেখেছে। তাকে গিয়ে বললেন, ভাই আমাকে ঐ অজগরের কবল থেকে বাঁচান। নওজোয়ান বললো– ভাই! অজগরের কবল থেকে আপনাকে বাঁচানোর শক্তি তো আমার নেই। আপনি এক কাজ করুন। এদিকে দৌড়াতে থাকুন, আশা করি উপায় একটি হয়ে যাবে।

এবার যুবক সেদিকে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলেন। দৌড়ে এক টিলার কাছে গেলেন এবং সেই টিলায় চড়লেন। সামনে দেখেন জাহান্নাম। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুনের লেলিহান শিখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আরেকটু হলেই সেখানে পড়ে গিয়েছিলেন আর কি! এমন সময় শুনতে পেলেন, কে যেন ডেকে বলছে ফিরে এসো, জলদি ফিরে এসো। তুমি তো আর জাহান্নামি নও।



www.pathagar.org

যুবক এ আওয়াজ শুনে পেছনে ফিরে এলেন। তারপর অন্য দিকে আবার দৌড়াতে লাগলেন। সাপও নাছোড়। সেও তার পিছু ছাড়ছে না। ছুটছে তো ছুটছেই। আবার সেই নওজোয়ানের সাথে দেখা। সাহায্য চাইলেন। এবারও সে অপারগতা প্রকাশ করে বললো, আপনি বরং ঐ পাহাড়টির দিকে যান হয়তো উপায় একটি পেয়ে যাবেন।

যুবক যেতে যেতে সেই পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। তখনও অজগর তার পিছু ছাড়েনি। দেখলেন, পাহাড়ের আরেক পাশে একটি খুব সুন্দর বাগান।

হরেক রকমের ফুল ফল দোল খাচ্ছে। বাগানের মধ্যে একটি বিরাট ইমারত, সুন্দর কারুকাজ করা। দরোজা স্বর্ণের। ইটগুলো হীরে ও মুক্তার তৈরি। একই সাথে অনেক রঙের বিচ্ছুরণ ঘটছে সেখান থেকে। যুবক চিৎকার করে বলতে লাগলেন– 'ঘরে আপনারা কে আছেন, মেহেরবানি করে বেরোবেন কি? এক যুবক ভীষণ বিপদে পড়েছে তাকে একটু সাহায্য করুন।'

চিৎকার শুনে দরোজা খুলে এক ঝাঁক টিয়ে পাখির মতো একদল ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এলো। ততক্ষণে অজগর তার একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে তার দুই বছরের আদুরে মেয়েটিও ছিলো। তাকে দেখে মেয়েটি আব্বু আব্বু বলে এসে জড়িয়ে ধরলো। যুবক মেয়েটিকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন। ছোট মেয়েটি অজগরের দিকে তার ডান হাতে দিয়ে ইশারা করলো। ব্যাস অজগর যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে ফিরে চললো।

যুবক : 'মা অজগরটা কে, যে আমার পিছু ছাড়ছিলো না?'

মেয়ে : 'ও আপনার খারাপ কাজ, যা অজগরের রূপ নিয়ে আপনাকে দৌড়ে জাহান্নামে ফেলে দিতো।'

যুবক : 'তাহলে সুন্দর পোশাক পরা সেই নওজোয়ান কে?'

মেয়ে : 'সে আপনার সৎ কাজ। তা পরিমাণে কম হওয়ায় তার শক্তিও কম ছিলো। এ জন্য সে অজগরের হাতে থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারেনি। শুধু পথ দেখিয়ে সাহায্য করেছে।'

এরপর সেই যুবকের ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম থেকে উঠে কেঁদে কেটে আল্লাহর নিকট নিজের অপরাধের জন্য মাফ চাইলেন। খাটি অন্তরে তওবা করলেন।

সেদিন থেকেই নেক কাজে মনোযোগ দিলেন। এভাবে ইবাদত বন্দেগি করতে করতে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বড় আলিম ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে গেলেন।

তোমরা কি জানো এ যুবক কে ছিলেন? তিনি ছিলেন মালিক ইবনু দীনার বসরী। তার এ ঘটনা তিনি নিজেই একবার তার এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন। সাহাবী হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা) এর মতো ব্যক্তি ছিলেন তার শিক্ষক। ধন-সম্পদ এবং পৃথিবীর আরাম আয়েশের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিলো না। সারাক্ষণ তিনি আল্লাহর প্রেমে ডুবে থাকতেন। ঘরের দরোজা সব সময় খুলে রাখতেন। বলতেন–



www.pathagar.org

'কেউ যদি আমার ঘরে ঢুকে কিছু নিতে চাও নিতে পারো, তার জন্য হালাল। আমার সম্পদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আল্লাহর সন্তুষ্টি।'

মসজিদে গিয়ে অনেকেই দেখেছেন, তিনি মসজিদের কংকর উঠিয়ে সেগুলোকে লক্ষ্য করে বলতেন, 'কতই না ভালো হতো যদি আমার সকল প্রয়োজন এই কঙ্করে মিটে যেত। খাওয়া দাওয়া এবং টাকা পয়সার কিছুরই প্রয়োজন না হতো!'

একবার রাতে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এক লোক এলেন। দেখলেন ঘরে বাতি নেই। একটি রুটি হাতে তিনি বসে আছেন। বললেন, জনাব! ঘরে বাতি নেই, রুটি খাবার তরকারিও নেই, এ কেমন ব্যাপার? উত্তরে মালিক ইবন দীনার বললেন–

'আল্লাহর কসম! আমি তো সেই জিনিসের জন্যই লজ্জিত যা আমার কাছে বর্তমানে আছে।'

তিনি আরো বলতেন–

'যে আলিম ইলম অনুযায়ী আমল করে না তার কথা মানুষের মনে দাগ কাটে না, পিছলে যায়। যেরূপ পিছলে যায় পাথরের ওপর বৃষ্টির পানি।'



www.pathagar.org

# জীবনের পাঁচটি উপহার

মূল : মার্ক টোয়েন

তারজমা : হাসান শরীফ

www.pathagar.org

এক.

জীবনের প্রভাতে ফেরেশতা তার ঝুড়ি নিয়ে একটি লোকের কাছে এসে বললো, 'এখানে উপহারগুলো আছে। একটি নিয়ে বাকিগুলো বাদ দাও। সতর্কভাবে বিজ্ঞতার সাথে পছন্দ করো। বুঝেছ, বুদ্ধিমত্তার সাথে পছন্দ করো এগুলোর মধ্যে মাত্র একটিই মূল্যবান।'

উপহার ছিলো পাঁচটি। সেগুলো হলো : খ্যাতি, ভালোবাসা, সম্পদ, আনন্দ এবং মৃত্যু। বিবেচনার কোনো প্রয়োজন নেই এবং সে আনন্দকে বেছে নিলো।

পৃথিবীতে সে বেরিয়ে পড়লো এবং যৌবনকে রাঙিয়ে দেয় এমন সব আনন্দ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সব কিছু শেষ পর্যন্ত তার কাছে ক্ষণস্থায়ী ও হতাশাজনক, বৃথা ও ফাঁকা মনে হলো। সবই তাকে পরিহাস করলো। সবশেষে সে বললো, 'এতগুলো বছর আমি বৃথাই নষ্ট করলাম। যদি আবার আমি কিছু বেছে নিতে পারি তবে বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে বেছে নেবো।'

দুই.

ফেরেশতা আবার এসে বললো, 'আরো চারটি উপহার রয়ে গেছে। এগুলো থেকে আবারো একটি বেছে নাও। মনে রেখো, সময় চলে যাচ্ছে, উপহারগুলোর মধ্যে মাত্র একটিই মূল্যবান।'

লোকটি দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করে অবশেষে ভালোবাসা বেছে নিলো।

এ সময় লোকটির অজান্তে ফেরেশতাটির চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল।

অনেক অনেক বছর পর এক ফাঁকা বাড়িতে একটি কফিনের পাশে বসেছিলেন লোকটি।

এ সময় সে বিড় বিড় করে নিজে নিজে বলছিল, 'সবাই একে একে চলে গেল আমাকে ফেলে; আর এখন ও এখানে শুয়ে আছে। সে ছিল আমার প্রিয়তমা এবং সর্বশেষ আশা। সব বন্ধুই একের পর এক আমাকে ছেড়ে গেল। সুখের প্রতিটি মুহূর্তেই এক একটি বিশ্বাসঘাতক বেনিয়া। ভালোবাসা, আমার কাছে হাজার ঘন্টার তীব্র বেদনা বিক্রি করেছে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি তাকে অভিশাপ দেই।'

তিন.

'আবার বেছে নাও' ফেরেশতার কণ্ঠ শোনা গেল। 'বিগত বছরগুলো জ্ঞান তোমাকে যা শিখেয়েছে– নিশ্চিতভাবেই তা হয়েছে। তিনটি উপহার আছে ঝুড়িতে। এর মধ্যে মাত্র একটিরই কোনো মূল্য আছে। এ কথাটি মনে রেখে, বুদ্ধিমত্তার সাথে বেছে নাও।'

লোকটি অনেক চিন্তা ভাবনা শেষে 'খ্যাতি' বেছে নিলো।

ফেরেশতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল।



www.pathagar.org

বেশ কয়েক বছর পরে ফেরেশতা আবার এলো এবং লোকটির পেছনে দাঁড়ালো। সে তখন ম্রিয়মাণ দিবসে একাকী বসে চিন্তা করছিল।

ফেরেশতা জানতো, সে কি চিন্তা করছে :

'আমার নাম পৃথিবীতে ভরে গিয়েছিল। প্রতিটি মুখে প্রশংসা ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। এবং এটা আমার কাছে সামান্য সময় বলে মনে হচ্ছে। হায়, কত সামান্য সময় ছিল এটা! তারপর এসেছে ঈর্ষা, পরে কুৎসা, তারও পরে অপবাদ। পরে ঘৃণা, পরে যন্ত্রণা। অতঃপর উপহাস, যা সমাপ্তির সূচনা। সবার শেষে এসেছে করুণা, যা খ্যাতির কবর রচনা করেছে। হায়, সুনামের কী তিক্ততা ও বেদনা! খ্যাতির প্রধান লক্ষ্যই তো মানহানি, এটাই শেষ পর্যন্ত ঘৃণা আর করুণা এনে দেয়।

চার.

'এখন আবার বেছে নাও' ফেরেশতা বলে উঠলো, 'দুটি উপহার রয়েছে। হতাশ হয়ো না। শুরুতেই উপহারগুলোর মধ্যে একটি ছিল দামি এবং তা এখনো এখানে আছে।'

'সম্পদ– এটাই তো শক্তি! আমি কত বড় অন্ধ ছিলাম।' লোকটি বললো। 'এখন, সব শেষে জীবন কত মূল্যবান হবে। আমি খরচ করবো– হিসাব ছাড়া চোখ ধাঁধিয়ে দেবো। সেইসব বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যকারীরা আমার পায়ের কাছে ধুলোতে গড়াগড়ি খাবে। আমি তাদের পরশ্রীকাতরতার মাধ্যমে আমার ক্ষুধিত হৃদয়কে তৃপ্ত করবো। সকল ধরনের বিলাসিতা, সকল আনন্দ উপভোগ করবো। মানুষের কাছে প্রিয়, সকল কিছুই আমি পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে ভোগ করবো। আমি কিনবো, কিনবো, কিনবো! শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা, ভক্তি তুচ্ছ পৃথিবীর চাকচিক্যময় জীবনে সকল কৃত্রিম প্রশংসা। আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি। এবং ইতঃপূর্বে বোকার মত বেছে নিয়েছি। কিন্তু তা এখন অতীত হয়ে গেছে। আমি তখন সম্পদকে অবজ্ঞা করেছিলাম, এবার যেটাকে সবচেয়ে ভাল মনে করেছি, তাই গ্রহণ করেছি।'

তিনটি সংক্ষিপ্ত বছর চলে গেল। একদিন বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় ক্লান্তভাবে বসেছিল সে। তার চক্ষু কোঠরাগত। জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে। তার মুখ থেকে বিড়বিড় করে বের হচ্ছিল :

'পৃথিবীর সকল উপহারের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হোক। প্রতিটিই নিন্দিত, চমক লাগানো আর মিথ্যা। কোনটিই উপহার নয়, শুধুমাত্র ঋণগ্রস্তকারী। আনন্দ ভালোবাসা, খ্যাতি, সম্পদ সবগুলোই দুঃখ, বেদনা, লজ্জা দারিদ্র্যকে স্থায়ী করার সাময়িক ছদ্মবেশ মাত্র।

ফেরেশতাই সত্য বলেছিল : তার ভান্ডারের উপহারগুলোর মধ্যে একটিই মূল্যবান, শুধুমাত্র একটিই মূল্যহীন নয়। প্রিয় ও মহার্ঘ্য বিষয়টির সাথে অন্যগুলোর তুলনা করে আমি এখন সেগুলোর মূল্যহীনতা ও তুচ্ছতা বুঝতে পারছি। স্বপ্নহীন পদক্ষেপ ও



www.pathagar.org

কষ্টকর ঘুমের যন্ত্রণা দেহকে জর্জরিত করছে। লজ্জা ও বেদনা, মন ও হৃদয়কে কুরে কুরে খাচ্ছে। এটা নিয়ে যাও! আমি ক্লান্ত, আমি বিশ্রাম চাই।

পাঁচ.

ফেরেশতা এলো। আবারো চারটি উপহার আনলো কিন্তু 'মৃত্যু' কামনা করা হলো। ফেরেশতা বললো, 'আমি এক মায়ের প্রিয় ছোট বাচ্চাকে এটা দিয়েছিলাম। সে ছিল অজ্ঞ, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করে একটা বেছে নেয়ার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তুমি বেছে নেয়ার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করোনি।

লোকটি বললো, 'হায় আমি কত বোকা! আমার জন্য কী আছে?'

ফেরেশতা বললো, 'যার উপযুক্ত এখনো তুমি হওনি, বৃদ্ধ বয়সের খেয়ালি উপলব্ধি।'

ডিসেম্বর, ২০০১



www.pathagar.org

# আহংকারী শিক্ষা

তালহা বিন নজরুল

www.pathagar.org

বসন্তের চমৎকার একটি দিনে বিশাল এক বনের মধ্যে ফুটলো লাল টুকটুকে এক গোলাপ। বনটি শহরের বেশ বাইরে। এখানে লোকজনের যাতায়াত খুব কম। শত শত রকমের গাছপালা আর লতা-গুল্মে ভরপুর এই বনটি । ফোটার পর থেকেই গোলাপটি তার আপন সৌরভে নজর কেড়ে নিল আশপাশের গাছগুলোর। ছোটবড় সব গাছই গোলাপের সৌন্দর্য আর সৌরভে মুগ্ধ। গোলাপ গাছের কাঁটা দেখে যে পাইন গাছ এদিন টিপ্পনি কেটেছিল সেও বলে উঠল, 'আহ্,! কী চমৎকার না ফুলটি! আমি যদি এমন সুন্দর হতে পারতাম তবে আমার সৌরভ ছড়িয়ে পড়তে আরো অনেক দূর পর্যন্ত

পাইনের দুঃখ দেখে অন্য একটি গাছ তাতে সান্ত্বানা দিল বলল, প্রিয় পাইন, দুঃখ করো না, আমাদের কারো পক্ষেই সকল কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। স্রষ্টা আমাদের একেকজনকে একেকটি গুণে গুণান্বিত করেছেন।

সকলের প্রশংসা আর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা দেখে গোলাপ ধীরে ধীরে অহংকারী হয়ে উঠল। সে এখন গর্ভভরে বলে, এইবনের মধ্যে আমি সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় গাছ। গোলাপের এই কথায় একটি সূর্যমুখী ফুল তার হৃদয় রঙের বিশাল মাথা ঝাঁকিয়ে গোলপকে বলল, 'কেন তুমি এমন কথা বলছ? এ বনে তোমার মতো আরো অনেক সুন্দর সুন্দর তরুলতা আছে। তুমি কেবল তাদের একজন।'

লাল গোলাপটির গর্ব এতেও কমে না। সে উত্তর দিল 'তুমি যা-ই বলনা কেন, আমার তুলনা আমিই। দেখ না আমার দিকে সবাই কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আর সমীহ করে।' একটু পরেই গোলাপটি অদূরে একটি ক্যাকটাস গাছের দিকে ইশারা করে বলল, দেখ তো এটা কত কুৎসিত একটি গাছ। এর সমস্ত শরীর জুড়ে শুধু কাঁটা। ওর কথা শেষে না হেতেই পাইন গাছটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'হে গোলাপ, এসব কী ধরনের কথা? আসলে সুন্দর কী বা কাকে আসল সুন্দর বলে তা কে বলতে পারে? তোমার কাছে যা অসুন্দর আর একজনের কাছ তা-ই সুন্দর মনে হতে পারে। কাঁটা তো তোমার গায়েও আছে।

পাইনের কথায় অপমানিত বোধ করল গোলাপ। চটে গেল সে। বলল, 'হে পাইন, আমি ভাবতাম তোমার রুচি বোধহয় অন্যদের চেয়ে ভালো! এখন দেখছি সৌন্দর্য সম্পর্কে তোমার তেমন ধারণাই নেই। আমার কাঁটা আর ক্যাকটাসের কাঁটা তুমি এক করে ফেললে!'

গোলাপের এই আচরণে অন্য গাছগুলো মনে মনে বলে উঠল, 'কী অহংকারী ফুলরে বাবা!'

কাপাল কুঁচকে গোলাপটি তার মুল ক্যাকটাসের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চাইলো। কিন্তু একচুলও নড়তে পারলো না সে তার মূলকে। তাবে মাঝে-মধ্যেই সে ক্যাকটাসের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠোঁট বাকা করতো। ভাবখানা এমন দেখাতো যে, এটা আবার কোনো সুন্দর বা প্রয়োজনীয় গাছ হলো! দুঃখ যে এমন একটা গাছের



www.pathagar.org

প্রতিবেশী হতে হলো তাকে।

ক্যাকটাস কিন্তু গোলাপের এই বাঁকা চাহনিতে কখনোই মন খারাপ করতো না। হতাশও হতো না। বরং সে মাঝে-মধ্যে গোলাপকে বুঝাতে চেষ্টা করতো, 'দেখো এই পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তা কোনো কিছুকেই খামোখা বা উদ্দেশ্যহীন তৈরি করেন নি।'

এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। বসন্ত ঋতু শেষে হয়ে শুরু হলো গ্রীষ্ম। আবহাওয়া হয়ে উঠতে লাগলো গরম। প্রখর রোদ। বৃষ্টি নেই। মাটি শুকিয়ে ফেটে যাচ্ছে। মাটির নিচের পানির স্তর কমে যাচ্ছে ক্রমেই। বনের জীবন ধীরে ধীরে জটিল আর কঠিন হয়ে উঠলো। বনের জীব-জন্তু, গাছ-গাছালি সকলেরই প্রচন্ড তৃষ্ণা। পানির অভাবে অনেক ছোট ছোট গাছেই শুকিয়ে যেতে লাগলো গোলাপ ফুলও শুকিয়ে যেতে লাগলো এতো গোলাপ গাছের সৌন্দর্যও কমতে থাকলো ধীরে ধীরে। তার গর্ব অনেকটা খর্ব হতে লাগলো।

একদিন গোলাপটি দেখতে পেলো বেশ কয়েকটি চড়ুই পাখি তাদের ঠোঁট ক্যাকটাসের শাখা-প্রশাখায় প্রবেশ করিয়ে কী যেন চুষে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে তৃপ্তির সাথে। এই দৃশ্য দেখে গোলাপ অবাক হয়ে গেলো। সে পাখিদের এই উড়ান্ত অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে পাইন গাছকে জিজ্ঞেস করলো। পাইন গাছ গোলাপকে বুঝিয়ে বললো যে, 'পাখিরা এভাবে ক্যাকটাসের শরীর থেকে পানি সংগ্রহ করে। বিস্মিত গোলাপ জিজ্ঞেস করলো, 'পাখিরা যখন ক্যাকটাসের শরীরে ঠোঁট ঢুকিয়ে দেয় তখন সে ব্যতা পায় না?' পাইন উত্তর দিলো, 'ব্যাথা পায় বটে, কিন্তু সে কোনো পাখির কষ্ট দেখতে চায় না।'

গোলাপ যেন নতুন এক তথ্য আবিস্কার করলো। সে নিজে নিজে বলতে থাকলো, 'হায়! এই গাছটির মধ্যে পানি আছে! অথচ আমি পানির জন্য কষ্ট পাচ্ছি।'

পাইন গোলাপের কথা শুনে বললো, 'ওর শরীর থেকে তুমিও পানি পান করতে পার। তুমি যদি ওর কাছে সাহায্যের আবেদন করো তবে চড়ুইরা তোমাকে ওর শরীর থেকে পানি এনে দিতে পারে।'

কদিন আগে ক্যাকটাসকে যে বিদ্রূপ করেছিল তা ভুলে যায়নি গোলাপ। তাই ওর বেশ লজ্জা হচ্ছিল ক্যাকটাসের কাছে পানি চাইতে। ওদিকে জীবনও যে তার যায়। কী আর করা! ব্যর্থ হয়ে গোলাপটি এবার ক্যাকটাসের কাছে পানির জন্য আবেদন জানালো ক্যাকটাস এতে অনুগ্রহ করে রাজি হলো। তখন চড়ুইরা তাদের ঠোঁট ভর্তি পানি এনে গোলাপ গাছের গোড়ায় ঢালতে লাগলো। এতে গোলাপের মনে স্বস্থি ফিরে এলো। এখান থেকে গোলাপ গাছ উপযুক্ত শিক্ষা পেলো। সে আর কখনো অহংকার, গর্ব কিংবা কারো সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করে না। ক্যাকটাসকে সে আর কখনো অবহেলার চোখে দেখে না।

[একটি ইরানী গল্পের অনুকরণে]

অক্টোবর, ২০০১



www.pathagar.org

# ভূত হাজিরার আসন

দেলোয়ার হোসেন

www.pathagar.org

বাজারটা পার হলেই পরপর তিনটি গ্রাম। তারাউজিয়াল, লোহাটা ও আমতৈল। গ্রাম তিনটি ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বাঁশ আর বড় বড় গাছের ডালপালায় ছেয়ে আছে দীর্ঘ তিন মাইল রাস্তা। ভেজা ভেজা ছায়াপথ। পথের কোল জুড়ে তুলসী, ভাটাফুল, হাতীশুঁড় এবং ধুতরা ছাড়াও আরো নানান জাতের গাছ-গাছড়া। ঘন ছায়ার মতো মানুষের বাড়িঘর।

নুরুদ্দিন তার দুজন বিশ্বস্ত সঙ্গীসহ লোহাটা দিদার সাহেবের বাড়িতে যাচ্ছে। দিনের বেলাতেই গা ছম্ ছম্ করে। সূর্য তখনও পাটে বসেনি। গল্পে গল্পে পথ হাঁটছে তিনজন। বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতেই গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। গোটা এলাকা। নুরুদ্দিনের মনে হচ্ছিল সারাটা রাস্তা জুড়েই যেনো ভূতদের ফাঁদ পাতা। পথ চলতি লোকদেরও কেমন যেন ভূত ভূত ভয় লাগছিলো।

দিদার সাহেবের দুই ছেলে থাকে আমেরিকা। ছোট ভাই সৌদি আরব। একমাত্র কন্যা দীপা এবং ছোট ভায়ের স্ত্রীপুত্ররা ঢাকার বাড়িতে। সম্প্রতি তার গ্রামের বাড়িতে ঘটে গেছে কয়েকটি রহস্যময় ঘটনা। নুরুদ্দিন বিশেষ সূত্রে সংগ্রহ করেছে সে সব তথ্য।

## প্রথম ঘটনা

একদিন সন্ধ্যার পর দিদার সাহেব বাড়ি ফিরে তার স্ত্রীকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাড়ির কাজের লোকেরা যার যার কাজে ব্যস্ত ছিলো। কেউ কিছু বলতেও পারলো না শেষে পুকুরে তার স্ত্রীর ভাসমান লাশ পাওয়া যায়।

ডাক্তার লাশ পরীক্ষা করে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন পেলেন না। ভদ্র মহিলা সাঁতারও জানতেন। শহর এবং বিদেশ বেড়ানো এই মহিলা ভুত বিশ্বাস করতেন না। খুশি মতো চলাফেরা করতেন। ঘোর সন্ধ্যায় নির্জন পুকুর ঘাটে বসে হাওয়া খেতেন। প্রতিবেশীরা মনে করতো শরীয়তের কোনো আমলই তার মধ্যে নেই। যার ফলে অনেকেরই ধারণা মহিলাকে হয় জীনে মেরেছে, না হয় ভূতে। গ্রামে দশজনের কথা মতো থানা পুলিশ বাদ দিয়ে শেষে লাশ দাফন হয়ে যায়।

## দ্বিতীয় ঘটনা

স্ত্রীর চল্লিশা শেষ হতে না হতেই একরাতে দিদার সাহেব ভয়ঙ্কর এক জটাধারী মূর্তি দেখলেন তার জানালায়। খোলা জানালার পথে ভয়ঙ্কর একটি কালো হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার গলার কাছে। তিনি এক লাফে বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালেন এবং হাতে তুলে নিলেন গুলি ভরা বন্দুক গুলি করবেন ঠিক তখনই হাতটা সরু আর লম্বা হয়ে বন্দুকের নলে ধাক্কা লাগায়। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে বন্দুক। পালিয়ে যায় জটাধারী সেই প্রাণী আর দিদার সাহেব চিৎপাটাং হয়ে পড়ে যান মেঝেতে। নানান জনের নানান কথায় শেষমেষ দিদার সাহেব ফকির ডেকে বাড়ী বন্ধ করালেন। মিলাদ শরীফও



www.pathagar.org

পড়ালেন মৌলভী ডেকে।

## তৃতীয় ঘটনা

মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দীপা বাড়ীতে আসে। ঢাকা ফেরার প্রস্তুতিও ছিলো। মাঝখানে আব্বার এই ঘটনায় তার মনটা বড়ই দুর্বল হয়ে পড়ে। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা দীপা পুকর ঘাট থেকে ঘরে ফিরে দেখে, ভুড়িওয়ালা ফর্সা, উলঙ্গ একজন মানুষ জোড় আসনে বসে তাল পাখার বাতাস খাচ্ছে। দেখেই সে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারায়। দিদার সাহেব তখন বাড়িতে ছিলেন না। রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে কুলসুম। সে এ বাড়ির দীর্ঘদিনের বিশ্বাসী কাজের বেটি। পাড়া প্রতিবেশীরাও ছুটে আসে। ঘটনা শুনে সাবই তো 'থ'। এই অদ্ভুত ঘটনায় সবাই ধরে নেয় দীপার ওপর জীনের আছর হয়েছে। এর মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টি আটকে যায় ধবধবে বিছানার ওপর। খানিকটা জায়গায় ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত।

এসবের কোনো রহস্যই খুঁজে পেলোনা কেউ। খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন দিদার সাহেব। কেউ একজন বললো, ফকির ডেকে আসন দিলে আসল ব্যাপারটা জানা যাবে।

সেই সব রহস্যময় ঘটনার রহস্য উন্মোচন করতে ফকির আসবে দিদার সাহেবের বাড়ীতে। মন্ত্রবলে হাজির করা হবে শক্তিশালী কোনো প্রেতাত্মা। সেই বলে দেবে এর মুল রহস্য।

খবরটা ইতিমেধ্যে অনেকেই জেনে গেছে। অতি উৎসাহী নরুদ্দিন আগে ভাগেই রওনা দিয়েছে দু'জন সঙ্গীসহ। তার সঙ্গী সাথীদের মধ্যে আওলাদ হোসেন এবং আদেল কারিকর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জটিল এবং রহস্যময় অভিযানে এরা ছায়ার মতো নুরুদ্দিনের সংঙ্গে থাকে।

সে যাই হোক, ভুতপেত্মীর আসর বলে কথা। আদেলে হাতে তিন ব্যাটারী টর্স লাইট। আর আওলাদের হাতে অষ্ট ধাতুর বেড়ি পরানো বেতের লাঠি হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে দাঁড়ালো ছিন্নাত বাগদীর বাড়ীর সামনে। আম বাগানের মাঝখানে ভাঙ্গা দুটি ছনের ঘর। বাড়ির সামনে ভুট্টার বাগান।

নুরুদিনের মনে পড়ে যায় ছোট বেলার কথা। দুষ্টু ছেলেরা এই বাড়ির সামনে এসেই বলতো, ভুট্টা নিলো, ভুট্টা নিলো। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতো ছিন্নাত বাগদীর মা। সে যেনো মানুষ নয়, সাক্ষাত ভুত। আফ্রিকার মরু অঞ্চলে মাটির নিচে, গর্তে এক ধরনের ব্যাঙ পাওয়া যায়। যার পেটে সঞ্চিত থাকে ঠান্ডা পানি প্রচন্ড গরমে আদিবাসীরা সেই ব্যাঙ খুঁজে হাতের মুটোয় চাপ দেয়। ব্যাঙের পিছন দিকে দিয়ে তীরের মতো বের হয়ে আসে অনেকটা পানি। ব্যাঙটা দেখতে অমসৃণ। সারা শরীর গোটা গোটা, রং কালো ঠিক সেই ব্যাঙের পিঠের মতো ছিলো ছিন্নাতের মায়ের মুখমন্ডল। আওলা জাওলা চুল।



www.pathagar.org

মাথাটা কাঁপতো মৃদু মৃদু। ছেলেরা এই মানুষ ভুত দেখার জন্য সময়ে অসময়ে জ্বালাতো বুড়িকে। বুড়ি কিন্তু ছেলেদের কিছুই বলতো না। শুধু মুখ টিপে হাসতো। তাতেই ছেলে পাড়িমারি করে ছুটে পালাতো।

নুরুদ্দিন ছোটবেলা বহুবার আসা-যাওয়া করেছে এই পথে। বুড়িকে সে কখনো ডাকেনি। তার একটাই ভাবনা হতো কতক্ষণে বাড়িটা পার হওয়া যায়।

ছোট বেলা থেকেই নুরুদ্দিনের বড় প্রিয় ছিলো জীনপরী আর ভুতের গল্প। তার জীবনেও স্মৃতি হয়ে আছে দেখা অদেখা অনেক ভূতুড়ে সব দৃশ্য। একবার গ্রামের এক শিক্ষক নুরুদ্দিনের হাতে একটা আঁকা ছবি দিয়ে বলেছিলো দেখো তো ছবিটা কেমন! নুরুদ্দিন তখন সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

–কি ? কেমন হয়েছে বললে না তো!

– অপূর্ব! কে একেঁছে?

– ছিন্নাত

উত্তরটা শুনেই নুরুদ্দিন অবাক হয়েছিলো। ছিন্নাত তেমন একটা লেখাপড়া জানতো না। বাম পাটা খাটো ছিলো। বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতো। সে-ও তার মায়ের মতো মিস্টি করে হাসতো।

## দুই

আরো কিছু দূর এগিয়ে যেতেই সন্ধ্যা ঘনালো। নিম্নচাপের কারণে আকশটা ছিলো বেশ মেঘলা। হঠাৎ বাতাস উঠলো। বৃষ্টি নেই। কড়কড় মড় মড় শব্দে দুলতে লাগলো দু'পাশের বাঁশবন। একটা বাঁশ বেশ খানিকটা হেলে পড়ছে রাস্তার ওপর। বাঁশটার কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়লো আদেল।

সে বললো এই যে বাঁশটা দেখছো, এটা আসল বাঁশ নাও হাতে পরে। এই বিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে চাই নূরুভাই।

বেশ তো, বলো।

পথ চলার সময় যদি দেখো বাঁশ বা অন্য কিছু পথ জুড়ে পড়ে আছে, তাহলে কখনো ডিঙ্গাতে যাবে না। সব ভুতদের কারসাজি। যদি ডিঙ্গাতে যাও তাহলে তরাস করে ওপরে তুলে নেবে তোমাকে। আর যদি নিচ দিয়ে যেতে চাও তাহলে মাটিতে চেপে মেরে ফেলবে।

নূরুদ্দিন বললো তাহলে কী করতে হবে?

আদেল বললো তখন কোনো কিছু দ্বারা বাঁশটাকে আঘাত করতে হবে। সংগে সংগে বাঁশটা ওপরে উঠে যাবে। আর যদি মজা দেখতে চাও তাহলে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে খুব শক্ত করে চেপে ধরতে হবে কেনি আঙ্গুলে গোড়া। সেই সাথে একটা মন্ত্র পাঠ করতে হবে। ভুত হোক আর জীবন হোক, বাবারে মারে, বলে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে শুরু



www.pathagar.org

করবে। অনেক সময় নির্জন রাতে কাফন পরা লাশ হয়ে ও পড়ে থাকে।
নুরুদ্দিন তখনই মন্ত্রটা শেখার জন্য আদেলকে অনুরোধ করলো। আদেল বললো, আমি এখনো শিখতে পারি নি। মন্ত্রটা চান্দা গাড়োয়ান জানে। আমাকে শিখাবে বলেছে। আওলাদ বললো চান্দার যতো ফাও কথা। তো বশিকরণ মন্ত্র ও ভালই জানে।

• আদেল একটু জোর দিয়েই বললো চান্দা আমার কাছে কখনো মিথ্যা বলে না রাত-বেরাত সে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে দূরের পথে আসা যাওয়া করে কিন্তু কোনদিন ভুতপ্রেত তার ধারে কাছেও আসতে পারে না।
একবার আড়পাড়া সুয়ারী রেখে আসার সময় বেশ রাত হয়ে যায়। মাঠের মধ্যে শুকুন ঘিরে ধরে চান্দাকে। চান্দা তো শুকুন দেখেই ভাবলো আজ বোধহয় তার আর রক্ষা নেই।
নুরুদ্দিন হেসে ফেললো।
রক্ষা নেই। কেন? চান্দাতো অনেক কিছুই জানে, ওর আবার ভয় কিসের!
আদের বললো কারণ এই শুকুনরূপী ভুতরা বড়ই পাজি। বন্ধ মানতে চায় না তখন চান্দা গাড়োয়ান ধুলাপাড় ছিটিয়ে দিলো চারদিকে। শুকুনারা একবার পিছায় একবার এগোয় । শেষে দুই পাখায় ভর করে এগিয়ে আসতে লাগলো তার দিকে। চান্দা তখন বেরস্ত্র হয়ে এক নি:শ্বষে একুশবার একটা মন্ত্র পাট করে। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় মখুনরা। এই মন্ত্র সে কামরূপ কামক্ষায় এক জাটওয়াল বুড়ির কাছ থেকে শিখেছিলো নাকি। মন্ত্রটা এক নি:শ্বাস পাট করা বড়ই কঠিন দম থাকে না।
তাহলে ও রাতে চান্দা পড়লো কিভাবে? ওরাতে সাধনা করে। প্রথম প্রথম দশ বারো বারের বেশি পারতো না। তারপর ধীরে ধীরে একুশে পৌছেছে। জীবন মরণ অবস্থা না হলে এই মন্ত্র সে কাজে লাগায় না। গল্পে টারে। আওলাদ এবার মুখ খুললো। রাখ তোর চান্দা গড়োয়ান। বরই চারবার সরাফত ফকীরের উপরি এ দেশে কোন ফকীর ছিলো না। একবার ভিনদেশী এক ফকির সরাফত ফকিরের উপর চেক্কা দেওয়ার জন্য বাঘের পিঠে সোয়ার হয়ে আসে। সরাফত ফকির তখন মাঠের মধ্যে জমির আইলে আইলে ঘুরাঘুরি করছিলো হঠাৎ সে তে মাথার শুকনো ঘাসের স্তুপের উপর বসে পড়ে। ঘাসের স্তুপ তখন ফকিরকে নিয়ে ছুটলো তার বাড়ির দিকে মাঠের। মানুষ তো অবাক। তারাও ছুটলো তার পিছু পিছু। সরাফত ফকিরের এই অবস্থা দেখে বিদেশী ফকীর তখন ক্ষমা চেয়ে উস্তাদ বলে মেনে নেয় সরাফত ফকীরকে।

তিন

এর মধ্যেই দিদার সাহেবের বাড়ির সামনে এসে যায় ওরা গাছ- গাছড়ার মাঝ দিয়ে পায়ে চলার পথ। আদেল বার বার টর্স মেরে দেখে নিচ্ছে চারদিক। জংল জায়গা,

www.pathagar.org

ভূতের চেয়ে সাপের ভয় বেশি। পায়ে পায়ে তিনজনই গিয়ে দাঁড়ালো কাচা ঘরটার সামনে। তীরের মত টর্সের আলো খোলা জানালা ভেদ করে ঢুকলো ঘরের মধ্যে। নূরুদ্দিনের চোখে ঝলসে উঠলো দীপার মুখ। রাতের নির্জসত খাসখাস করে বাঘের মতো ছুটে এলো একটা কুকুর । এতক্ষনে আদেলের আগলে বুকের সাহস এবার তেৎরহীন প্রদীপের আলোর মতো দপ্‌দপ্‌ করতে শুরু করলো। সে বললো, নূরুভাই ভূতের ভয় করি না কিন্তু কুকুর কামড়ালে সাভির চার পাশে চৌদ্দটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে যে! আওলাদ তখন হাতের লঠিটা কুকরের সামনে ধরে বললো, অষ্ট ধাতুর লাঠি দেখেছো? ডাকাডাকি কম করো। কাউকে ছাড়বো না এসে যখন পড়েছি ভূতেরও বারোটা বাজায়ে ছাড়বো।

কুকুরের ডাকাডাকিতে ভেতর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন দিদার সাহেব।

-আপনারা কোন গ্রামের মানুষ?

নূরুদ্দিন বললো, আমরা পাশের গ্রাম থেকে এসেছি। শুনলাম আজ এখনে ফকীর আসবে। আসন দিয়ে ভূত হাজির করবে, তাই দেখতে এলাম।

-তো ফকীর কি এসেছে?

-লোক পাঠানো হয়েছে। এসে যাবে। রাত এগারোটার পর আসর বসবে।

– আপনার দুরে মানুষ, এসেছেন যখন কাচারীতে রসুন।

যদি কিছু মন না কনে তা হলে একটা প্রশ্ন করি?

- করুন।

- আপনি কি ভুত বিশ্বাস করেন?

- করি, আবার করি না।

- আওলাদের কণ্ঠ এবার ঝিলিক দিয়ে উঠলো ভুত হোক আর জীনব হোক থরে বিড়াল আজ বের করেই ছাড়বো। ইনাকে আপনি চেনে? চেনেন না হয়তো নাম শুন থাকবেন। চৌগাছির নুরুদ্দিন। সবাই ভুত গবেষক বলেই জানে।

আপনার এই সমস্যার কথা জেনেই সঙ্গে নিয়ে আসলা । দেশে খুব কম আসে।

সে অনেক কথা। আমরা যাখন এসে পড়েছি তখন ভূতের বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো। ভদ্রলোক তখন অগস্তুদ্বয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আপনার যে কষ্ট করে এতদূর এসেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। দেশে থাকেন না বলে চিনতে পরিনি। তো এখানেই বসবেন, না ভেতরে যাবেন?

– এই বিষয়ে আপনার মেয়ের সাথে দুএকটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

– বোশ তো, তাহরে ভেতরেই চলুন বসবার ঘরটা বেশ বড়সড়ো। চৌকি, টেবিল আর চেয়ার দিয়ে সুন্দ করে সাজানো। ঘন্টা খানেক পর দিদার স সাহেবের মেয় চা নিয়ে এলো। সঙ্গে ঝালমুড়ি । দিদার সাহেব বললেন, নিন, শুরু করুন। পরে না হয় দুটো ডালভাত খাবেন।



www.pathagar.org

– না আজ রাতে ভাত খাওয়া যাবে না।

তার পর নুরুদ্দিন মেয়েটিকে বললো, আপনার নাম দীপা। আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না।

- মনে করবো কেন, আপনি বলুন।

- আপনারে বাড়ীতে ঘাটে যাওয়া সব ঘটনাই আমার জানা হয়ে গেছে। আযথা পানি খোলা করবো না। তো আপনি কি এর পূর্বেও বাড়িতে এমন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখেন?

- আম্মা বেঁচে থাকতেও দেখেছি দুএকবার। আসলে ঢাকাতে ভর্তি হওয়ার পর বাড়িতে খুব কমই আসা হয়। আম্মাই মাঝে মাঝে ঢাকা যেতেন।

- এখন কি গ্রাম ভালোলাগে

- লাগবে না কেন? তবে জীবনের জন্যে শহরে থাকা। ইচ্ছে থাকলেও আসা হয়ে ওঠে না।

- আর একটা কথা, যে উলঙ্গ মানুষটাকে ঘরের মধ্যে দেখেছিলেন ও রকম মানুষ আর কোথাও নজরে পড়ছে আপনার?

- না। ও রকম মানুষ এদেশে দেখা যায় না।

- হঠাৎ দিদার সাহেবকে একটু বিচলিত মনে হলো। নুরদ্দিন বললো, কেই মনে হয় আপনাকে ডাকছে, আপনি যান।

- হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই।

- আমি তো জানি আপনারা দুভাই। ছোট ভাই বিদেশ থাকে।

- এ আমার সৎভাই। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। মাঠের পাশে আর একটা বাড়ি আছে আমাদের। ওটা ওর ভালে

- উনি কি করেন?

তেমন কিছু না। এক সময় যাত্রা করে বেড়াতো। এখন বাড়িতেই থাকে। মাঝে মাঝে স্কুল কালের ছেলেমেদের নিয়ে নাটক, থিয়েটার করে।

আপনি যান, মনে হয় কোনো জরুরি কথা বলতে এসেছে।

দিদার সাহেব চলে গেলেন। দীপা বললো, আমার এই টুনু চাচা আব্বাকে খুব জ্বালায় এমনিতে সে ভালো মানুষ। কিন্তু অযথা টাকা পয়সা নষ্ট করে। ঐ যে শুলেন যাত্রা করে বেড়ায়। ভাগের জমিজমা অনেকটা নষ্ট করে ফেলেছে। এসব কারণেই আব্বা তাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেন না।

এ বাড়িতে আর কাদের যাতায়াত বেশি?

- ঘনিষ্টতা বলতে বাবার ভাই বন্ধুরা এ গ্রামেই তাদের বাড়ি কখনো কাচারীতে কার্ড খেলা চলে। মাঝে মাঝে তারা আব্বার সঙ্গে বিল, হাওড়ে পাখি শিকারেও যায়। তাছাড়া কুলসুম খালার ছেলের সবসময়ই আসে। ওরা আমাদের মাঠান জমি বর্গা চষে। খালা বিধবা মানুষ। বরবার এ বাড়িতেই থাকে।



www.pathagar.org

- আপনাদের বাড়িতে বিড়াল আছে?
বিড়াল থাকবে না কেন? সাদা, কালো মিলে গোটা চারেক তো হবে।
নূরদ্দিন ঝটপট আবরো প্রশ্ন রাখলো। কালো, সে কি নিখুঁত কালো?
একবার চোখ তুলে হেসে ফেললো দীপা। নিখুঁতেই মনে হয়। একটু অন্ধকার হলেই বিড়াল আর দেখা যায় না। শুধু জ্বল জ্বল করা চোখ দেখে বুঝা যা ওটা বিড়াল।
– ভয় করে না?
যার সাথে বসবাস, সে ভুত হলেও ভয় থাকে না। এই কালো বিড়ালে মধ্যে প্রচন্ড একটা শক্তি আছে তা জানেন, আমি এক ফকিরের কাছে শুনেছিলাম সেই তথ্য। পরীক্ষা করে দেখার সময় হয়ে ওঠেনি আমার। ফরমুলা অনুযায়ী যদি কাজ সম্পন্ন করা যায়, তাহলে অনেক আলৌকিক ক্ষমতার চাবিকাঠি চলে আসে হাতের মুঠোয় এমন কথা শুনেছেন কখনো?
আসলে যে পথে যার আনাগোনা, সেই জানে তার রহস্য। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে বলতে পারেন।
ফকিরী মতে শনি আর মঙ্গল এই দুই বারের সঙ্গে গ্রহ এবং অদৃশ্য আত্মাদের বিশেষ যোগ সংযোগ রয়েছে। তাই শনি মঙ্গল বারের আমাবশ্যার রাতে যদি কেউ এক আঘাতে একটি কালো বিড়াল মেরে তা রাস্তার মাঝখানে পুঁতে রাখে এবং এক সপ্তাহ পর ঐপচা বিড়াল উলঙ্গ অবস্থায় কোনো স্রোতের পানিতে ধুয়ে ফেলে, তাহলে সবগুলো হাড়ের মধ্য থেকে এসে ঐ শক্তিশালী হাড়টা পেয়ে যাবে।
তখন নানান ধরনের ভয় তার সামনে আসতে থাকবে। যেমন, মাথাবিহীন মানুষ এসে খিলখিল করে হাসবে। ওপরের দিকে পা তুলে হেঁটে আসবে কোনো ডাইনী। বাঘের রূপ ধরে আসবে প্রেতাত্মরা। তখন ভয় করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, যে, ওরা কিছুই করতে পারবে না। কাল, ভুত প্রেত বশ করার হাড়টা তখন থাকবে ঐ ব্যক্তির কাছে। শুধু যে হাড়টা থেকে মিউ মিউ শব্দ শুনা যাবে, ঐ হাড়টাই আসল। বাকিগুলোর নিস্প্রয়োজন।
চার. আদেল ও আওলাদ বাইরে থেকে এসে নুরদ্দিনকে চোখ পিটে বললো, এসে গেছে।
রাত তখন নয়টার ওপর। দীপা বললো তাহলেতো আমাকে উঠতে হয়। যে ঘরে ফকীর আসন পাতবে, তার চাবি রয়েছে আমার কাছে। দীপা চলে গেলো।
নূরুদ্দিন ডায়রী লিখে চললো পাতার পর পাতা। টিক, রাত এগারোটার দিকে দিদার সাহেব তিন জনকে ডেকে নিয়ে গেলেন ফকিরের ঘরে। ঘরটা বেশ বড়। একদিকে ফকির আসন পেতেছে। অন্যদিকে অনেকেই বসেছে। ফ্লোর জুড়ে।
বাইরে বারান্দাতেও মানুষের ঠাসাঠাসি।
বেতের ধামার মধ্যে মটর কলাই। বড় একটা পিঁড়ের ওপর সিঁদুর দিয়ে আঁকা হয়েছে



www.pathagar.org

মানুষের প্রতিকৃতি। ফকিরের সামনে আর একটি পিঁড়ে। সেখানে প্রেতাত্মা এসে বসবে। একখানা কাঁসার পেলেট সযত্নে রাখা কিছু ভিজানো আতপ চাউল। এবং একটি রক্তজবা। ফকিরের হাতে একটা হাড়। সে হাড় বিড়ালে না কুকুরের তা সেই ফকিরেই জানে।

কপালে তার তিলক আঁকা, দুহাতে লোহার বায়লা। সে বললো, 'প্রেতাত্মা' আসার পর কেউ কোনো কথা বলবেন না। তার দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না। তাকালে 'প্রেতাত্মা' তার সরু নখ দিয়ে চোখ তুলে ফেলবে।

আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। শুরু হলো হাতের তালু দিয়ে কলাই পেষা। ঘষ ঘষ একটানা শব্দ। সেই সঙ্গে ঠোঁটস্থ মন্ত্র পাঠ। তারপর ফকিরে করুণ মিনতি। 'আয়, আয়, জলীদ আয়, শুন্যেভাষা অমর আত্মা জলদি আয়, জলদি আয়।' আবার মন্ত্রপাঠ। সেই মন্ত্রে একটি শব্দও স্পষ্ট নয়। বাংলা, হিন্দি না গুজরাটি কিছুই বুঝার উপায় নেই। তবে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি হলো যে, এই বুঝি 'প্রেতাত্মা' এসে গেলো। কারো মুখে টু-শব্দটি পর্যন্ত নেই।

কিন্তু 'প্রেতাত্মা' আর আসে না। বন্ধ হয়ে গেলো ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। ম্যাচ টুকে বাতি জ্বালালো ফকির। ম্যাসেজ করে নিলো হাতটা। আবার সেই ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। প্রায় এক ঘন্টা পর টিনের ঘরে ওপর শুরু হলো দুড়ুম দুড়ুম শব্দ। আম কাঁঠালের ডাল ধরেও চললো, ঝাঁকির পর ঝাঁকি।

ফকির বললো, 'দোহাই লাগে তোর। কারো কোনো ক্ষত করিসনে।অনেক বড় বড় মেহমান আছে এখানে।' প্রচন্ড একটা ধাক্কা লাগলো দরজায়। এসেই সঙ্গে এক ঝলক ঠান্ড বাতাস।

'প্রেতাত্মা' নাকিস্বরে বললো, 'কেন ডেকেছিস? যা বলার জলদি বল, হাতে সময় কম।' আদেল আর আওলাদ তখন ভয়ে নুরুদ্দিনের হাত চেপে ধরেছে। ফকির মিনতি করে বললো, তুই কি জানিস, দিদার সাহেবের বাড়িতে এই সব অঘটন ঘটার কারণ কি? একি জীন-ভূতের কান্ড, না-মানুষের শত্রুতা?' 'প্রেতাত্মা' বললো, 'মাস্টার সাহেবে স্ত্রীকে কেউ মারে নাই। সে অত্মহত্যা করেছে।' 'কিন্তু সে অত্মহত্যা করতে যাবে কোনো দুখে?'

'হাটে হাড়ি ভাঙ্গতে পারবো না আমি। মানি লোকের মান যাবে।'

'এই বাড়িতে কি জীন-ভূতের আচর হয়েছে?'

'উনার স্ত্রী মাঝে মাঝে আসবে।'

'এই বাড়িতে আর কোনো আপদ বিপদের সম্ভাবনা কি আছে?'

'একটা বড় ধরনের বিপদ আসছে। মানুষ জাতি বড়ই লোভী। উনার খুব কাছের মানুষই একদিন উনাকে হত্যা করবে। এ বাড়ি তার জন্য নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা।'



www.pathagar.org

বারান্দা থেকে কে একজন বললো, 'কে সেই ব্যক্তি? তার নাম কি?'
সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে উঠলো 'প্রেতাত্মা'। বসবার পিঁড়েটা আছড়ে ফেললো মেঝের ওপর। দরজার একটা পাল্লা সপাং করে বন্ধ করে চলে গেলো ঘর ছেড়ে। আবার আলো জ্বলে উঠলো ঘরে ফকির গালমন্দ করলো সবার উদ্দেশ্যে। পাড়ার যুবক ছেলেরা হাসহাসি করতে করতে উঠে পড়লো জায়গা ছেড়ে। দু'একজন উঠানেও নেমে পড়েছে। ঠিক তখনই শিলাবৃষ্টির মতো দমাদম শুকনো ঢিল এসে পড়তে লাগলো হুমমুড় করে আবার সবাই এসে আশ্রয় নিলো ঘরের মধ্যে।
ঘর অন্ধকার। শুরু হলো ফকিরের দোহাই। মিনিট পাঁচেক পর সব শান্ত। নুরুদ্দিন তাঁর সঙ্গীদের বললো, 'আমরা কি এখন রওনা দিতে পারি?'
আওলাদ বললো, অসম্ভব জানে মেরে ফেলবে।
আদেল বললো, 'প্রেতাত্মার' এখন মেজাজ খারাপ, ভালো মন্দ বিচার করবে না। তার চেয়ে সকালেই যাওয়া যাবে।
অগত্যা পূর্বের ঘরটাতেই আবার দখল নিলো তারা। ফকির আর তার সাথীরা রয়ে গেলো এ ঘরেই । দিদার সাহেব মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দু'জনেরই বড় চিন্তাভরা মুখ। তিনি বললেন, নিজের কানেই তো সব শুনলেন, এবার বলুন আমি কি করতে পারি?
নুরুদ্দিন দীপাকে বললো, এখন একটু চা হলে বেশ হতো।
– বেশ তো, সে ব্যবস্থা আছে।
দীপা চলে গেলে দিদার সাহেব বললেন, এখন না হয় দুটো ভাত খেয়ে নিন। নুরুদ্দিন বললো, না। ভাত খেলে চিন্তা শিথিল হয়ে পড়বে। অংক মিলবে না। এবার বলুন ঐ ফকীর আর 'প্রেতাত্মার' কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?
– কিছু কিছু সত্যি মনে হয়। আবার....
– যে বিষয়গুলি আপনার জানার মধ্যে সেগুলিই সত্যি বলে মনে হচ্ছে আপনার। আর যা জানার আড়ালে রয়ে গেছে সেগুলিই চিন্তার বিষয়।
দিদার সাহেব খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবছেন। নুরুদ্দিনের মনে হলো ভদ্রলোকের চিন্তা রেখা যেনো বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে দীপা চা নিয়ে
এলো মুখে একটু হাসি টেনে বললো, আজ রাতে আর ঘুম হবে না চা করাতে ভালোই হলো।
নুরুদ্দিন বললো, চা-টা কিন্তু চমৎকার হয়েছে।
– কুলসুম খাল বানিয়েছে। বললো দীপা।
– তাই?
– কিন্তু খালার মনটা বড় খারাপ।
– কেন?



www.pathagar.org

– ঐ যে 'প্রেতাত্মা' বলেছে আব্বাকে কেউ মেরে ফেরতে পারে তাই!
– এসব আপনার বিশ্বাস হয়?
– না। কারণ, মা কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না।
– রাইট। আমার ধারণ আপনার মা ছিলেন সজাগ মহিলা। অনেকের স্বার্থের অন্ত রায়। সেই কারণেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আসল কথায় আসা যাক। আপনাকে বিড়ালের কথা বলেছিলাম না?
– হ্যাঁ।
– ঘরে, মাঝে মাঝে যে রক্ত দেখেন, তা ঐ বিড়ালে কান্ড।
– বিড়ালে কান্ড! দিদার সাহেব কপাল কুঁচকালেন।
– নুরুদ্দিন বললো, রক্তটা ঘরের ছাদ থেকে পড়ে। ছাদে দেখবেন পাখির অনেক পালক পড়ে আছে।
দীপা বললো, তাহলে আপনি বলতে চাইছেন ওটা পাখির রক্ত?
– আমর ধারণা তাই
দিদার সাহেব বললেন, তাহলে জানালায় দেখা সেই বিদঘুটে চেহারার জীবটা কি ভূত, না অন্য কিছু?
– ভুত নয়। ভুত হলে সে আপনার বন্ধুকের ভয় করতো না। আমরা শুনেছি 'প্রেতাত্মা' বা 'ভূত' শুধু ছায়া, অশরীরি আত্মা। সে আপনার গলা টিপে ধরতো। কিন্তু তা না করে লাঠির সাহায্যে বন্ধুকে নলে ধাক্কা দিয়েছে। গুলিটা যদি তার গায়ে লাগতো তাহলে সে ধরা পড়ে যেতো। তার প্লান ছিলো আপনি ভয়ে জ্ঞান হারালে সে আপনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবে। আর সব দোষ গিয়ে পড়বে ভূতের ঘাড়ে।
– কিন্তু, সে ঘরে ঢুকতো কেমন করে?
– সে ব্যবস্থাও তার কারই ছিলো।
– কে ব্যবস্থাও তার করাইছলো।
– কে সে, যে আমাকে খুন করতে চায়? আমি তো কাউকে অপকার করিনি। গ্রামের সবাইকে যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকি। টুনুটা আমাকে জ্বালায় বটে কিন্তু আমার কোনো বিপদের কথা শুনলে সেই তো সবার আগে এসে পাশে দাঁড়ায়।
– একটা সত্যি কথা শুনুন। মানুষ বহুরূপী। তাই তাকে সহজে চেনা যায় না মানুষকে উপকার করলে সে লোভী হয়ে ওঠে। আর সেই লোভ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় হিংস্র বাঘে। দাতাকে ভাবে দুর্বল। গ্রাস করতে চায় সব কিছু। কিন্তু সে কখনো তার পরিণতির কথা ভাবে না। যেমন ভাবে না পতঙ্গ।
হঠাৎ দীপা তার মনেরন কথাটাই বলে ফেললো। 'তাহলে টুনু চাচাই কি সম্পত্তির লোভে এমন কিছু করতে চায়?'
নুরুদ্দিন বললো, কে করতে চায় তা আমি জানি না। তবে আমি দারণা, অপনার মাকে



www.pathagar.org

যারা পানিতে ডুবিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছে, তারাই পারে এতটা সাহস করতে। দিদার সাহেব বললেন, তাহলে ফকিরের এসব আসন ফাসন কি সব মিথ্যে?

– সব সাজানো। মানুষরূপী 'প্রেতাত্মা' অন্ধাকারে এসেছে আবার অন্ধকারে চলে গেছে। ঢিল ছুড়াছুড়ি শুধু অন্যদের মনে বিশ্বাস জানমানের জন্য। যদি বলা হতো ভূত আপনাকে মারবে, তাহলে আপনি বাড়ি ছাড়বেন না। উল্টা ব্যবস্থতা নেবেন কিন্তু এই যে কেউ হঠাৎ মেরে ফেলতে পারে এটা সত্য। তাই জীবনের ভয়ে এ বাড়ি ছেড়ে আপনি ঢাকা চলে যাবেন। আর, এখানকার সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যাবে অন্যের হাতের ঝামেলা ছাড়াই প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে হবে সফল।

নুরুদ্দিনের মনে হলো, দিদার সাহেবের কাছে সব পরিস্কার হয়ে গেছে। তার বিচলিত চিত্ত এখন বেশ স্বাভাবিক।

দিদর সাহেব একটু হেসে বললেন, আপনার সব যুক্তি আমি সত্যি বলেই ধরে নিলাম। এবার বলুন কে হতে পারে সেই ব্যক্তি। নূরুদ্দিন বললো, ঠিক বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে আর একটু চা হলে বোধহয় ভালো হতো। দীপা ধীরে ধীরে ভিতরে চলে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে এসে বললো কুলসুম কালা তো ঘরে নাই আব্বা। তার ঘরটাতে তালা ঝুলছে। আমার কেমন ভয় ভয় লাগছে।

নুরুদ্দিন তখন ব্যস্ত হয়ে আওলাদ আর আদেলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললো, তোমরা এখনি দিদার সাহেরেব সঙ্গে যাও। আওলাদ বললো, ঘুমিয়ে ছিলাম বেশ ছিলাম এর মধ্যে আবার আমাদেরও টানাটানি করছো কেন? বলো কোথায় যেতে হবে?

মাঝ পাড়া দীপার খালার বাড়ি খুব সাবধানে যাবে, এবং ও বাড়ীর সব তথ্য জেনে জলদি ফিরে আসবে। দিদার সাহেব আপনি যান। ভোর হয়ে গেলে আর কোনো তথ্য পাওয়া যাবে না।

ঘরে তখন নুরুদ্দিন আর দীপা। দু'জনেই অনেকক্ষণ মৌন থাকার পর হঠাৎ দীপা বললো, আপনি যা ধারণা করছেন, তা মনে হয় ভুল।

– ঠিক ও তো হতে পারে। আচ্ছা আপনার খালা কি কখনো সন্ধ্যায় বা খুব সকালের তার বাড়িতে যায়?

– কক্ষনো না।

– তাহলে গেলে কোথায়?

– আব্বা ফিরে এল জানা যাবে। আর একটা কথা। আমি যে ঘরের মধ্যে ভুড়িওয়ালা মানুষটাকে দেখেছিলাম তার ব্যাখ্যা কি?

– এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। আপনাদের গ্রামটাই একটা ভুতের বাড়ি। তার ওপর আপনার মাথার মধ্যে ঢুকেছে ভুত। যে ভুতটাকে আপনি দেখেছেন। সে নিশ্চয়ই বিদেশী ভুত। আসরে এরকম একটা দৃশ্য কোনো ইংরেজি অথবা হিন্দী ছবিতে দেখেছেন আপনি। সেই দৃশ্যটাই অবচেতন মনে হঠাৎ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিলো।



www.pathagar.org

এমন সময় দিদার সাহেব ফিরে এলেন। তিনি বললেন, নুরুদ্দিন সাহেব আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি যা সপ্নেও ভাবিনি, অথচ সব ঘটনার মূলে ঐ কুলসুমই। আসলে 'প্রেতাত্মা' বা 'ভূত' বলতে কোনে কিছু নেই।

আদেল বললো নূরুভাই, একটা লোক তোমাকে চেনে। সে বলেছে ঐ নুরুদ্দিন সাহেবকে যতো ভয়। কুলসুম খালা বলছে ঐ বেটার চোখ যেনো শুকুনের চোখ নুরুদ্দিন বললো, দিদার সাহেব আপনি এখনি থানায় চলে যান।

এর মধ্যেই আযান পড়ে গেলো নুরুদ্দিন তার সঙ্গীদের নিয়ে দেউড়ি পার না হতেই পিছন থেকে ডাকলো, দীপা।

থামকে দাঁড়ালো নুরুদ্দিন। দীপা কাছে এসে বললো, আপনি আবার আসছেন তো।

– না। আমি এখনি ঢাকা রওনা হয়ে যাবে।

– কিন্তু

– কিন্তু কি?

ঠিকানাটা দিলে দেখা করতাম।

আমার ঠিকানার মধ্যে কোনো জঠিলতা নেই। শেওড়াপাড়া, ভুতের গলি, নুরুভাই। যে কোনো বাচ্চা ছেলে কাছে জিজ্ঞেস করলেই বাসা দেখিয়ে দিবে। আসি। আল্লাহ হাফেজ

অক্টোবর, ২০০১



www.pathagar.org

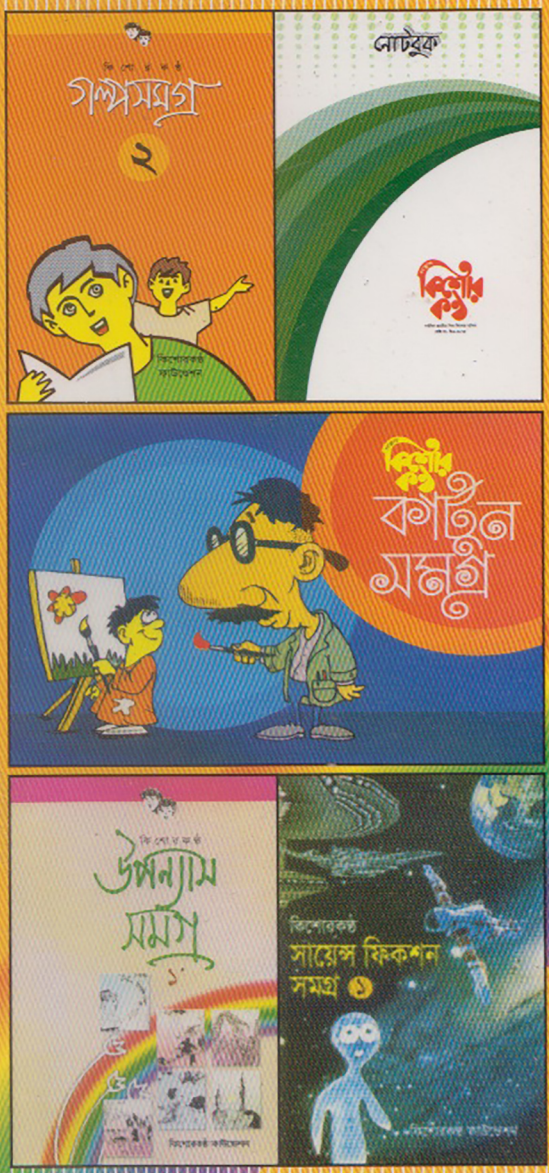

কিশোর কণ্ঠ
















কিশোরকণ্ঠ ফাউণ্ডেশন